শিক্ষণ-ব্যবহারিকা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার

সূচীপত্র

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

মুখবন্ধ

নবপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। একমুখী বিকাশ, তা' দৈহিকই হোক কিংবা মানসিকই হোক, শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যথেষ্ট নয়। সেই হিসাবেই অধুনাপ্রচলিত পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরও অভিযোগ অনেক;—এ শিক্ষা শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে না; নীরস পুস্তক তাকে জ্ঞানের নব নব সম্পদ আহরণে প্রেরণা দেয় না। তাই বিদ্যালয় হয়ে ওঠে ভীতিপ্রদ, অবাঞ্ছিত স্থান, বিদ্যা হয়ে ওঠে পুস্তকস্থা।

অতএব শিশুজীবনের নব নব সমস্যা, নবলব্ধ অভিজ্ঞতা, শিশুর আনন্দ ও তার সৃজনেচ্ছাকে পুরোভাগে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা দিলে, শিশুর পক্ষে শিক্ষা আনন্দদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে তা সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়, শ্রমের মর্যাদা-বোধ ও ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য শিশুর প্রচেষ্টা এতে বাড়বে বলে শিক্ষাবিদ্‌গণ আশা করেন।

এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে শিক্ষাপদ্ধতিরও অনেকটা পরিবর্তন আবশ্যক। বর্তমান পুস্তকখানি শিক্ষকগণকে এই নূতন পদ্ধতি ও এর ব্যবহার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সাহায্য করার জন্যই রচিত হল। তবে এই পদ্ধতি কতখানি সুফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করবে বহুলাংশে শিক্ষকের আন্তরিকতার উপর। শিক্ষক যদি স্বীকার করেন বর্তমান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ এবং বর্তমান শিক্ষা উদ্দেশ্যবিহীন, স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী নবতর শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে যদি তিনি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক সৃষ্টির কার্যে আত্মনিয়োগে কৃতসংকল্প হন, তবেই এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা।

এই পুস্তকে বর্ণিত শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীর শিক্ষকের কাজের সুবিধার জন্য রচিত। এই শিক্ষাপদ্ধতিও একমাত্র পদ্ধতি বলে কোনখানেই দাবী করা হয়নি। কেবলমাত্র একটা পদ্ধতিকে অনুসরণ না ক'রে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই পুস্তকে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তাদের প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে পদ্ধতিরও পরিবর্তন কিংবা উদ্ভাবন করার স্বাধীনতা শিক্ষকের সব সময়েই রইল। পাঠ্য-সূচীর কিংবা দৈনন্দিন কার্যক্রমের পরিবর্তনও শিক্ষক প্রয়োজনবোধে করতে পারবেন; তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে তিনি যথাসম্ভব নিয়োগ করবেন; সর্বোপরি তিনি প্রত্যেকটি শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেবেন।

এই পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য এ নয় যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় একই ছাঁচে গড়ে উঠুক। বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি ও পদ্ধতিকে সুসংবদ্ধ করা এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিজ্ঞতাকে একত্রীকরণই এই পুস্তক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

পরিশেষে যাঁরা এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছেন।

রাইটার্স বিল্ডিংস,
জানুয়ারী, ১৯৫০।

বুনিয়াদি (প্রাথমিক) শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয়

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন বহু পূর্বেই অনুভূত হয়েছে। যে শিক্ষাব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে তাতে শিশুকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু করা সম্ভবপর হয়নি, নানা কারণেই। সকলে এই অক্ষরজ্ঞান লাভ করতেও সক্ষম হয়নি। প্রথম বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে যে ছাত্রসংখ্যা দেখা গেছে, চতুর্থ বৎসরের শেষে তার শতকরা ২৮ জন মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয়ে অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে পেরেছে বলে জানা যায়। বাকী যারা মধ্যপথে যাত্রা শেষ করতে বাধ্য হয়েছে এটুকু লাভও তাদের হয়নি। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ ক'রে যারা আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পেল না, অনভ্যাসে তাদেরও বিদ্যা হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াল।

পুঁথিগত শিক্ষা ও তার ব্যর্থতা

এই তো গেল আক্ষরিক বিদ্যার দিক্। কিন্তু প্রাথমিকই হোক কিংবা সর্বোচ্চ স্তরেই হোক, শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তাকে পরিপূর্ণ শিক্ষা বলা চলে না। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, তার দৈহিক, মানসিক, আত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা, তার আবেগের যোগ্যপ্রকাশের সুযোগদান, এ সবকিছুই শিক্ষাব্যবস্থার মূলকথা। পুঁথির বোঝা বাড়াতে গিয়ে আমরা না পারলাম শিশুকে পড়াতে, না পারলাম তার দেহটাকে সুগঠিত ও কর্মক্ষম ক'রে তুলতে, না পারলাম তার মনকে সজাগ, সতেজ, সক্রিয় ক'রে তুলতে। আসলে আমরা তাকে দু'পাতা পড়তে শেখানো, দু'টো অঙ্ক করানো, দু'পাতা ইতিহাস মুখস্থ করানোকে যতটা বড় বলে মনে করেছি, তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করাটাকে ততটা প্রয়োজন মনে করিনি; অথচ সেই প্রাণান্তকর মুখস্থ করার প্রয়াসও শেষ পর্যন্ত যখন নিরক্ষরতায় এসে চরম পরিণতি লাভ করে তখন গোটা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকেই দায়ী করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

উদ্দেশ্যবিহীন প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় পাশ করাটাই ছিল এতদিনের প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার চরম ও পরম কাম্য। শিক্ষকও মনে করতেন ছাত্রদের প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করানোটাই তাঁর যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। সেই উদ্দেশ্যে শিশুকে মুখস্থ করানো হোত বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। সেও পরীক্ষায় সেগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে উদ্‌গিরণ করতে পারলেই উত্তীর্ণ হোত। এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার দিন থেকেই শিক্ষক মহাশয়ও তাকে সেই দিনের সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত করতে লেগে যেতেন। কিন্তু পুঁথিগত ছাড়া অন্যান্য যেসকল শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষায় তাকে জয়যুক্ত করবে, তা তাকে কোনদিনও দেওয়া হ'ত না। কর্মপটুতা, দৈহিক সামর্থ্য, সাহস, ধৈর্য্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করার মনোবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রুচিবোধ, স্বার্থত্যাগ, কর্তব্যবোধ, সত্য ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি,—এ সকলের অনুশীলনের সময়ও তো বাল্যকাল; কিন্তু এ সম্বন্ধেও পুস্তকে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করা ছাড়া তারা ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে এগুলিকে অনুশীলন করার সুযোগ বা শিক্ষা পেল না। শুধু কি এই? যে শিক্ষা জীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে না সে শিক্ষা কি পরিপূর্ণ শিক্ষা? শিশুকে উত্তরকালে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে; কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন ক'রে তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে; দেশের চিন্তাধারার ভাবগ্রহণ ক'রে সেই অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করতে হবে; কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থায় এগুলির দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয়নি; ফলে

যেটুকু শিক্ষা শিশু এই ব্যবস্থায় পেতে পারে তাতেও তার এই সকল প্রয়োজন মেটানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সকলে একই প্রকার পুঁথিগত শিক্ষা পাওয়ার ফলে একই ছাঁচে ঢালা প্রাণীতে পরিণত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষা—সর্বত্র এই পুঁথির ছাপই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে।

সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু এই উদ্দেশ্যহীন শিক্ষার পরিবর্তন ক'রে তার স্থানে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক শিক্ষাই সর্বপ্রকার উচ্চতর শিক্ষার বুনিয়াদ, আর এই বুনিয়াদ যদি অপটুহস্তে রচিত হয় এবং সুদৃঢ় না হয় তবে এর উপর শিক্ষার মনোরম সুদৃঢ় সৌধের কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

নবপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী বাস্তব ও মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করা এবং প্রত্যেক শিশুর বিভিন্ন ক্ষমতা অনুযায়ী তার ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশের সুযোগ দান করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যালয়গুলিতে এমন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে (১) শিশু পর্যবেক্ষণ এবং সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করার সুযোগ পেতে পারে; প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে যেন সে সুপরিচিত হতে পারে; স্বদেশের ও বিদেশের মানুষের আদর্শ এবং আবিষ্কার সম্বন্ধেও যাতে সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, স্বদেশের কৃষ্টি, তার সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে যেন সে পরিচয়ের সুযোগ পায় এবং বিদ্যালয় ও পারিবারিক জীবনে সেই কৃষ্টির ব্যবহারিক প্রয়োগের সুবিধা পায়; মাতৃভাষার উপর তার যেন এমন অধিকার হয় যাতে সে সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করতে এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং পাঠে আনন্দ পায় এবং প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর যদি তার উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ না-ও ঘটে তবে যেন সে মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠে আনন্দ পায়, পূর্ণতর জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। (২) শিশু যেন তার সহজাত কর্মপ্রবণতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় এবং বিদ্যালয়ে যেন এরূপ পরিবেশ থাকে যাতে শিশু বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করার সুযোগ পায় এবং এইরূপ কাজের মাধ্যমে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, পাঠ্যবিষয় যেন তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং তাকে ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠে। হাতের কাজ যেন শুধু দৈহিক বিকাশ কিংবা হাতের মাংসপেশীকে সবল করার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত না হয়। কাজের মধ্যে যে সমস্যার উদ্ভব হবে শিশু যেন নিজেই তার সমাধানে সচেষ্ট হয়, এরকম শিক্ষা দিতে হবে। প্রথমদিকে শিশুর কাজ আর খেলার মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও পরে যেন সে উদ্দেশ্য-বিহীন, "খেলো" কাজ না করে, ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কাজ করে। কর্মের মাধ্যমে শিশু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে; প্রথমদিকে সেই অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষা বলে মনে করা যেতে পারে; ক্রমশঃ সেই অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করার জন্য এবং তাকে ভিত্তি ক'রে নূতনতর জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন হবে পুস্তকপাঠের এবং তখনই শিশুকে পুস্তকপাঠে প্রবর্তনা দেওয়া হবে, তার পূর্বে নয়। (৩) প্রত্যেক শিশুই সৃষ্টিধর্মী; সে নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদেই কাজ করতে চায় এবং ক'রে আনন্দ পায় এবং এইভাবে সে নিজেকে কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। একে প্রথমদিকে খেলার পর্যায়েই রাখা চলে; কিন্তু ক্রমশঃ সে খেলায় গানে গল্পে ছবিতে পুতুলগড়ায় এবং অনুরূপ বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়ে নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পায় এবং ক্রমশঃ আত্মপ্রত্যয় অর্জন করতে পারে। শিশুর মনের এই সৃষ্টির প্রেরণাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিশুকে দৈনিক কিছুক্ষণের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে এবং তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। (৪) প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে শিশুর কতকগুলি স্বাস্থ্যকর এবং আনন্দদায়ক অভ্যাসগঠনে সহায়তা করা। এই অভ্যাসের ফলে শিশু নিজের ও অপরের সুবিধা সম্বন্ধে সজাগ হতে শিখবে; সুশৃঙ্খল গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার ভিত্তি এখানেই স্থাপিত হবে; সত্যবাদিতা, সাহসিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভদ্রতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং সু-অভ্যাসের গঠনেও প্রাথমিক শিক্ষককেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এ

সম্বন্ধে পুস্তকের বাঁধাবুলি থেকে শিশুকে তোতা পাখীর মত মুখস্থ না করিয়ে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশু ক্রমশঃ ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং সেদিকে আকৃষ্ট হয়। দেখতে হবে, আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়ে শিশু যেন সত্য ও কল্যাণের পূজারী হয়ে ওঠে। (৫) প্রত্যেক শিশুর বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক যোগ্যতা অনুসারে তার শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি অবনতির হিসাব রাখতে হবে যাতে ক'রে এই থেকেই শিশুকে কারিগরী না উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হবে তা বোঝা যেতে পারে। (৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আর একটি উদ্দেশ্য হবে শিশুর পরিবারের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা। বিদ্যালয়ে শিশু যে শিক্ষা লাভ করছে, সে শিক্ষা শুধু তার ব্যক্তিগত সম্পদই হচ্ছে কিনা অথবা সে শিক্ষা সে পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনেও নিযুক্ত করতে শিখেছে এটা দেখাও হবে প্রাথমিক শিক্ষকের আর একটি গুরু দায়িত্ব। (৭) শিশু যেন বিদ্যালয়-পরিবেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূলনীতিগুলি অনুশীলনের সুযোগ পায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতাই হ'বে বিদ্যালয়ের গণতন্ত্রের আদর্শ। শিশুরা যাতে আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারে, শিক্ষকের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন যাতে কম হয়, শিশুকে ক্রমশঃ সেই শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে হ'বে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণে শিশুদের যথাসাধ্য স্বাধীনতা দিতে হ'বে।

পাঠ্যবিষয়

প্রাথমিক শিক্ষার প্রাগুক্ত উদ্দেশ্যগুলি যাতে সাধিত হতে পারে তার জন্য নূতন ব্যবস্থার নিম্নের পাঠ্যবিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে ঃ—

(১) শরীর পালন।
(২) স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধূলা।
(৩) সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা।
(৪) সৃজনাত্মক কার্য ও কারুশিল্প।
(৫) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও কৃষি (সব্জীবাগ) সহ গৃহস্থালীর শিক্ষা।
(৬) ভাষা ও সাহিত্য।
(৭) সহজ অঙ্ক।
(৮) পরিবেশ-পরিচিতি।
  (ক) ইতিহাস।
  (খ) ভূগোল।
  (গ) প্রকৃতি-বিজ্ঞান।
(৯) শিল্প সঙ্গীত নৃত্যকলা।
(১০) নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষা।

শিশু শ্রোতা নয়—কর্মী

উপরের পাঠ্যসূচী চলিত পাঠ্যসূচী অপেক্ষা অনেকটা গুরুভার মনে হতে পারে, কিন্তু শিশুর সহজ উৎসাহ ও আনন্দের কেন্দ্র থেকেই এই সকল বিষয়গুলির উৎসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শিশুর উৎসাহ এবং আনন্দবোধ যদি একবার জাগ্রত হয় তবে কোন শিশুর পক্ষেই সেগুলি গুরুভার মনে করার কারণ হবে না। তবে প্রচলিত রীতি অনুসারে যদি শিশু নীরব শ্রোতার আসন গ্রহণ করে এবং শিক্ষক হন বক্তা তবে শিশুর পক্ষে এই পাঠ্যসূচী নীরস ও নিরর্থক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজের মাধ্যমে শিশু শিক্ষালাভ করবে, কাজ ক'রে সে আনন্দ পাবে। কাজ করতে করতে যখনই সে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার সমাধানের জন্য আগ্রহান্বিত হবে, তখনই সে বিষয়ে তাকে শিক্ষাদানের সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ। শিক্ষক সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকবেন এবং প্রয়োজনবোধে শিশুকে সমস্যার

সম্মুখীন ক'রে তার জানবার ইচ্ছাকে জাগরিত করবেন। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক্। মাটি দিয়ে শিশুরা নানাপ্রকার জন্তু জানোয়ার তৈরী করে। মাটি দিয়েই তারা সেগুলির লেজ লাগিয়ে দেয়, পা লাগিয়ে দেয়। খুব ভাল ক'রে তৈরী মাটি না হলে শুকিয়ে গেলে লেজ ও পা খুলে যায়। শিশুর পক্ষে এটা মহা বিরক্তির কারণ। দু'একবার এই সমস্যার সম্মুখীন হলেই শিশু শিক্ষকের সাহায্যের জন্য আসবে। শিক্ষকও তখন দেখিয়ে দিতে পারবেন কি ক'রে সরু তার কিংবা কাঠি ঢুকিয়ে লেজ ও পা দেহের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা যায় এবং এই সুযোগে, কিভাবে মাটি প্রস্তুত ক'রে নিতে হয় তাও দেখিয়ে দিতে পারেন।

কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতার মূল্য

শিশুরা জ্ঞানলাভ করে তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, শুধু দুটি কান দিয়ে শুনে নয়। সেই কথাটি আমরা ভুলে যাই; মনে করি কান দিয়ে যা শোনা যায় তা সবই অন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা মস্ত ভুল। কর্ণবিবরে যত জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীই ঢালি না কেন বেশীর ভাগই তার অন্য একটি বিবরপথে নিঃসারিত হয়ে যায়। তা না হলে যে ছেলে তার ঘুড়ি লড়াইয়ের যুদ্ধজয় কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে যেতে পারে সেই ছেলেটাই ক্লাইভ-সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধকাহিনী মনে রাখতে গলদঘর্ম হয় কেন? নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং তাকে অবলম্বন ক'রেই সমগ্র পরবর্তী জ্ঞান বিকশিত হয়; এই অবলম্বন সামান্য হতে পারে, কিন্তু ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার পক্ষে এর সাহায্য যে কতখানি প্রয়োজন তা একে সরিয়ে নিলেই বোঝা যায়।

শিশু তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে কর্মের মাধ্যমে; এই অভিজ্ঞতাই তার শিক্ষা। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু যাতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে সেইরূপ বিভিন্ন কার্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহের স্রোতঃপথকে বাধানিষেধের শিলায় রুদ্ধ ক'রে তার কাছে দেহমনের স্বাভাবিক বিস্তার আশা করা ভুল হবে; এতে সে দেহ ও মনে ক্ষীণ হয়ে যাবে।

সব সুস্থ শিশুই সক্রিয়

খাওয়া, খেলা, দৌড়ান, লাফান, ঝাঁপান, সাঁতরান, গান করা, কথা বলা, প্রশ্ন করা, কোনকিছুর দিকে তাকিয়ে থাকা, পরীক্ষা ক'রে দেখা, খুলে দেখা, গোলমাল করা, অনুকরণ করা, পরের কাজে সাহায্য করা, নূতন জিনিষ দেখা, বেড়াতে যাওয়া, অভিনয় করা, কাদামাটি নিয়ে খেলা করা, জল নিয়ে খেলা করা, ফুলের বাগান করা, জন্তু, জানোয়ার দেখা, জন্তু জানোয়ার পোষা, রান্না করা, রঙ করা, আঁকা, কাটাকুটি করা, সেলাই করা, ছাপ দেওয়া, লেখা, গোণা, ছবি দেখা, বই পড়া, গল্প শোনা, ছুটির দিনে স্ফূর্তি করা, বড়দের সঙ্গে থাকা এবং তাদের সঙ্গে কাজ করা, মিলেমিশে কাজ করা—শিশুরা প্রধানতঃ এই সকল কাজের ভিতর দিয়েই নিজেদের স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। স্কুলের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে এই বিচিত্র কিন্তু অতি স্বাভাবিক, কর্মধারায় অভিসিঞ্চিত হয়েই অধিকাংশ লোক বড় হয়। কিন্তু পাঠশালার কর্মসূচির মধ্যে শিশুদের বেলাতে যখন তাদের এই সকল কাজ করতে দেখি তখন আমরা বিরক্ত হই, এবং মনে করি তারা সময়ের অপব্যবহার করছে। কিন্তু তাদের এই ছেলেখেলাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং একে ভিত্তি ক'রেই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীও নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ স্বীকার করা হয়েছে যে, শিশুর স্বাভাবিক সক্রিয়তার মধ্যেই তাকে শিক্ষাদানের এমন সুযোগ পাওয়া যায় যে, অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি না ক'রেও এই কাজের মধ্য দিয়েই তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে এবং এই স্বীকৃতি মনোবিজ্ঞানসম্মতও বটে।

শিশুর অভিজ্ঞতার প্রকারভেদ ও অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা

বিদ্যালয়ে শিশু কাজ করতে করতে নানাভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। তবে সাধারণতঃ তিনভাগে তার এই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভাগ করা যায়:—

(১) লৌকিক বা সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে মিশে সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে (যেমন দলবদ্ধ খেলাধুলা, বেড়ান, মেলামেশা)।

(২) বস্তু-সাপেক্ষ অভিজ্ঞতা (যেমন বাগানের কাজ থেকে, পুতুল খেলা থেকে, ধোওয়া মোছা থেকে, ছবি আঁকা, পুতুলগড়া, কাগজ কাটা, রান্না করা, ফুল তোলা সাজান-গোছান প্রভৃতি থেকে)।

(৩) পুস্তকলব্ধ অভিজ্ঞতা (যাকে বলা চলে Second-hand বা হাতফেরতা অভিজ্ঞতা) যার মূলে তার নিজস্ব বলতে বিশেষ কিছুই নাই। পুস্তকে যে সকল অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণিত থাকে তার অনেক কিছুই শিশুর নিকটতম জগতের বিষয়বস্তু নয় বলেই তার পক্ষে এই সকল অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব করতে এত বেগ পেতে হয়। এবং বেগ পেতে হয় বলেই তার পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত মুখস্থ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

নব-পরিকল্পিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাই শিশুর সুকোমল স্কন্ধ থেকে পুস্তকের অযথা গুরুভার লাঘব ক'রে তাকে কাজের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ দেওয়ার বিষয় চিন্তা করা হয়েছে। যেমন তকলীর চাক্তি খুলে গেলে দণ্ডটিকে গরম ক'রে চাক্তিটিকে লাগাতে হয়; গরমে প্রত্যেক জিনিষের আয়তন প্রসারিত হয় এবং শৈত্যে সঙ্কুচিত হয়। তকলী মেরামত করতে গিয়ে শিশু সেটা আবিষ্কার করবে।

অনুবন্ধপ্রণালী

শিশুর অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত হতে দিলে শতমুখী ধারায় সে প্রবাহিত হতে থাকবে; আমাদের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের পরিপোষক গতিপথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করাই হবে শিক্ষকের কাজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নিকটতম পরিবেশ অর্থাৎ বিদ্যালয়গৃহ, গ্রাম কিংবা শহর সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করবে; সেটাই হবে তার ভৌগোলিক জ্ঞানের ভিত্তি এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করতে পারলেই শিশুর ভূগোল পাঠের সূচনা হল। এইরকমভাবেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এরই নাম অনুবন্ধপ্রণালী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—

(১) শিশু সূতা কাটার পর সেই সূতা 'অটেরনে' জড়ায়। এক তার সূতা ৪ ফুট লম্বা; দশ তার সূতা কত ফুট হবে?

(২) চরকার বড় চাকাটা একবার ঘুরলে ছোট চাকাটা ৫ বার ঘোরে; ছোট চাকাটা একবার ঘুরলে টাকুটা যদি ২২ বার ঘোরে তবে বড় চাকাটা একবার ঘুরলে টাকুটা কতবার ঘুরবে? এইসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে শিশুর গণিত শিক্ষা হবে। এমনিভাবে শিশুর কাজের মধ্য দিয়ে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, শিক্ষককে তার সাহায্যেই বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হবে।

সুতরাং অনুবন্ধপ্রণালীতে শিক্ষা হল শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত শিক্ষা। পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষায় শিশুর জীবন ও পাঠশালার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সুগভীর ব্যবধান রচিত হয়েছিল। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনকেন্দ্রিক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা বিচিত্র এবং প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা প্রেরণাস্বরূপ হয়ে বহু সমস্যা উপস্থিত করে, বহুমুখী আগ্রহ (interest) ও কৌতূহল জাগরিত করে এবং বহু কর্মের উত্তেজক হয়। শিক্ষক তার মধ্যে সেইগুলিকেই বেছে নেবেন যা তিনি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল ও জীবনপথের পাথেয় হবার উপযোগী বলে মনে করবেন। শিক্ষকের কাজ হল নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ এবং তা তিনি করবেন উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও আনন্দদায়কতার ভিত্তিতে।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহলকে কেন্দ্র ক'রে যে সকল তথ্যাদি শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে, শিক্ষক সেইসবের দিকেই দৃষ্টি দেবেন। অসম্পৃক্ত এবং অনুপযোগী তথ্যাদি পরিবেশন করবার প্রয়োজন নাই। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহের সঙ্গে যার যোগ নাই সেরকম তথ্য শিশুর কাছে বিরক্তিকর এবং শিশুকে তা শেখাতে গেলে তার মানসিক বদহজমের সম্ভাবনা আছে যেমন পুরাতন পদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষায় হয়েছিল।

৬।৭ বৎসরের শিশু কাজ ক'রে যে আনন্দ পায়, উপকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তার যে অনুভূতি হয় এটাও একটা কম শিক্ষা নয়। স্বাভাবিকভাবে সেই কাজ থেকে সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় যদি না আসে তবে জোর ক'রে সেগুলি টেনে আনার কোন প্রয়োজন নাই। যেমন—শিশু কাঠের প্যাকিং বাক্স থেকে একটা খেলাঘর তৈরী করছে। মোটা একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সে মনের আনন্দে পেরেক ঠুকে যাচ্ছে। এতে কি তার কোন শিক্ষা, কোন জ্ঞানই লাভ হচ্ছে না? মাংসপেশীর চালনা থেকে শারীরিক উন্নতি, পেরেক ঠুকতে গেলে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং কেমন ক'রে সে অসুবিধা দূর করতে হয় (পেরেক বেঁকে যায়, একপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সামান্য এদিক্‌ ওদিক্‌ হলে হাতুড়ি এসে বাঁ হাতে আঘাত করে ইত্যাদি)—এ সকলও ত তার নিজের অজ্ঞাতেই শিক্ষা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানেই যদি অত্যুৎসাহী শিক্ষক কাঠ এবং কাঠের প্রকারভেদ, কোথায় কেমন কাঠ হয় ইত্যাদি তথ্যের দিকে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে এবং শিশুর পক্ষেও বিরক্তিকর হতে পারে। সৃষ্টির আনন্দে সে যখন মশগুল ঠিক সেই সময়ে কতগুলি তথ্য শিখতে তার ভাল লাগে না। বিভিন্ন প্রকারের কাঠ নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সে নিজেই যখন কাঠের প্রকারভেদ বুঝতে পারে, তখনই হল সেই শিক্ষা দেবার উপযুক্ত সময়। সুতরাং ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তার স্বাভাবিক আগ্রহ অনাগ্রহকে উপেক্ষা না ক'রে কাজকে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত করতে হবে; শিশুর সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা এবং কাজের মধ্যে দিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষার যে পরিপূর্তি সেইটাই যেন প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হয়। এই কাজের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের যে যে জিনিষ স্বাভাবিকভাবে আসে শিক্ষক সেইগুলিরই আলোচনা করবেন, অস্বাভাবিক অনুবন্ধ প্রণালী পরিহার করবেন।

নিম্নে কিভাবে একটি কাজকে উপলক্ষ্য ক'রে শিশুকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তার একটি নমুনা দেওয়া হ'ল। বলা বাহুল্য শিক্ষণীয় বিষয় শিশুর বয়স ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে। নীচে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীর শিশুরা 'বাগান করা'কে কেন্দ্র ক'রে কি কি করতে এবং শিখতে পারে তা দেখান হ'ল (স্থান, কাল এবং শিশুর যোগ্যতা পার্থক্য অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়েরও পরিবর্তন করতে হবে)।

প্রস্তুতি।—কিভাবে কাজ করতে হ'বে অর্থাৎ বাগানটিকে কিভাবে তৈরী করতে হ'বে, কোথায় কোন গাছ দিতে হ'বে, কোন সার দিতে হ'বে, কিভাবে গরু-বাছুরের উপদ্রব থেকে গাছগুলিকে রক্ষা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা স্থির করা।

কর্মপদ্ধতি।—ছেলেমেয়েরা বাগানের জায়গাটিকে মাপ্‌বে; সেটিকে প্রয়োজনবোধে ভাগ ক'রে নেবে এবং আগাছা পরিষ্কার ক'রে মাটি প্রস্তুত ক'রে নেবে। মাটিতে প্রয়োজনমত সার দিয়ে নিতে হবে এবং পরে চারাগুলিকে সারি সারি লাগিয়ে দিতে হ'বে। সারিগুলির দূরত্ব সমান হ'বে, একটি চারা থেকে অন্য চারার ব্যবধানও সমান রাখতে হ'বে। একটি কিংবা ততোধিক চারার লালনপালনের ভার একটি শিশু গ্রহণ করবে; তাতে জল দেওয়া, তার গোড়া থেকে আগাছা পরিষ্কার করা, তার বৃদ্ধির মাপ রাখার ভারও সে গ্রহণ করবে। কতকগুলি চারাতে সার না দিয়ে দেখা যেতে পারে সার দেওয়া গাছের সঙ্গে তাদের পার্থক্য হয় কিনা।

(ক) কি কি 'বিষয়' শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।—প্রয়োজনীয় কোন কিছু করার পূর্বে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, এই কাজের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা সে শিক্ষা লাভ করবে এবং এ সম্বন্ধে সমস্যার উদ্ভব হ'লে (যেমন—গাছে পোকা লাগ্‌লে, পাতা শুকিয়ে আসতে থাক্‌লে কিংবা আশানুরূপ 'বাড়' না হ'লে) তার সমাধানে নিজেরাই সচেষ্ট হ'বে এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হ'বে।

(খ) মাতৃভাষা।—প্রস্তুতির সময় আলাপ আলোচনার মারফৎ ছেলেমেয়েরা মনের ভাব সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশের স্বাভাবিক সুযোগ পাবে। কাজের দৈনন্দিন হিসাব রাখতে শিশুকে কিছু না কিছু লিখ্‌তে হ'বে। যে ঋতুতে বাগান করা হচ্ছে সেই ঋতুর ফুল-ফল-প্রাকৃতিক

শোভা সম্বন্ধে গল্প কিংবা কবিতা ছোটদের পড়ে শোনান যেতে পারে কিংবা তা'রা লিখতে পড়তে সক্ষম হ'লে নিজেরাও পড়তে পারে এবং দু'চার লাইন কবিতা বা প্রবন্ধ নিজেরা রচনা করতে পারে।

(গ) অঙ্ক।—বাগানটি দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে কত হাত ছেলেমেয়েরা সেটি নিজেরাই মাপতে শিখবে। হাত এবং গজ সম্বন্ধে এর থেকে ধারণা হ'বে। ২০ হাত লম্বা বাগানের এক হাত অন্তর যদি সার হয় তবে ক'টা সার হ'বে, প্রত্যেক সারেতে কটি ক'রে গাছ দেওয়া যাবে, মোট ১৮টি সারেতে কতগুলি চারা বসান হ'ল ইত্যাদি অঙ্ক সম্বন্ধীয় ধারণাও তারা বাগানের কাজ করতে করতেই সঞ্চয় করতে পারবে। গাছটিকে মাপার জন্য স্কেলের ব্যবহারও শিশু নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদেই শিখবে আশা করা যায়। উৎপন্ন ফসল ওজন করা, তার মূল্য নিরূপণ করা প্রভৃতি দ্বারাও তা'রা ব্যবহারিক অঙ্কের সঙ্গে পরিচিত হ'বে।

(ঘ) ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি।—গ্রামের কিংবা সহরের অন্যান্য বাগানে কি লাগান হচ্ছে সেটাও শিশুরা নিজেরাই দেখে আসবে। চাষীরা উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কিভাবে কোথায় বিক্রী করে, কোথায় হাট বসে এবং হাটে অন্যান্য কি কি জিনিষ বিক্রী হয় ছেলেমেয়েরা হাটে গিয়ে (নিকটে হ'লে) সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এমনি ক'রে বিভিন্ন মানুষ ও তাদের জীবিকা, বিভিন্ন বস্তু ও তাদের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে ৬।৭ বৎসরের শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে তাকে ভিত্তি ক'রেই তাদের ইতিহাস ভূগোলের জ্ঞান গড়ে উঠতে পারে।

(ঙ) **প্রকৃতিপরিচয়, বিজ্ঞান, শরীরচর্চা ইত্যাদি।**—শিশুরা বাগানের কাজে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যে সুযোগ লাভ করবে 'প্রকৃতি-পাঠ' জাতীয় কোন পুস্তক পড়ে তা' লাভ করা অসম্ভব। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম, অঙ্কুর থেকে চারাগাছ এবং ক্রমশঃ তার বৃদ্ধি, ফুলে ফলে তার সমৃদ্ধি—সব কিছুই শিশুর কাছে প্রকৃতির অনন্ত রহস্য নিয়ে আসে; ক্রমশঃ শিশু প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হয় প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে, প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে এই পরিচয়ই তার বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথম সোপান হতে পারে।

বাগানের কাজে (যেমন—জল দেওয়া, আগাছা তোলা, ছোট ছোট কোদালি দিয়ে মাটি কোপান ইত্যাদি) ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক অঙ্গচালনার প্রচুর সুযোগ আছে এবং মুক্ত বাতাসে ও খোলা হাওয়ায় ছেলেমেয়েরা কাজ করলে বৃক্ষ-শিশুর মতই যে তারা সবল সতেজ প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষকই বোধ হয় একমত হবেন।

অনুবন্ধপ্রণালীর উপরোক্ত উদাহরণ থেকে যেন শিক্ষক মনে না করেন যে সব 'বিষয়ই' পর্যায়ক্রমে কোন একটি কাজকে উপলক্ষ্য ক'রে শিক্ষা দেওয়া যাবে। 'পাঠ্যবিষয়ের' বহির্ভূত গুণাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ (যেমন—সহযোগিতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরক্তি, রুচিবোধ ও রুচিবিকাশ ইত্যাদি) এইরূপ কোন কাজকে উপলক্ষ্য ক'রে যেমন হ'তে পারে, তেমনি কতকগুলি 'পাঠ্যবিষয়'কে স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে যুক্ত করা অযৌক্তিক হ'বে না।

পাঠ্যবিষয়ের অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে যে কথা পরে বলা হয়েছে উপরোক্ত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় তার প্রমাণ মিলবে। গাছে জল দিতে দিতেই শিশু গাছে জল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, সরস ও শুষ্ক মাটির পার্থক্য সম্বন্ধে যেমন জিজ্ঞাসু হয়ে উঠতে পারে, আবার নূতন কোন পোকা দেখে তার সম্বন্ধেও কৌতূহলী হয়ে ওঠা তার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষ ঋতুতে বিশেষ ফুল ফল দেখা যায় কেন, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণ কি (যেমন—শিশির, রোদ, বৃষ্টি ইত্যাদি) এ সম্বন্ধেও সে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে। বিজ্ঞানের ক্লাশের কিংবা প্রকৃতি-পরিচয়ের ক্লাশের জন্য অপেক্ষা না ক'রে শিশুর মানসিক বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তার প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দেওয়াই সমীচীন। তার কৌতূহলের পূর্ণ চরিতার্থতার জন্য যেন সে পুস্তকপাঠের দিকে আকৃষ্ট হয় শিক্ষক সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন।

পুস্তকহীন শিক্ষা

নূতন প্রণালীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছবির বই ভিন্ন অন্য কোন বই থাকবে না। প্রচলিত প্রথায় প্রথম শ্রেণী থেকেই বই পড়ার দিকে রীতিমত জোর

দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনেকগুলি পুস্তকই পড়তে হয়। প্রথম দুই শ্রেণীতে বই না থাকলে শিশুর শিক্ষা কিভাবে অগ্রসর হবে এ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষক এবং অভিভাবক চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কিন্তু যদি শিশুকে মুখে মুখে ছড়া বলতে—আবৃত্তি ও অভিনয় করতে শেখান যায় নিত্যকারের খবর বলতে বলা হয় তবে সে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতে, বাচনভঙ্গী অভ্যাস করতে, জিহ্বার জড়তা কাটিয়ে উঠতে শিখবে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দসম্ভারও বাড়বে। এতে তার ভাষাশিক্ষা হবে। তাছাড়া পুস্তক পাঠের অত্যাবশ্যক সোপান হিসাবে এগুলির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যে শিশু ভাল ক'রে নিজের মনের ভাবই প্রকাশ করতে শিখল না কি ক'রে আশা করা যায় যে, সে অন্যের মনের ভাব সঠিকভাবে বুঝতে পারবে? সহজ সরল কতকগুলি ছন্দোবন্ধ ছড়া কিংবা কবিতা যদি তাকে ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে মুখে মুখে শেখানো যায় তবে পরবর্তী কালে সে সাবলীল ভঙ্গীতে কবিতা পড়তে পারবে বলে আশা করা যায়। সুস্পষ্ট উচ্চারিত ভাষায় সে যদি প্রথমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তবেই আশা করা যায় যে সে পরে পুস্তক পাঠ ক'রে তার ভাব ও ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিশু নিজে না পড়লেও শিক্ষক নিজে প'ড়ে তাদের শোনাবেন। বইয়ে ছবি থাকে, গল্প থাকে, কবিতা থাকে এবং তা থেকে আনন্দ লাভ করা যায়—প্রথমে শিশুর মনে এই ধারণা জন্মান দরকার। ক্রমশঃ শিশু নিজে না পড়তে পারলেও বই নিয়ে ছবি দেখতে চাইবে, শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে বইয়ের গল্প শুনতে চাইবে এবং পরিশেষে নিজেই নিজের কৌতূহল ও আকাঙ্খার তাগিদে পড়তে চাইবে।

শুধু ভাষা শিক্ষার বেলাতে নয়, অন্যান্য বিষয়বস্তুও এইভাবে প্রথমে পুস্তকের সাহায্য ছাড়াই আরম্ভ করা যেতে পারে এবং ক্রমশঃ পুস্তকপাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শিশুকে সজাগ ও সক্রিয় করে তোলা যেতে পারে।

অন্যের লিখিত পুস্তক, অন্যের ভাষা পড়ার পূর্বে শিশু নিজেই নিজের পুস্তক প্রস্তুত করে নিতে পারবে। যেটা হবে তার 'লেখার বই' সেটার আরম্ভ হবে হয়ত হিজিবিজি দিয়ে এবং ক্রমশঃ এই হিজিবিজিই অক্ষরে রূপ পরিগ্রহ করবে। এমনিভাবে তার পড়ার বই হবে ;— ছবি এঁকে ছবি কেটে কাগজে সেঁটে নিয়ে সুরু হবে তার পড়ার বই; জন্তু জানোয়ারের ছবি, পাখীর ছবি কেটে নিয়ে তার নিজের খাতায় সেঁটে নিয়ে তৈরী করবে সে 'ছবির বই', 'পাখীর বই'। নিজের বইটা যাতে অন্যের বইয়ের সঙ্গে মিশে না যায় তার জন্য সে লিখতে চাইবে নিজের নাম—এমনি ক'রে স্বাভাবিকভাবে আনন্দময় পরিবেশের ভিতর দিয়ে, খেলার মধ্য দিয়ে সে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে লেখাপড়ার দিকে ; আর তখনই সে তার ভিতরে আনন্দ খুঁজে পাবে, নূতন নূতন জ্ঞানের খনি আহরণে পুস্তক হবে তার সহায়।

পাঠ্যসূচীর অবিভাজ্যতা

শিশুর কাছে বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির পৃথক সত্তা নেই ; সে যা শেখে তাকে সে 'লেবেল' মেরে, মনের মধ্যে আলাদা ক'রে সাজিয়ে রাখে না। ছোট শিশুকে সেই-জন্য আলাদা আলাদা ক'রে—এটা ইতিহাস, এটা ভূগোল, এটা বাংলা—শেখানর প্রয়োজন হয় না। অথচ আমরা আজ পর্যন্ত তাকে ইতিহাসের ঘণ্টায় ইতিহাস, ভূগোলের ঘণ্টায় ভূগোল—এইভাবে পড়তে শিখিয়ে আসছি। ইতিহাসের গল্প শুনতে শুনতে সে ভূগোলের তথ্য জানতে পারে, অঙ্ক শিখতে পারে, স্বাস্থ্যনীতির দু'চার কথা জেনে নিতে পারে। শিক্ষকের জন্য ক্রমশঃ পাঠ্যবিষয়ের ভাগাভাগির প্রয়োজন হলেও প্রথমদিকে এই বিভাজ্যতার কোনই প্রয়োজন নাই এবং একই শিক্ষক একই শ্রেণীতে একই সময়ে ছাত্রদের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন।

দৈনন্দিন কার্যসূচী

নূতন ব্যবস্থায় দৈনিক ৪ ঘণ্টা শিশুদের বিদ্যালয়ে থাকার কথা। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় শিশুরা এর চেয়ে কম সময় বিদ্যালয়ে থাকে ; সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে শিশুরা—বিশেষতঃ

৬।৭ বৎসরের শিশুরা—এতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাক্‌তে চাইবে কি না এবং এতে তাদের উপর জুলুম করা হবে কি না। কিন্তু এই চার ঘণ্টার মধ্যে লিখন পঠনের জন্য মাত্র ১½ ঘণ্টা নির্দিষ্ট আছে; বাকী ২½ ঘণ্টা হাতের কাজ, স্বৈচ্ছিক কাজ, খেলাধুলা, টিফিন প্রভৃতির ব্যবস্থায় ব্যয়িত হবে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, শিশুকে জোর ক'রে কাজে কিংবা লেখাপড়ায় লাগিয়ে দিলে সে তাতে যতটা মনোযোগ দিতে পারে, নিজের খুসীমত কাজ করতে দিলে এমন কি পড়তে দিলেও সে তার চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ মনঃসংযোগ করতে পারে। সুতরাং নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন পড়ার ছলে খেলার এবং কাজের ব্যবস্থাই বেশীক্ষণের জন্য হবে, তখন শিশু তার স্বনির্বাচিত কাজ কিংবা খেলায় বিরক্তিবোধ না ক'রে আনন্দই বেশী পাবে এবং অনেক সময় তাকে জোর ক'রে কাজ থেকে টেনে আনতে হবে। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে শিশুকে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব সেটুকু দিতে হবে। কাজের স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, খেলাধুলার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা—মোট কথা সর্বপ্রকারের স্বাধীনতার ভিত্তি যেন প্রাথমিক বিদ্যালয়েই স্থাপিত হয়। এই স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ে উঠলে তা যে অন্য সকলের বিরক্তির ও ক্ষতির কারণ হয়, শিশু নিজেই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শিখবে এবং তখন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিক্ষককে আর বিশেষ চিন্তিত হতে হবে না। তবে কিছু গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক এবং ছোট শিশুদের পক্ষে পূর্ণ নীরবতায় কাজ করা অস্বাভাবিক এবং অনভিপ্রেত। কিন্তু প্রয়োজন হলে যে নীরবে ও সুশৃঙ্খলভাবে চলতে হয়, সে শিক্ষাও তারা বয়সের সঙ্গে (যেমন যেখানে তারা নিজেরাই কোন সভা সমিতির আয়োজন করবে, কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে সেখানে) উপলব্ধি ক'রে সেই অনুসারে নিজেদের চালিত করতে শিখবে এবং শিশু ক্রমশঃ বুঝতে পারবে কোথায় এবং কখন কথা বলতে হ'বে আর কখন নীরব থাক্‌তে হ'বে।

শিশুর আনন্দ ও আগ্রহ

কাজ কিংবা খেলা কিংবা পড়া যাই হোক না কেন, সর্বত্রই শিশুর আনন্দের মূল সুরটা যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে সে সেই বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। স্বাধীনতা ও আনন্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটাকে ছেড়ে অন্যটির চিন্তা করা যায় না। আর আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শিশু যে কাজ করবে তাতে সে যতখানি শিক্ষালাভ করবে, বক্তৃতা শুনে তার শতাংশের একাংশও শেখা কঠিন। এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিশু লেখা এবং পড়াতে আনন্দই পাবে; লেখাপড়াকে ভীতিস্বরূপ ব'লে কিংবা পরীক্ষা পাশের জন্যই প্রয়োজন মনে ক'রে শিখবে না। কাজ করতে করতে শিশু যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'বে, তখনও তা' শিশুর বিরক্তির কারণ হ'বে না, বরং সেই সমস্যার সমাধানে সে তা'র সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে; আর যখন সেই সমস্যা সমাধানে সে কৃতকার্য হ'বে তখন তার আনন্দই তার শিক্ষার পথ সুগম ক'রে দেবে।

শৃঙ্খলারক্ষা।—অনেকে মনে করতে পারেন শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দিলে সে অবাধ্য, এঁকগুঁয়ে, অভদ্র ও অবিনয়ী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতার পরিবর্তে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রাখলেও তো অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঐ সকল দোষ দেখা যায়। কঠোর শাসনের ফলেই অনেক ছেলেমেয়ে খারাপ হয়ে গেছে এমনও তো উদাহরণ আছে। স্বাধীনতা দিলে প্রথমতঃ শিশুরা কিছুটা চঞ্চল হতে পারে এবং তাদের মধ্যে বাচালতা কোলাহলপ্রিয়তা দেখা যেতে পারে, কিন্তু অন্যের বাচালতা কিংবা চঞ্চলতার ফলে যখন তাদের নিজেদেরই স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটবে তখনই তারা ঐ সকল দোষকে দোষ ব'লে স্বীকার করবে এবং তার নিরাকরণের জন্য সচেষ্ট হবে। শৃঙ্খলা যেখানে আপনা থেকেই আসে, সেখানে শৃঙ্খলা শৃঙ্খল হয়ে ওঠে না এবং সেই শৃঙ্খলাই আদর্শ শৃঙ্খলা। শিশুদের কাছে এরূপ শৃঙ্খলা

সহজে আশা করা যায় না। দৈনন্দিন কার্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনের জন্য শিক্ষক কয়েকটি কথা মনে রাখতে পারেন—

(১) অতিরিক্ত শৃঙ্খলা কিংবা শান্তিরক্ষার জন্যও তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করবেন না তেমনি অতিরিক্ত শৈথিল্য প্রদর্শন দ্বারা শিশুদের অবাধ্য কোলাহলপ্রিয় দুর্বিনীত হতে সহায়তা করবেন না।

(২) শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলারক্ষা আবশ্যক কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; এটা একটা উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত উন্নততর ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া এবং যাতে এই উন্নত ব্যবহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় তাকেই শৃঙ্খলা বলা যেতে পারে। আর যত কঠোরতাই অবলম্বন করা হোক না কেন তাতে যদি ব্যবহারের কোন প্রকার উন্নতি না হয় তবে তাকে শৃঙ্খলা বলা চলে না।

(৩) প্রত্যেক শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেদিকে শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে শ্রেণীর মত নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। যেমন—পূর্বদিনে ছেলেমেয়েরা মেজে মাটি দিয়ে নোংরা ক'রে রেখে গিয়েছিল—এ রকম হলে কি অসুবিধা হয় এবং কি করা উচিত? এই ছেলেটা কাঠের কাজ করতে করতে সেই কাজ ফেলে সুতো কাটা দেখছে এবং গোলমাল করছে—সুতো কাটার দলের এতে অসুবিধা হচ্ছে। এ রকম করা কেন অনুচিত? এই ছেলেটা কাল পকেটে ক'রে মার্বেল লুকিয়ে নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল। সে আজও মার্বেলটা আনেনি। তাতে মার্বেল খেলোয়াড়দের একটা মার্বেল কম পড়েছে। এখন আমাদের কি করা উচিত? এমনইভাবে দৈনন্দিন শ্রেণী পরিচালনার কার্য থেকে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হবে সেইগুলি থেকেই শৃঙ্খলারক্ষার অনেকগুলি মূলনীতি ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা ক'রেই নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা নিজেরাই শৃঙ্খলারক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন ক'রে নিতে পারে—যেমন ঃ—

(ক) গোলমাল করলে অন্যের অসুবিধা হয়—অতএব গোলমাল করা ভাল নয়।

(খ) অন্যের কাজের সময় তাকে বিরক্ত না করাই ভাল।

(গ) তোমার কাজ হয়ে গেলেই অন্যকে হাতিয়ার দিয়ে দিও।

(ঘ) কাজ হয়ে গেলে ঘর পরিষ্কার ক'রে রেখো এবং জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখো।

(ঙ) না বলে শ্রেণীর জিনিষ নিয়ে গেলে অন্যের অসুবিধা হয়।

নিত্য নূতন সমস্যা থেকেই এ সকলের সমাধানও তারা নিজেরাই খুঁজে পেতে পারে যদি শিক্ষক সক্রিয়ভাবে তাদের সাহায্য করেন এবং তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।

(৫) শিক্ষক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনাকে পূর্বাহ্নেই যথাসম্ভব এড়ানর চেষ্টা করবেন। যেমন,—শিশুরা রং দিয়ে কাগজের উপর আলুর কিংবা ঢেঁড়সের ছাপ দেবে। তিনি রংএর বাটি তাদের কাছে রেখে আলু আনতে গেলেন। ইত্যবসরে কয়েকটা শিশু রংএর বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে তাই দিয়ে ছাপ দিতে লাগল। রং কাপড়ে লাগল, মুখে লাগল। দোষ কার? যদি কারও দোষ হয়ে থাকে, সে তো শিক্ষকের।

(৬) যে শাস্তি অপমানকর তা শারীরিক হোক বা না হোক তা বর্জনীয়।—শিশুকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া চলতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রত্যেক শিক্ষকই কোন না কোন সময় দ্বিধায় পড়েন। শারীরিক শাস্তি সর্বপ্রযত্নে বর্জনীয়; কারণ অনেক সময় শিশু শাস্তিভোগের প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজে পায় না; তার শিশুমনে অন্যায় সম্বন্ধে যে ধারণা আছে আমাদের ধারণার সঙ্গে তার মিল

নেই সেইজন্যই অনেক সময় তাকে শাস্তি পেতে হয়। সুতরাং শাস্তি যদি তাকে দিতেই হয় তবে প্রথমে শিশুকে তার অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন করতে হ'বে এবং তাকে সতর্ক করে দিতে হ'বে; তা'তেও যদি না হয় তবে মৃদু তিরস্কার করা যেতে পারে। তা'কে অন্যায়ের সুযোগ না দিলে শিশু অনেক সময় আর অন্যায় করবে না। শিক্ষক অপরাধীর সঙ্গে অসহযোগিতা করলে (যেমন—কথা না বললে কিংবা তা'কে খেলা থেকে বাদ দিলে) অনেক সময় সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শারীরিক শাস্তি দিলে শিশুর মনে যে ভীতি ও শিক্ষকের প্রতি বৈরভাব জাগে, সেটা শিশুর দেহ ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অনেক সময় ব্যাহত করে।

শিশু নিজেই নিজের শিক্ষক।—কাজের মাধ্যমে যেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা, সেখানে শিশুকেই কাজ করতে দিতে হ'বে, শিক্ষক থাক্‌বেন তার পশ্চাতে, অলক্ষ্যে। আদর্শ কর্ম-কেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান পরোক্ষ, শিশুই প্রত্যক্ষ। শিশু কাজ করবে আপন মনে; যখন সমস্যার সম্মুখীন হ'বে তখনই কেবল সে শিক্ষকের সাহায্যের জন্যে তাঁকে ডাকবে বা তাঁর কাছে আসবে। শিক্ষকের পক্ষে সেইজন্য একই সময়ে হাতের কাজ পরিচালনা করা এবং লিখন-পঠনে সহায়তা করা সম্ভব। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষালাভ করবে। শিক্ষক তাকে সহায়তা করবেন মাত্র। চিরাচরিত প্রথায় আমরা যদি শিশুকে আমাদের মতই মনে করি এবং আমাদেরই কথা, আমাদেরই অভিজ্ঞতার কাহিনী তার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করি, তবে আমরা পূর্বের ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করব। শিশু তার শিশুদেহ শিশুমন দিয়েই সমস্ত কিছু দেখতে ও শিখতে শিখুক, নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করুক; আমরা তাকে শুধু সঙ্কটকালে সাহায্য করার জন্য থাক্‌ব—শিক্ষক যেন এই কথাটি ভুলে না যান্।

উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা।—আমাদের নিজস্ব কৃষ্টির ছাপ যেন শিশুর সরল মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে এবং জাতীয় জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা কোথায় এবং কেন, সে সম্বন্ধেও শিশু যেন ক্রমশঃ জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। উৎসব অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কি, কি প্রকারে সেগুলিকে পালন করা উচিত, তার থেকে আমাদের কি শিক্ষণীয় আছে, কিভাবে কুসংস্কারমুক্ত ক'রে সুরুচিসম্মত উপায়ে সেগুলি পালন করা যায় শিক্ষক সেদিকেও দৃষ্টি দিবেন। স্থানীয় উৎসব অনুষ্ঠানে শিশুদের নিয়ে যোগ দেওয়া, স্থানীয় মেলা প্রভৃতিতে তাদের নিয়ে যাওয়া, এগুলিও শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বিবেচনা করতে হ'বে। শিশুরা উৎসব করলে কিভাবে উৎসব-প্রাঙ্গণটিকে রুচিসঙ্গত উপায়ে সাজান যায়, কিভাবে সৌজন্য, শিষ্টাচার, আন্তরিকতার সঙ্গে নিমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে হয়, কিভাবে যথানিয়মে এবং যথাসময়ে কার্যসূচী অনুসারে কাজ আরম্ভ ও শেষ করতে হয়—এগুলিও শিশুদের অবশ্য শিক্ষণীয়। প্রচলিত পালপার্বণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে তাকে রুচিসঙ্গত উপায়ে পালন করতে শেখান এবং তার থেকে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, কথা, গান, গল্প প্রভৃতি অনুবন্ধপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে পুরাতন প্রথাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে শিখলে তাই থেকেই শিশু অনেক কিছু শিখতে পারে। আর এমনি ক'রে বিদ্যালয়টি হয়ে উঠ্‌তে পারে গ্রামের প্রাণস্বরূপ, কৃষ্টি-সম্মেলনের কেন্দ্র; সেখানে এসে অভিভাবকগণ নিজেদের শিশুদের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে যেতে পারবেন এবং ইচ্ছা করলে নিজেরাও তাদের নির্দোষ আমোদে যোগ দিতে পারবেন।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।—শিশু ভবিষ্যতে যে সমাজে বাস করবে তার সম্বন্ধে যে তার দায়িত্ব আছে এবং তার উপর তার অধিকারও আছে সেই ধারণার সৃষ্টি হবে এই বিদ্যালয়ক্ষেত্রেই। ভবিষ্যৎ জীবনে যৌথভাবে সমাজজীবন যাপন করার শিক্ষা আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা দিতে পারিনি; কিন্তু আমাদের ভুল্‌লে চলবে না যে আমাদের বিদ্যালয়ের ছোট্ট সমাজেই ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরী হচ্ছে এবং আমরা তার ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবন গঠন করতে অনেকাংশেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। বিদ্যালয়ের সমাজজীবন যদি গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, শিশুরা যদি নিজেরাই

নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্ধারণ করতে, তার আদেশ পালন করতে, এবং তার কাজের সমালোচনা করতে শেখে, তবেই ভবিষ্যৎ জীবনে নাগরিক দায়িত্ব এবং দাবী সম্বন্ধে সে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবে। নতুবা ভোটের বাজারের পণ্য হয়ে সে গড়ে উঠবে, নিজেই স্বাধীন মতামত প্রকাশের শিক্ষা সে কোনদিনই পাবে না। শিশুরা নিজেদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী নির্বাচন করবে, নিজেরাই আইন প্রণয়ন করবে, নিজেদের তৈরী বিচার-সভাতেই আইন ভঙ্গকারীর বিচার করবে। শিক্ষক হবেন উপদেষ্টা ও বন্ধু এবং তিনিও শিশুর সৃষ্ট আইনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। এইভাবেই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে।

উৎপাদনাত্মক শিল্প

প্রশ্ন হতে পারে শিশুরা যে কাজ করবে তা যদি শুধু উপকরণের অপচয়ই হয়, প্রস্তুত দ্রব্যের কোন মূল্যই না থাকে, তবে কতদিন আমাদের গরীব দেশ এই অপচয়ের জন্য অর্থ জুগিয়ে যেতে পারবে? প্রথম দুই বৎসরে অর্থাৎ ৬।৭ বৎসরের বয়সে শিশু কিছু উপকরণ 'নষ্ট' করবে, সন্দেহ নেই; কিন্তু ক্রমশঃ সে শিক্ষকের পরিচালনায় নিজেই নিজের কার্যের সমালোচনা করতে শিখবে এবং উন্নততর নৈপুণ্যলাভের জন্য সচেষ্ট হ'বে। ১০।১১ বৎসর বয়সে সে যতটুকু নৈপুণ্য লাভ করবে তাতে ক'রে আশা করা যায় যে সে এমন কাজ করতে পারবে যার কিছুটা ব্যবহারিক মূল্য আছে; প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা ঐ দ্রব্যের কাঁচামালের দাম উঠে আসবে, কিছু লাভও হতে পারে; বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হতে পারে। শিশু যাতে ক্রমশঃ উন্নততর নৈপুণ্যের দিকে এগিয়ে যায় সে বিষয়ে শিক্ষক সর্বদা দৃষ্টি রাখবেন। শিশু যে কাজ করবে সে কাজ যাতে সুন্দর এবং রুচিসঙ্গত হয় এবং প্রয়োজনে আসে সেদিকে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। প্রথম প্রথম অবশ্য শিশুদের বিশেষ মূল্যবান উপকরণ দেওয়া সম্ভব হ'বে না। সেইজন্য অনাবশ্যক এবং পুরাণো জিনিষপত্র (যথা পুরাণো কাগজের বাক্স, খবরের কাগজ, প্যাকিং বাক্স, দেশলাইয়ের খালি বাক্স, পুরাণ কাপড়, পাড়, টিনের বাক্স, ছেঁড়া মোজা, খেলনা ইত্যাদি) দিলেও তাই দিয়েই ছোট শিশুরা অনেক জিনিষ তৈরী করতে শিখতে পারে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যপ্রস্তুতির শিল্প-সামগ্রী দেওয়া যেতে পারে এবং প্রস্তুতদ্রব্যের আর্থিক মূল্য খুব বেশী না থাকলেও শিশুরা সেগুলি নিজস্ব প্রয়োজনে এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

শিক্ষক-সভা

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের কর্মসূচী এবং পাঠ্য-সূচীর পরিবর্তন অনেক সময়ই প্রয়োজন হ'বে। কিভাবে নূতন কর্মসূচী প্রস্তুত করা যায় এবং কিভাবে এক শ্রেণীর কাজের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কাজের সংঘর্ষ না হয় শিক্ষকগণ পূর্বাহ্ণেই সে বিষয়ে চিন্তা ক'রে সাপ্তাহিক কর্মসূচী নির্দ্ধারণ করবেন। শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকে পুরো-ভাগে রেখে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে সপ্তাহে একাধিকবার নিজেরা মিলিত হয়ে পরবর্তী সপ্তাহের কর্মসূচী নির্দ্ধারণ করবেন। শিক্ষাদানকালে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হ'বে শিক্ষকগণ সমবেতভাবে সেগুলির সমাধানে সচেষ্ট হবেন। গোটা বৎসরের জন্য নির্দ্ধারিত পাঠ্যসূচী বিভিন্ন ঋতুর দিকে লক্ষ্য রেখে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে, শিক্ষকগণ মাসিক কার্যসূচীতে এবং সাপ্তাহিক কার্যসূচীতে বিভক্ত করে নেবেন। প্রয়োজনবোধে এই কার্যসূচী বদলান যেতে পারে।

শ্রেণীকক্ষ

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ এরূপভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত যাতে দুই তিনটি কক্ষের মধ্যস্থিত বেড়া কিংবা পর্দা সরিয়ে সবটিকে একটি বড় হলঘরে পরিণত করা যায়। সেখানে সমগ্র বিদ্যালয়ের সভা, নাটক কিংবা অন্য কোন সঙ্ঘবদ্ধ কাজ চলতে পারবে। অবশ্য পৃথক হল ঘরের যেখানে ব্যবস্থা আছে সেখানে এরূপ করার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষেই কিছু না কিছু হাতের কাজ হ'বে। হাতের কাজের যন্ত্রপাতি একটি কেন্দ্রীয় স্থানে জমা থাকবে। ছেলেমেয়েরা প্রয়োজনবোধে সেখান থেকে সেগুলি নিয়ে আসবে। তবে প্রত্যেক ঘরেই টুকি-টাকি জিনিষপত্র, বাতিল করা দ্রব্যাদি রাখার জন্য

একটি বাক্স রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রতি কক্ষে আসবাবপত্র রাখার আলমারি কিংবা দেরাজ থাকলে রোজ রোজ কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে জিনিষপত্র আনবার প্রয়োজন হয় না। তবে প্রত্যেক শ্রেণীতে আলাদা ক'রে যন্ত্রপাতি দিতে গেলে প্রচুর যন্ত্রপাতির দরকার—সেটি একটি সমস্যার বিষয়।

শ্রেণীকক্ষে ভারী ভারী আসবাব থাক্‌লে সেগুলিকে সরিয়ে কক্ষটিকে কাজের ঘরে পরিণত করা পরিশ্রমসাধ্য হবে এবং ছোটদের পক্ষে সেগুলিকে টানাটানি করা সম্ভবও নয়। সুতরাং শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র ছোটদের উপযোগী এবং হালকা ধরণের হওয়া অত্যাবশ্যক। এগুলিকে প্রয়োজনমত ছেলেরাই ঘরের এককোণে সরিয়ে রাখতে পারবে এবং ঘরটিতে হাতের কাজ করার মত যথেষ্ট স্থান পাবে।

শ্রেণীকক্ষে হাতের কাজ করলে যেখানে ঘরটি নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে (যেমন মাটির কাজ) সেখানে সম্ভব হলে ঘরের বারান্দায় কিংবা বাইরে ছেলেমেয়েরা কাজ করতে পারে। ঘরে কাজ করলেও কাজের পর ঘরটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখার দায়িত্ব ছোটদের উপরেই দেওয়া ভাল। প্রয়োজন এবং সুবিধামত বাহিরে গাছতলায় কিংবা শীতকালে রৌদ্রে বসে শ্রেণীর কাজ চলতে পারে। শ্রেণীকক্ষে ম্যাপ, চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি ইত্যাদি যেন ছেলেমেয়েদের নাগালের মধ্যে থাকে। শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালের একাংশ মাটি-গোবর কিংবা সিমেণ্ট দেওয়া থাক্‌লে শিশুরা কয়লা-খড়ি দিয়ে তার উপর লিখ্‌তে কিংবা আঁক্‌তে পারবে। শ্রেণীকক্ষটিকে রুচিসম্পন্নভাবে সাজিয়ে রাখবে শিশুরা শিক্ষকের সাহায্যে ও পরিচালনায়।

পরিচ্ছন্নতা

শুধু শ্রেণীকক্ষের নয়, সর্বপ্রকার সংযম ও পরিচ্ছন্নতার দিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাক্‌বে এবং শিক্ষক এ বিষয়ে শিশুদের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ হ'বেন। বিদ্যালয়, তৎসম্পর্কিত আসবাবপত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় বস্তু শিশুদেরই—এ ধারণা একবার শিশুদের মনে সুস্পষ্টরূপে জাগিয়ে দিতে পারলে শিশুরা ঐ সকল বস্তুর প্রতি মমতাশীল হ'বে এবং সেগুলি যাতে নষ্ট না হয় তৎপ্রতি তাদেরও লক্ষ্য থাকবে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা শিশুদের শিক্ষারই একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সঙ্ঘবন্ধভাবে পরিচ্ছন্নতার কাজ করার জন্য সমস্ত শ্রেণীর জন্য সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট সময় রাখা যেতে পারে। শ্রেণীকক্ষের পরিচ্ছন্নতার ভার প্রত্যেক শ্রেণীর নিজস্ব।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি অবশ্যই থাক্‌বে। পোষাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট নয়; দেহের পরিচ্ছন্নতাও যেন শিক্ষক বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। নাক, কান, চোখ, নখ, দাঁত, ত্বক্‌, চুল পরিষ্কার রাখা প্রত্যেক শিশুর অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক দিন বিশ্রামের পূর্বে হাত মুখ ধোওয়ার সময় শিক্ষক একটু নির্দেশ দিলেই শিশুরা এ বিষয়ে একটি অত্যাবশ্যক এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারে। শিশু স্নান করেছে কিনা, না ক'রে থাকলে কেন করেনি শিক্ষক সে সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক তা'কে স্নান করিয়েই দেবেন।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কাজের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

বিভিন্ন হাতের কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের তালিকা যথাস্থানে দেওয়া হ'ল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্য পৃথক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নয়। একটি শ্রেণীতে কাটাকুটি করা কিংবা সেলাই করার জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর একটি ক'রে কাঁচির দরকার হয় না; ৩০ জনের জন্য ৬টি কাঁচি হ'লেই কাজ চলতে পারে, একজনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অপরকে কাঁচিটি দিয়ে দেবে এবং আবার প্রয়োজন হ'লে চেয়ে নেবে।

শিশুদের মূল্যবান উপকরণ দেওয়া সব সময় সম্ভব হবে না। এদিক দিয়ে শিক্ষকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা বিশেষ প্রয়োজন। পুরাণো বাতিল করা জিনিষ, ছেঁড়া জিনিষ (যেমন—খবরের কাগজ, কাগজের বাক্স, দেশলাইয়ের বাক্স, প্যাকিং বাক্স, জুতার বাক্স, খেলনা,

ভাঙগা তালা, টিনের বাক্স, শিশি, বোতল, বার্লি'র টিন, সিগারেটের টিন, সিগারেটের বাক্স, ট্রাম বাসের টিকিট, খালি রীল, নষ্ট করা ডাক টিকিট, লতা, পাতা ইত্যাদি) দিয়ে অনেক কিছু তৈরী করা সম্ভব এবং এগুলিকে নানাপ্রকার কাজেও লাগান যেতে পারে। পুরাণো খবরের কাগজের উপর ছেলেমেয়েরা ছবি আঁক্‌তে পার্‌বে; তা' থেকে ছবি কেটে নিজেদের ছবির বই করতে পার্‌বে, বইয়ের মলাট দিতে পার্‌বে। পাট দিয়ে কিংবা খেজুরের ডাল দিয়ে চলনসই তুলি ক'রে নেওয়া যায়; সিমের পাতা থেকে, মাটি থেকে অনেক রকম রঙ পাওয়া যায়। কুম্ভকারেরা সাধারণতঃ যে রঙ ব্যবহার করে সে রঙ খুব দামী নয় এবং ছেলেমেয়েরা সেই রঙও ব্যবহার করতে পারে।

অভিভাবকদের সহযোগিতা

অভিভাবকদের সঙেগ মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের সমস্যা এবং উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করা শিক্ষকদের একটি প্রধান কর্তব্য। এজন্য মাসে একদিন সভা আহ্বান করা যেতে পারে, সেখানে অভিভাবকগণ তাঁদের ছেলেমেয়েদের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে শিক্ষকদের সঙেগ আলোচনা করার সুযোগ পাবেন এবং শিক্ষকগণও তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারবেন তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কতখানি প্রতিফলিত করতে পারছে। কাজের উপকরণ সম্বন্ধেও অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের অনেকখানি সাহায্য করতে পারেন।

একই শ্রেণীতে এক কিংবা একাধিক শিক্ষক

প্রচলিত রীতিতে বিভিন্ন 'বিষয়' পড়ানর জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক পৃথক শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে। যিনি সাহিত্য পড়ান, তিনি বিভিন্ন শ্রেণীতে সাহিত্যই পড়ান; যিনি অঙ্ক শিখান, তিনি বিভিন্ন শ্রেণীতে ঐ একই বিষয়ই বৎসরের পর বৎসর শিখিয়ে যান। অবশ্য প্রয়োজনবোধে একই শিক্ষককে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় পড়াতে হয়। কিন্তু গোটা বৎসরের জন্য একই শ্রেণীর সকল বিষয়ের ভার একই শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত থাকে না। নব-পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এই শেষোক্ত নিয়ম স্বভাবতই চালু হবে। এই নিয়মের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি দেখান যেতে পারে:—

(১) একই শিক্ষকের উপর একটি শ্রেণীর ভার থাকলে শ্রেণীর ফলাফলের জন্য একমাত্র তাঁকেই দায়ী করা যাবে এবং শিক্ষকের কৃতিত্বের পরিচয় সহজেই মিলবে।

(২) বিভিন্ন ছেলেমেয়ের উন্নতি-অবনতির হিসাব রাখা একজনের পক্ষে যতখানি সুবিধাজনক, বিভিন্ন শিক্ষকের পক্ষে ততখানি নয়।

(৩) শিক্ষকের সঙেগ শিশুদের সহজ পরিচয়ের ফলে ক্রমশঃ একটি মধুর সম্বন্ধ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে এবং শিক্ষকের চরিত্রের ছাপ শিশুর চরিত্র গঠনে সহায়ক হ'বে ব'লে আশা করা যায়।

(৪) পাঠ্যসূচীতে অবিভাজ্যতার প্রতি জোর দিতে গেলে, বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষকের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন; নতুবা একই বিষয়ের পুনরুক্তি এবং পুনরুল্লেখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একই শিক্ষকের হাতে ভার থাক্‌লে তিনি প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রয়োজন জান্‌তে পারবেন এবং সেই অনুসারে তা'কে পরিচালিত করতে পারবেন।

(৫) শিক্ষক একই বিষয়ে পাঠদানের একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবেন।

অবশ্য উপরের যুক্তিগুলির বিপক্ষেও অনেক কিছু বলা যেতে পারে; যেমন কোন বিষয়ে শিক্ষকের অসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলে তাঁর হাতে সেই বিষয়ের ভার ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু আশা করা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রত্যেক শিক্ষকেরই থাকবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাতের কাজ পরিচালনার মোটামুটি শিক্ষাও প্রত্যেক শিক্ষকেরই থাকবে ব'লে আশা করা যায়। সঙগীত, বিজ্ঞান কিংবা শরীরচর্চার ব্যাপারে শ্রেণীর শিক্ষক বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণের সাহায্য নিতে পারেন।

সুবিধা হলে এক বৎসরের কার্যের শেষে শিক্ষক একই ছাত্র-ছাত্রীর দলকে উপরের শ্রেণীতে নিয়ে যেতে পারেন, এবং সেই শ্রেণীর শিক্ষার ভার নিতে পারেন। এইভাবে একই শিক্ষকের উপর একদল ছেলেমেয়ের গোটা প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পিত হ'লে শিক্ষকের দায়িত্ব, কৃতিত্ব এবং ছাত্র-ছাত্রীর ক্রমিক উন্নতির হিসাব রাখা সহজ হয় এবং শিক্ষকও একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পান।

এখানে শিক্ষককে একটু সতর্ক করা প্রয়োজন যে তিনি যেন কোন সময়ই তাঁর অজ্ঞতা লুকানর চেষ্টা না করেন। সর্ববিষয়ে সমান কৃতিত্ব না থাকলে শিক্ষককে দোষী করা যায় না। কোন প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় না হ'লে, অন্য শিক্ষকগণের সাহায্যে কিংবা পুস্তকের সাহায্যে পরে তিনি ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর দিবেন, একথা ছাত্রদের বলে দেবেন। প্রশ্ন এড়ানর চেষ্টা কিংবা ভুল উত্তর দেওয়া যতটা দোষাবহ, অজ্ঞতা ততটা নয়।

দৈনন্দিন কার্যসূচী

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নিম্নপ্রকার কার্যসূচী হ'তে পারে। কিন্তু শিক্ষক মহাশয় মনে রাখবেন যে প্রয়োজন অনুসারে কার্যসূচীর পরিবর্তন করা যাবে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে শিশুরা যেখানে স্বৈচ্ছিক কাজ করবে সেখানেও তা'রা ইচ্ছা করলে, গল্পের বই পড়তে, ছবি দেখতে কিংবা অঙ্ক করতে পারবে এবং এরূপ ইচ্ছা করা অস্বাভাবিকও নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি মিলিতভাবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কাজ করতে আরম্ভ করে, তবে সেদিনের কিংবা পরবর্তী দুই এক দিনের কার্যসূচীর রদবদল করা যেতে পারবে।

১০-৩০—১০-৪০—সমবেত প্রার্থনা, বিশেষ ঘোষণা, ইত্যাদি।

১০-৪০—১০-৫০—খবর বলা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং শ্রেণীর কাজ (১),

১০-৫০—১১—'মন্ত্রী' নির্বাচন, স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং রিপোর্ট পেশ করা (২)।

১১—১২—সৃজনাত্মক কাজ (ছবি আঁকা, মাটির কাজ, কাগজ কাটা, পুতুল খেলা, নাটকের সাজসরঞ্জাম তৈরী করা, কবিতা লেখা, গল্প লেখা, খেলনা তৈরী করা ইত্যাদি)।

১২—১২-৩০—পঠন, লিখন ও অঙ্ক (প্রয়োজনবোধে একাধিক দলে ভাগ ক'রে)।

১২-৩০—১—জলখাবার, হাতমুখ ধোওয়া, বিশ্রাম।

১—১-৪৫—শিল্প কাজ (কাঠের কাজ, সুতাকাটা, বাঁশ-বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, বাগানের কাজ ইত্যাদি)।

১-৪৫—২-১৫—লিখন পঠন ও অঙ্ক (প্রয়োজনবোধে একাধিক দলে ভাগ ক'রে)।

২-১৫—২-৩৫—পরিবেশ পরিচিতি (বাইরে বেড়াতে যাওয়া ও তৎসম্পর্কে লোকজনের চলাফেরা, যানবাহন, গাছ-গাছড়া, বাড়ীঘর, জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করা)।

২-৩৫—৩—নাচ, গান, খেলাধূলা, ছুটি।

দ্রষ্টব্য :--(১) শ্রেণীর কাজ বল্‌তে আসনপাতা, তারিখ বদলান, ফুল সাজান, নাম ডাকা ইত্যাদি বুঝতে হ'বে।

(২) প্রয়োজনবোধে ১৫ মিনিট করে দুইবার বিশ্রামের সময় দেওয়া যেতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীর উন্নতির পরিমাপ

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীর উন্নতির পরিমাপ নিম্নবর্ণিত ছকে রাখতে পারেন। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হ'লে ছাত্র-ছাত্রীর উন্নতির পরিমাপ রাখা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য হবে এবং তারই উপর নির্ভর ক'রে ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে ভর্তি করা চলবে। এই পরিমাপ প্রতিমাসেই করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই উন্নতির পরিমাপ করতে হবে, শুধু পাঠ্য বিষয়ের উন্নতি লক্ষ্য করলেই চলবে না।

দেখা গিয়েছে যে সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা দুইজন খুবই বুদ্ধিমান এবং শতকরা দুইজন খুবই কম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৫০ জন। উহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে শতকরা ২৩ জন এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে শতকরা অন্য ২৩ জন। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীকে যেখানে বাছাই ক'রে নেওয়া হয় না সেখানেই মোটামুটি এই নিয়ম খাটে; অন্যত্র খাটে না। সাধারণতঃ এই নিয়ম অনুসারে পরীক্ষার ফলাফল হওয়া উচিত। শিক্ষকগণ পাঠ্যবিষয় এবং অন্যান্য লক্ষণীয় উন্নতির দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক হিসাব রাখবেন; নতুবা মাসান্তে লিখতে বসলে অনেক কথা ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। দৈনিক উন্নতির পরিমাপ কিরূপে রাখতে হবে, তারও একটি ছক দেওয়া গেল—

ছাত্র-ছাত্রীর উন্নতির পরিমাপ

(ক—ঙ পাঁচটি অক্ষর দ্বারা উন্নতি নির্ধারণ)

সাধারণতঃ ১০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে—

	শতকরা।
ক (উচ্চতম) … … …	২
খ … … …	২৩
গ … … …	৫০
ঘ … … …	২৩
ঙ (সর্বনিম্ন) … … …	২

নাম— জন্মের তারিখ—

অভিভাবকের নাম— ভর্তির তারিখ—

ঠিকানা— শ্রেণী—

মাসে উপস্থিত ছিল—

আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা—

অভিভাবকের পেশা—

পরিবেশ—

ভাইবোনদের মধ্যে শিশুর স্থান—

শারীরিক বিকাশ—

(১) কোনও অসুখ হ'য়ে থাকলে তার নাম—

(২) টীকা নেওয়া হয়েছে কিনা—

(৩) ডাক্তারের রিপোর্ট ও প্রতিবিধান—

(৪) তারিখ——উচ্চতা——ওজন—গ্রন্থি——দৃষ্টিশক্তি——

(৫) সাধারণ স্বাস্থ্য——অসুখ——প্রতিবিধান।

(প্রত্যেক শিশুর বৎসরে অন্ততঃপক্ষে চারবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত)

পঠন, লিখন ও অঙ্কে উন্নতির পরিমাপ

তারিখ—উচ্চারণ—পঠন—লিখন—ভাষা বা রচনা—অঙ্ক (কি কি শিখেছে—ভ্রমশূন্যতা, বিশুদ্ধতা বা যাথাথ্য)।

বানান—কতগুলি নূতন শব্দ শিখছে।

রুচিবিকাশ

তারিখ——সঙ্গীত——চিত্রকলা——সাজসজ্জা——কবিতা লেখা——

তাহার গুণাবধারণ—সৌন্দর্যবোধের বিকাশ।

শিল্পকার্যে উন্নতি

তারিখ—সময়—কি কি জিনিষ তৈরী করেছে—কার্যের গুণাগুণ।

দলবদ্ধভাবে কি কি করেছে—

ব্যক্তিত্বনিরূপক গুণাবলী

(১) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য—

ব্যক্তিগত—

সামাজিক—

(২) কাজের প্রতি আগ্রহ।

(৩) আত্মবিশ্বাস।

(৪) ধৈর্য।

(৫) সহযোগিতা।

(৬) সামাজিকতা।

(৭) বিশ্বাসভাজনতা।

(৮) দায়িত্ববোধ।

(৯) সু-অভ্যাস।

(১০) নীতিবোধ।

(১১) নিজের প্রতি, সঙ্গীদের প্রতি, বয়স্কদের প্রতি মনোভাব ও আচরণ।

(১২) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।

(১৩) মৌলিক চিন্তাশক্তি।

(১৪) আবিষ্কার করবার বা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা।

(১৫) বিচারশক্তি।

(১৬) মনঃসংযোগ।

(১৭) স্নেহপ্রবণতা।

(১৮) নির্ভীকতা।

বুদ্ধির পরিমাপ (আনুমানিক)—

কি কি বিষয়ে আগ্রহ ঃ—

মন্তব্য।—প্রয়োজন অনুযায়ী কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং তার ফলাফল।

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ।

(রেকর্ডিং এর নমুনা)

পাঠের ক্ষমতা নিরূপণের নমুনা

ঙ	ঘ	গ	খ	ক
পাঠ বুঝা যায় না।	থেমে থেমে পড়ে, ভাল বুঝতে পারে না।	পড়া নির্ভুল কিন্তু থেমে থেমে পড়ে।	একটানা নির্ভুল পড়তে পারে, বুঝতেও পারে।	অতি উত্তম পাঠ, প্রকাশভঙ্গি সুন্দর, বুঝে পড়তে পারে।

হাতের লেখা

ঙ	ঘ	গ	খ	ক
কুৎসিত লেখা।	বিশ্রী, অপরিষ্কার, অসম হস্তাক্ষর।	লেখা পরিষ্কার।	খুব পরিষ্কার, অক্ষরের সমতা।	অক্ষরের সমতা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্য, দ্রুততা।

সামাজিকতা

ঙ	ঘ	গ	খ	ক
একা থাকতে ভালবাসে।	ঝগ্‌ড়াটে, মিশতে পারেনা।	সাহচর্য্য ভালবাসে।	সব সময় সঙ্গীদের সঙ্গে থাক্‌তে চায়।	অন্যের সাহচর্য্যে অত্যন্ত আনন্দ পায়, বন্ধুদের বাড়ীতে ডেকে আনে।

মনঃসংযোগ

ঙ	ঘ	গ	খ	ক
অমনোযোগী, চিন্তা না করে সিদ্ধান্তে আসে।	সহজেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়।	সাধারণভাবে কাজে মনোনিবেশ করে।	মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী।	একাগ্র অভিনিবেশ।

পরিচ্ছন্নতা

ঙ	ঘ	গ	খ	ক
সব সময় নোংরা থাকে, পরিষ্কার পচিছন্নতার ভাব পছন্দ করে না।	দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরিষ্কার থাকে, নিজে কিছু পরিষ্কার থাকে, আশপাশের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ নয়।	ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি আছে। অন্যেরা যাতে পরিষ্কার থাকে তাও দেখে।	ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার দিকে সজাগ। পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সযত্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।	ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি বেশ সজাগ। পরিচ্ছন্নতার দিকে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক দৃষ্টি রয়েছে।

শিক্ষক ও পল্লীসংস্কার

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ই গ্রামে অবস্থিত হবে এবং শিক্ষকগণের অধিকাংশও গ্রাম্যজীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হবেন, এরূপ আশা করা যায়। বুনিয়াদি বিদ্যালয় যেমন হবে গ্রামের প্রাণকেন্দ্র, শিক্ষকও হবেন সেইরূপ গ্রামের সেবকশ্রেষ্ঠ।

অর্থে, বিদ্যায়, প্রতিষ্ঠায় তাঁর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান গ্রামে থাকলেও গ্রাম্যজীবনকে কিরূপে সর্বপ্রকারে উন্নততর ক'রে তোলা যায় শিক্ষক হবেন তার পথপ্রদর্শক। তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের গৃহ ও প্রাঙ্গণ যেমন পরিচ্ছন্নতায় আদর্শস্থানীয় ক'রে রাখবেন, তেমনি গ্রামের পথঘাটের উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতির দিকেও গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং ছাত্র ও অভিভাবকদের নিয়ে গ্রামসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাস্তা মেরামত করতে দেখ্‌লে, জঙ্গল পরিষ্কার করতে দেখ্‌লে, বয়স্করাও তাদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য যোগ দেবেন এবং তাঁদের কাজ ছোটদের করতে দেখে হয়তো লজ্জাও বোধ করবেন। ছোটরা নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই কাজ করবে; জোর ক'রে কিংবা সাধ্যাতিরিক্ত কাজ করানর প্রশ্নই এখানে ওঠে না। মোটকথা, গ্রামসেবা ছেলেমেয়েদের শিক্ষারই একটা অঙ্গ হ'বে, যা'তে ক'রে তা'রা তাদের পরিবেশকে, সমাজকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌বে এবং তার উন্নতির জন্য চিন্তা কর্‌তে এবং কাজ করতে চাইবে।

উপসংহার

দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক সৃষ্টির দায়িত্ব আজ প্রাথমিক শিক্ষকের। রাষ্ট্রের আদর্শ অনুযায়ী তিনি হবেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সাহায্য করবেন প্রত্যেকটি শিশুকে গড়ে তুলতে সুস্থসবলদেহ, তেজস্বী, আত্মবিশ্বাসী, আত্ম-নির্ভরশীল, ঈশ্বরপরায়ণ, স্বাধীনচিন্তাশীল নাগরিক ক'রে। অসামান্য করুণা, অকৃপণ সমবেদনা, উদারদৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁকে এই ভবিষ্যতের নাগরিক সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করতে হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে যত্নবান হবেন। প্রত্যেকটি শিশু তাঁরই সযত্ন তত্ত্বাবধানে স্বকীয়তায় সুমহান্ হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে এবং জাতির জনক মহাত্মাজী যে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে সেই সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টির কাজে শিক্ষকের অবদান হবে সর্বশ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শারীরিক শিক্ষা

(ক) ভূমিকা ও শিক্ষাপদ্ধতি

কোনও দেশের প্রকৃত সম্পদ্ হ'চ্ছে তার অধিবাসিগণ। আর অধিবাসিগণ বৌদ্ধিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে যতই উন্নত হোক না কেন সবই ব্যর্থ হবে যদি তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য না থাকে। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির মত সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শরীর গঠনের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া একান্ত দরকার। শিশুর শরীর গঠনের জন্য সুখাদ্যের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যায়ামের। ব্যায়াম বলতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষম পরিচালনা বুঝায়। মানব-দেহের মাংসপেশীগুলির যথোচিত বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য তাদের পরিচালনা একান্ত দরকার। কোন মাংসপেশী যদি সঞ্চালিত না হয় তার পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে না। আবার কোনটির অধিক সঞ্চালন ঘটলে তা'র অপরিমিত পুষ্টি শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে। সুতরাং ব্যায়াম বলতে প্রতি অঙ্গের সুষম সঞ্চালন বুঝায়। এই সুষম সঞ্চালনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে এবং শিশুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নিজেদের চলাফেরার মধ্যে এই ছন্দোময় অঙ্গসঞ্চালনক্রিয়ায় আসক্ত থাকে।

"Rhythm is certainly a fundamental factor in human development. Children of a few months will beat time with a marked rhythm and the sense of rhythm is apparently at its height at about three years of age and if not cultivated, it may be lost."

এই স্বাভাবিক ছন্দকে অব্যাহত রেখে শিশুদের জন্য এমন কোন ব্যায়াম-কৌশল নির্বাচিত ক'রতে হবে যা শিশুপ্রবৃত্তির পরিপূরক হবে; তার পক্ষে ভারস্বরূপ হবে না।

আমরা সার্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতির কথাই ভাবছি—সুতরাং ভারতবর্ষের মত বিশেষ ক'রে পশ্চিমবঙ্গের মত আর্থিক সমস্যাপীড়িত দেশের সাধারণ শিশুর কথা মনে রাখলে আমরা এমন কোন ব্যায়াম-কৌশলের কথা ভাবতে পারি না যা ব্যয়বহুল ব্যাপার। এজন্য শিশুদের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালনের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদিগকে এমন কতকগুলি কাজ ও সাধারণ খেলার কথা ভাবতে হবে যা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশসাধনের সহায়ক হয়।

শিশুরা যদি আনন্দের সঙ্গে কাজ করে তবে সেই কাজের মধ্যেও তাদের ছন্দোময় অঙ্গ-সঞ্চালন অব্যাহত থাকে। অবশ্য কাজগুলি এমন হওয়া উচিত যা তাদের দৈহিক ক্ষমতার তুলনায় ভারস্বরূপ না হয়। উদ্যান-রচনার মধ্য দিয়ে ঐরূপভাবে কাজ করা সম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষকের পরিচালনাধীনে শিশুরা সানন্দে ও ছন্দোবদ্ধভাবে এই কাজ করতে সক্ষম হবে। এই কাজের ফলে তাদের শুধু ব্যায়ামই হবে না প্রকৃতির সান্নিধ্যে ও মুক্ত বায়ুতে এই কাজ করায় তাদের শরীরের প্রভূত উপকার হবে এবং আনন্দ ও শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে তারা কিছু কিছু টাট্‌কা ফলমূল, শাকসব্জী উৎপাদন করতে পারবে। আংশিকভাবে তাদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দূর হবে। আমাদের দরিদ্র দেশের শিশুরা দেহ গঠনোপযোগী খাদ্য পায় না। এইভাবে সেই সমস্যারও আংশিক সমাধান হবে। অবশ্য বাগানের কাজে যাতে শিশুর আনন্দ ব্যাহত না হয় বা তার শ্রমশক্তির উপর চাপ না পড়ে তা শিক্ষককে দেখতে হবে। শিশুর কাজের জন্য তার হাতিয়ারগুলি শরীরের সামর্থ্যের অনুপাতে হাল্কা হওয়া চাই এবং উদ্যানের পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া চাই।

এ' ছাড়া এমন কতকগুলি খেলাধুলা ও অঙ্গপরিচালনার ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর শরীরের পুষ্টি ও অনুকূল বিকাশ ঘটতে পারবে। শুধু তাই নয় ঐ সব খেলাধূলা ও অঙ্গচালনার নির্বাচন ও পরিবেশ এমন হবে যেন দৈহিক পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শক্তি, সাহস ও কর্মক্ষমতা বাড়ে, তার শারীরিক গঠনভঙ্গী

সুন্দর ও সুঠাম হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষিপ্রতা জন্মায় ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়, এর সঙ্গে তার সামাজিক কর্তব্যবোধ, সহযোগিতামূলক মনোভাব, দেশাত্মবোধ, নেতৃত্বক্ষমতা, জয়-পরাজয়ে খেলোয়াড় জনোচিত অনুত্তেজিত মনোভাব, আত্মসম্ভ্রম বোধ ও সাধুতা, প্রভৃতি মানবোচিত গুণগুলির বিকাশসাধনের দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় পতাকা অভিবাদন উপলক্ষে তালে তালে চলা ও অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শারীরিক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আদর্শপ্রীতি, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটবে। তা ছাড়া আট থেকে দশ বৎসরের শিশুদের জন্যে এমন কতকগুলি খেলার ব্যবস্থা করা চলে যাতে শিশুর দৈহিক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণক্ষমতা, আচরণ করবার ক্ষমতা ও অনুকরণ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যথা—

(ক) শিকার করার অনুরূপ খেলা—দৌড়ানো, পশ্চাদ্ধাবন, বন্দী করা, পলায়ন।

(খ) নিক্ষেপ করা ও ধরা, কোনও বস্তু একদলের নিকট হ'তে অপরে লুফে নেবে—"রুমাল চুরির" মত খেলার ব্যবস্থা রাখা যায়।

(গ) বিভিন্ন জীবজন্তুর চালচলনের অনুকরণমূলক ব্যায়াম।

(ঘ) দৌড় ও ঝাঁপসংযুক্ত খেলাধুলা।

ড্রিল—এই বয়সের ছোট ছেলেমেয়ের উপযুক্ত নয় কারণ ড্রিলের মধ্যে আনন্দ, কল্পনাশক্তি, অনুকরণ ও অভিনয়শক্তির সার্থকতা ঘটে না ও শিশুকে অত্যধিক শৃঙ্খলায় ভারাক্রান্ত করে।

ব্যায়াম ও খেলাধুলার সময়ে খালি গায়ে থাকাই ভাল আর আমাদের মত দরিদ্র ও গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের পক্ষে ইহা সর্বাংশে সমীচীন ও সুবিধাজনক বটে। ইজের কিংবা হাফ্-প্যাণ্টই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হবে (মেয়েদের জন্য ইজের এবং কুর্তা বা ছোট ফ্রক)। ৬-৮ বৎসরের শিশুর একসঙ্গে ২০ মিনিটের বেশী ব্যায়াম না করা ভাল। ৯-১০ বৎসরের শিশু প্রতিবারে আধঘণ্টা ব্যায়াম করতে পারে। প্রতিদিন বা একদিন অন্তর একদিন ব্যায়াম ব্যবস্থা রাখা উচিত। শিক্ষক মাতৃভাষায় ব্যায়ামের আদেশ দেবেন, শিশুদের আদেশগুলি এমন হওয়া ভাল যেন তারা আদেশ শুনেই প্রতিপালন করতে পারে—যেন সব সময় দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন না ঘটে। তবে অবশ্য শিক্ষকও শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামভঙ্গী করবেন যেন শিশুরা ভুল ভ্রান্তি শুধরিয়ে নিতে পারে। ব্যায়ামের সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন এমন দ্রুত হওয়া চাই যেন শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য দ্রুত হয় ও ঘাম বের হয়, কারণ তা না হ'লে ব্যায়ামের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে না। ব্যায়ামগুলির মধ্যে যথোচিত আগ্রহ গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষক তাঁর কল্পনাশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির সদ্ব্যবহার ক'রে কাল্পনিক গল্পের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীযুক্ত অভিনয় ক'রলে ব্যায়ামের সঙ্গে কল্পনাশক্তি বাড়ে। এরূপ ব্যায়াম ছোটদের (৬-৭) খুবই উপযুক্ত হ'বে।

বৃক্ষে জলসেচন কাজে ছন্দ ও ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি ক'রে রচনাত্মক কাজের সঙ্গে ব্যায়ামের সংযোগ ঘটানো যায়। ছন্দ রাখবার জন্য চলার তালে তালে ছড়া বলা যায়, যথা—

এক দুই তিন চার
পাঁচ ছয় সাত আট
নয় দশ এগারো বারো
তের চোদ্দ পনর ষোল
সতের আঠার উনিশ কুড়ি

এক দুই তিন
চার পাঁচ ছয়
সাত আট নয়
দশ এগারো বারো
তের চোদ্দ পনের

জমিতে দিয়েছি সার
মাটি করেছি পাট
এইবারে বীজ গাড়ো
তারপরে জল ঢালো
উঠবে চারা দিয়ে তুড়ি।

নিড়ানীটা নিন,
করুন ঘাসের ক্ষয়
গাছের জোর হয়
পাতা বড়ো বড়ো
বাড়বে তর তর।...... ইত্যাদি

দৈহিক ব্যায়ামের সঙ্গে কিভাবে কল্পনাশক্তি ও স্নায়ুর ক্ষিপ্রতাবৃদ্ধি সম্ভব করা যায় তা নীচের উল্লিখিত ব্যায়াম-পরিকল্পনায় বুঝা যাবে। খেলাঘরে ৬ বছরের শিশুরা সমবেত হয়েছে। শিক্ষক মহাশয় বললেন, "দৈত্যের মত বিরাট হও," পরমুহূর্তেই বললেন, "মাটির সঙ্গে মিশে যাবার মত ছোট হও।" এভাবে "নদীর মত চওড়া হও," "সুতার মত সরু হও", "লাঠির মত সোজা হও," "ইঁদুরের মত ছোট হও", "ফুলের মত ফুটে পড়ো", "কুঁড়ির মত হও।" এই আদেশগুলি পালনের ভেতর দিয়ে শিশুর ছন্দোবন্ধ অঙ্গচালনাই শুধু হ'বে না, তাদের কল্পনাশক্তি প্রকাশভঙ্গিমা প্রভৃতি আয়ত্ত হবে এবং প্রচুর পরিমাণে কৌতুক ও আনন্দ অনুভব ক'রবে। এর সঙ্গে সঙ্গে তারাও বলবে, "দেখুন দাদা, আমি দৈত্যের মত লম্বা হ'য়েছি, আমি কুঁড়ির মত ছোট হ'য়েছি" ইত্যাদি এবং এর ফলে তাদের ভাষাজ্ঞানও বাড়বে। "ঘুম থেকে উঠ", "ঘুমাও", "চিবাও" প্রভৃতি আদেশ দিয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মগুলির অনুকরণেও ব্যায়াম করানো যায়। কল্পনাশক্তি একটু বিকশিত হ'লে তাদের গল্পাভিনয়ের মধ্য দিয়েও যথেষ্ট ব্যায়াম করানো যায়। নিচের উদাহরণটির সাহায্যে সম্যক বোঝা যাবে। শিক্ষক মহাশয় গল্প সুরু করলেন। "এক দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি খুব লম্বা ছিলেন এবং লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন।" অমনি ছেলেমেয়েরা শিক্ষক মহাশয়ের চতুর্দিকে রাজার মত লম্বা হয়ে পা ফেলতে সুরু করলো। শিক্ষক মহাশয় আবার বললেন, "তার যিনি রাণী ছিলেন তিনি রাজার চেয়ে একটু ছোট ছিলেন আর একটু ছোট পা ফেলে চলতেন"। সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা দেহ সংকুচিত করল, পদক্ষেপও হ্রস্বতর করল। শিক্ষক মহাশয় তারপর বললেন, রাজপুত্র ছিলেন ছোট আর ছোট ছোট পা ফেলে চলতেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই নীচু হ'য়ে খুব ছোট ছোট পা ফেলে চলতে সুরু ক'রে দিল। শিক্ষক মহাশয় বললেন, একদিন রাজা তার খুব বড় ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়া করতে গেলেন, তার ঘোড়া খুব লম্বা কদমে চলতে লাগলো—অমনি সকলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটতে লাগল। এই-ভাবে শিক্ষক মহাশয় বললেন "রাণী তার চেয়ে একটু ছোট ঘোড়ায় চড়লেন। সে ঘোড়া ছোট কদমে চলতে লাগল"—সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা অনুকরণ করতে লাগল। শিক্ষক আবার বললেন, যেমন তাঁরা চলতে লাগলেন, পাখীরা এগাছ হ'তে ওগাছে পালাতে লাগল। তখন সকলে পাখীর মত জায়গা বদলাতে শুরু করল। শিক্ষক বললেন, তারা একটা ইঁদুরকে পালাতে দেখল—একটা বিড়ালকে ম্যাও ম্যাও ক'রে যেতে দেখল। শিশুরা তখন ইঁদুর বিড়ালের মত ক'রে চলে বেড়াতে লাগল। রাজার ঘোড়া ঝরণা পার হ'ল আস্তে লাফ দিয়ে, রাণীর ঘোড়া একটু বড় লাফ দিয়ে পার হল। রাজপুত্রের ঘোড়া খুব বড় লাফ দিয়ে পার হল। শিশুরা যথাক্রমে ছোট, মাঝারি ও লম্বা লাফ দেবে। পরে রাজা, রাণী ও রাজপুত্র ক্লান্ত হ'য়ে গেলেন। শিশুরা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভাণ করবে।

এইভাবে গল্পাভিনয়ের মধ্যে ব্যায়াম শিশুদের মনোজ্ঞ তো হবেই, এটা তাদের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা, শ্রবণশক্তি, কল্পনাশক্তি, ভাষাজ্ঞান ও শব্দসম্ভার বৃদ্ধি করবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুরা কতকগুলি প্রচলিত বিধিবদ্ধ খেলা খেলবে। এইগুলি খেলার সময়ে তারা যেন খেলাটির বিধি ঠিকমত মেনে চলে, তা শিক্ষক মহাশয় দেখবেন এবং ধীরে ধীরে যাতে তাদের মধ্যে খেলোয়াড় জনোচিত মনোভাব ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয় তা দেখবেন। কোনও খেলা যাতে অতি দীর্ঘ সময় না চলে তাও তাঁকে দেখতে হ'বে। খেলবার সময়ে খেলোয়াড়-দের মধ্যে বন্ধুভাব অটুট রাখবার ও সঙ্গীদের গুরুতর আঘাত হতে রক্ষা করবার মনোভাব জাগ্রত থাকে তা শিক্ষককে দেখতে হবে। অন্যায় ক'রে বিপক্ষের নিকট হ'তে সুবিধা আদায় করা, বিপক্ষকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা, হেরে গেলে ভগ্নোৎসাহ হওয়া, অথবা জিতলে গর্বে স্ফীত হওয়া, অখেলোয়াড় জনোচিত মনোবৃত্তি, শিশুদের এগুলি বর্জন করার প্রতি অবহিত রাখতে হবে। খেলার সময়ে শিশুরা যেন নিজ স্বার্থ অপেক্ষা দলের স্বার্থ বড় ক'রে দেখে আর দলের স্বার্থের চেয়ে সত্য ও ন্যায়কে বড় ক'রে দেখে তার শিক্ষা দিতে হবে। কারও নিয়মভঙ্গ বা ত্রুটি ঘটলে সে নিজেই যেন তা স্বীকার করে এরকম মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। দৌড় ঝাঁপ, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে শিশুগণ আহত হ'তে পারে—এজন্য প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকা চাই। আঘাতজনিত ক্ষতের সুচিকিৎসার প্রাথমিক ব্যবস্থাও করতে হবে কিন্তু সামান্য আঘাতে ব্যস্ত হ'লে চলবে না। যেন শিশুরা দৃঢ় হয়—সামান্য আঘাতে কাতর না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

শিশুদিগকে নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে সজাগ করা শিক্ষকের অন্যতম কাজ। এই শিক্ষা যাতে শিশুরা ভালভাবে লাভ করতে পারে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের অধিকতর নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা হয় এরূপ খেলা দিতে হবে। তাদের নিয়মানুবর্তীও করতে চেষ্টা করতে হবে। তারা খেলায় যত মত্তই থাকুক না কেন শিক্ষক মহাশয় যেই "খেলা শেষ" আদেশ জানাবেন তারা যেন আদেশ পালন করে তা দেখতে হবে।

এইভাবে কাজ ও খেলার মধ্যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষম ও ছন্দোবদ্ধ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রখরতা সম্পাদন, স্নায়বিক ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি করা, খেলোয়াড় জনোচিত মনোবৃত্তি ও শৃঙ্খলাবৃদ্ধির উন্মেষসাধন, এইসব হচ্ছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যায়াম ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সফল ক'রে আমরা আমাদের দেশের শিশুদের উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করতে পারব। শিক্ষক মহাশয়কে সর্বদা মনে রাখতে হবে তাঁর মৌখিক বক্তৃতা ও নির্দেশ অপেক্ষা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আচরণই শিশুদের বেশী অনুপ্রাণিত করবে। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিক্ষক শুধু ব্যায়ামকুশলী ও খেলাধূলায় অভিজ্ঞই হবেন না, তাঁর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব অনুকরণীয় হওয়া চাই।

(খ) শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় নির্দেশ

ভূমিকা।—শিশুদের শরীরচর্চার পাঠ্যক্রম (syllabus) তৈয়ারী করবার সময়ে সর্বদাই এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তা' informal হবে, কোনওরূপ অনমনীয় গঠনে দাঁড় করিয়ে শরীরচর্চা শিক্ষা দিতে গেলে শিশুর স্বভাবজাত গতিভঙ্গী ও ছন্দ ব্যাহত হয়, কাজেই শরীরচর্চার ভেতর দিয়ে তাদের স্বাভাবিক গতিকে উন্নীত করবার জন্য যথাসম্ভব স্বাধীনতা শিশুদের দেওয়া প্রয়োজন। দৌড়ান, লাফান, বলছোঁড়া, তেঁতুলবিচির থলির দ্বারা লোফালুফি খেলা, সিঁড়িতে ওঠা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু স্বভাবতঃ ক'রতে এত ভালবাসে যে এর পরিবর্তন করা বিধেয় নয়। কাজেই শরীরচর্চার শিক্ষা তাদের স্বাভাবিক কাজ কর্মের উপর ভিত্তি ক'রে দিতে হবে এবং শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুর কাছে এটা অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত করবেন। শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে থাকবার অভ্যাসও শিশুদের ক্রমে শিক্ষা দিতে হবে। কারণ শিক্ষাজগতে এর প্রয়োজন খুব বেশী। বর্তমানে আমাদের যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাতে শরীরচর্চার স্থান অতি নগণ্য। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে এর ব্যবস্থা আছে তাও অপরিমিত এবং উপকার না হ'য়ে অপকারই তাতে হয়ে থাকে। বর্তমানে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন ক'রে ছাত্র-ছাত্রী শরীরচর্চা করবার সুযোগ পায়। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন ৪০ বা ৪৫ মিনিট শরীরচর্চার ঘণ্টা না দিয়ে দৈনিক ১৫ থেকে ২০ মিনিট শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিশুদের কল্পনাশক্তি অতি প্রবল। নিজেদের পাখী কল্পনা ক'রে তারা পাখীর মত উড়বে, জন্তু কল্পনা ক'রে জন্তুর মত চলবে, লাফাবে, উড়ো জাহাজ হবে, এঞ্জিন, রেলগাড়ী, মটরগাড়ী প্রভৃতি আরও কত কি হবে। এই সকল কাল্পনিক ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুর কল্পনারাজ্যেও প্রসার এনে দিতে পারেন। শারীরিক শিক্ষার সঙ্গে শিশুর কর্মজগতের একটি সামঞ্জস্য যেন সর্বদাই থাকে। বাস্তবজগতে সে যা' করে, যা' ভাবে, যা' দেখে তা'র সঙ্গে তার শিক্ষার যেন ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে সেদিকে শিক্ষকের তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। শিশু নিজের কাপড় ধোওয়া, বাগান করা, জল তোলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার জন্য যা' প্রয়োজন সেইরকম সব কাজই করবে। সেই সঙ্গে শরীরচর্চার জন্য যে-সকল কাজ কর্ম প্রয়োজন তাও করবে। কিন্তু একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে সে কাপড় ধোওয়া, বাগান করা, জল তোলা ইত্যাদি কাজ করে বলে যে তার শরীরচর্চার জন্য ব্যায়াম করবার প্রয়োজন নাই, তা নয়। নিত্যনৈমিত্তিক এ সকল কাজ করলেও তার ব্যায়ামের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যা' প্রত্যেক শিশুকেই করতে হয়, তার মধ্যে সে যথেষ্ট আনন্দ খুঁজে পায় না, কিন্তু খেলা ও ব্যায়ামচর্চার মধ্যে সে-আনন্দ আছে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়ামের সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়।

ব্যায়ামচর্চা সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলবার আছে যে যতদূর সম্ভব শিশুদের মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করান উচিত ; তাতে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কেবল বর্ষার দিনে বা কোনও বিশেষ বিশেষে ব্যায়ামের জন্য প্রচুর দরজা জানালাযুক্ত ঘরে বা কোন চালায় বা আবৃত স্থানে ব্যায়াম করান যেতে পারে। চালা না থাকলে শিশুদের শ্রেণীর জিনিষপত্র সরিয়ে ব্যায়াম করাতে হবে বা যে খেলাতে ঐসব জিনিষ ব্যবহার করা যেতে পারে এরকম উপযুক্ত ব্যায়াম বা খেলা দিতে হবে, ব্যায়ামের বা খেলার কাজ বন্ধ রাখা চলবে না। এ. সমস্ত সুবিধা, অসুবিধার কথা শিক্ষক, শিক্ষিকা পূর্ব হ'তেই চিন্তা ক'রবেন। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শিশুরা উপযুক্ত খাদ্য পায় কিনা এবং টিফিন খায় কিনা। তা' না হ'লে এই শরীরচর্চার দ্বারা শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি না হ'য়ে অবনতি হবে। যদি দুপুরবেলা বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয় তবে বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হবার পরে সামান্য বিশ্রামের পরে শরীরচর্চার ক্লাস হ'তে পারে। ভোর হ'তে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হ'লে ভোরবেলা শরীর-চর্চার কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতেই বেশী উপকার হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুর বয়স এবং স্বাস্থ্যের উপর নজর রেখে ব্যায়ামের পাঠতালিকা প্রস্তুত ক'রবেন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত যে স্বাস্থ্যপঞ্জিকা ((Health card)) রাখা হবে তা তাকে বিশদভাবে জানতে হবে। বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুর জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম ও খেলাও শিক্ষক, শিক্ষিকাকে জানতে হবে। যেমন বস্তির ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় না, এ'রকম শিশুদের জন্য অত্যধিক পরিশ্রমজনক ব্যায়াম না দিয়ে, তারা সহজে করতে পারে, পরিশ্রম কম হয় অথচ যথেষ্ট আনন্দ পায় এ'রকম ব্যায়াম শিক্ষক, শিক্ষিকাকে বেছে দিতে হবে।

কোন শ্রেণীতে কিরকম ব্যায়াম দেওয়া যেতে পারে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এটা শিশুর ক্ষমতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, পরিবেশ, অনুসন্ধিৎসা ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। তবে এই উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা জাগাবার জন্য শিক্ষক পরিবেশ রচনা করতে পারেন—যথা বল, তেঁতুলবিচির থলি, রঙীন ব্যাণ্ড বা ফিতে বাজনা ইত্যাদি দেখে এইসব জিনিষ দিয়ে খেলবার আগ্রহ শিশুদের স্বভাবতঃই হয়।

বিদ্যালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ ৬ হ'তে ৮ বৎসর বয়স্ক শিশুদের কিরকম ধরণের ব্যায়াম ও খেলা দেওয়া যেতে পারে তার একটা মোটামুটি ধারণা নীচে দেওয়া গেল। প্রথমেই বলা হয়েছে যে ব্যায়াম বিষয়ক পাঠের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তবে নীচে দেওয়া ধারার উপর ভিত্তি ক'রে স্থান, কাল, আয়তন, পরিবেশ, বিবেচনা ক'রে শিক্ষক, শিক্ষিকা ব্যায়াম-পাঠ রচনা করলে সুফল পাবেন ব'লে আশা করা যায়। কিন্তু অবস্থাভেদে পাঠ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ক'রবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর থাকবে। এমন হ'তে পারে যে তিনি একরকম পাঠ তৈরী ক'রে নিয়েছেন, কিন্তু শিশুদের শিক্ষা দেবার সময়ে তার পরিবর্তন করা প্রয়োজন ব'লে তাঁর মনে হ'ল। তখনই তা পরিবর্তন করবার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যেন তাঁর থাকে। আবার শিক্ষা দেবার সময়ে পাঠতালিকায় নাই এমন কোন ব্যায়াম দিলে শিশুদের উৎসাহ ও আনন্দের চরম ফল পাওয়া যাবে ব'লে যদি শিক্ষকের মনে হয় তবে নিঃসঙ্কোচে তিনি তা করতে পারেন।

৬ হ'তে ৮ বৎসর বয়স্ক শিশুদের মোটামুটি ১৫ হ'তে ২০ মিনিট পর্যন্ত প্রতিদিন ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

১। খুসীমত খেলা।—প্রথমতঃ এই বয়সের শিশুদের একা একা দৌড়ান, এক পায়ে বা দুই পায়ে লাফান, "হপ্" করা ইত্যাদি ব্যায়াম দেওয়া যেতে পারে। একা একা "স্কিপ" করা, দোলনা দোলা, সিঁড়ি চড়া, "স্লাইডে" চড়া, মই বাওয়া ইত্যাদি কাজও তারা করতে পারে। মনে রাখতে হবে প্রতিদিন যেন শিশুদের একই কাজ করতে দেওয়া না হয়। শিক্ষকের নজর থাকবে যে, প্রতিদিনই শিশু খানিকটা অগ্রসর হ'চ্ছে, পূর্বের দিনের একই কাজ কলের মত ক'রে যাচ্ছে না, প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক সামান্য পরিবর্তন ক'রে নূতন কিছু যোগ দিয়ে শিশুর সম্মুখে তা আগ্রহে গ্রহণ করবার মত ক'রে তুলবেন। লাফান, হপ করা, স্কিপিংএর সঙ্গে শিশুদের জানা ছড়া বা ছোট সুন্দর সহজ গান জুড়ে দিলে শিশুদের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়।

২। পরিচালিত খেলা।—(ক) দ্বিতীয়তঃ শিশু অনুকরণপ্রিয়, কাজেই এমন খেলা তাদের দিতে হবে যে তারা সেই জিনিষ অনুকরণ ক'রে আনন্দ লাভ ক'রতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেন এই জাতীয় খেলায় তাদের শরীরের বড় বড় মাংসপেশীসমূহের কাজ হয়, যথা বুক, পিঠ, হাত, পা, কোমর প্রভৃতি স্থানের মাংসপেশীসমূহের কাজ হওয়া প্রয়োজন। তেঁতুলবিচির থলে, বল ছোঁড়া, লোফালুফি করা, "বাউন্স" করা, ছুঁড়িয়া আবার ধরা ইত্যাদি দ্বারা ব্যায়াম করান যেতে পারে।

(খ) বাঘের মাসী, ইঁদুর-বেড়াল, বড় পুতুল, ছোট পুতুল, বনের রাজা, গাড়ী চালান, চাকা চালান, মাছ মাছ, সিংহ মশাই সিংহ মশাই, ক'টা বেজেছে প্রভৃতি তাড়া করার ছোট ছোট খেলা করান যেতে পারে।

দু'একটি খেলার ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল।

ইঁদুর বেড়াল।—ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে হাত ধ'রে একটি বড় বৃত্ত করবে। শিক্ষক তাদের মধ্যে দুটিকে বেছে ইঁদুর ও বেড়াল করবেন। ইঁদুর বৃত্তের মধ্যে থাকবে। এবং বেড়াল বাইরে থাকবে। এই হ'ল খেলার গঠন। শিক্ষক খেলা আরম্ভ করবার আদেশ দিলে বেড়াল ইঁদুরকে ধ'রতে চেষ্টা করবে। বৃত্তের অন্য ছেলেমেয়ে বেড়ালকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেবে। আবার যদি বেড়াল ঢুকে পড়ে তবে ইঁদুরকে ছেড়ে দেবে। মোটকথা তারা ইঁদুরকে সাহায্য ক'রবে ও বেড়ালকে বাধা দেবে। তা সত্ত্বেও যদি বেড়াল ইঁদুরকে ধরে ফেলে তবে ইঁদুর বেড়াল হবে এবং বেড়াল ইঁদুর হবে কিম্বা শিক্ষক অন্য বেড়াল ও ইঁদুর বেছে দেবেন। যে সকল বেড়াল ইঁদুর ধরতে পেরেছে তারা জয়ী হবে ও যে সকল ইঁদুর ধরা পড়েনি তারাও জয়ী হ'বে।

ছোট পুতুল বড় পুতুল।—গঠন।—একটি নিরাপদ চকের রেখা বা দড়ির লাইনের পিছনে ছেলেমেয়েরা থাকবে, মাঠের অন্য প্রান্তে একটি চৌকো বা গোল চিহ্নিত স্থান বাঘের মাসীর জন্যে নির্দিষ্ট আছে। শিক্ষক আগে নিম্নলিখিত ছড়াটি শিশুদের শিখিয়ে নেবেনঃ—

"ছোট পুতুল বড় পুতুল হাসে হা হা
খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসী ধরতে পারে না।।"

এই ছড়াটি বলবার সময় শিক্ষকের নজর থাকবে যে ছেলেমেয়েরা যেন "ছোট পুতুল" বলতে খুব ছোট হয়, এবং বড় পুতুল বলতে যত বড় হ'তে পারে তাই হয়। শিক্ষক একটি শিশুকে বাঘের মাসী ব'লে চিহ্নিত ঘরে পাঠাবেন, এবং এই ছড়াটি বলতে বলতে শিশুদের বাঘের মাসীর ঘরের দিকে যেতে বলবেন। তারা বাঘের মাসীর ঘরের কাছে গেলেও যতক্ষণ বাঘের মাসী তাদের তাড়া না করে ততক্ষণ লাফিয়ে ও ছোট বড় হয়ে ছড়া বলতে থাকবে, বাঘের মাসী তাড়া করলেই তারা ছুটে নিরাপদ লাইনে চলে যাবে। বাঘের মাসী কাউকে ধরে ফেললে সে আবার বাঘের মাসী হবে। যাদের বাঘের মাসী হ'তে হয়নি তারা জয়ী হ'বে। খেলাটি প্রথম করবার সময় শিক্ষক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দেবেন—তাতে তারা উৎসাহ পাবে এবং ছড়াটি সুন্দর ক'রে বলতে ও দেখাতে শিখবে। শিক্ষক খেলার আরম্ভে সর্বদা খেলার নাম শিশুদের ব'লে দেবেন এবং খেলার শেষে জয়ীকে, তাও ব'লে দেবেন, নচেৎ খেলার আনন্দ কমে যাবে। ছড়ার গানের সঙ্গে এইরূপ খেলা শিশুদের ভাষাশিক্ষায়ও সাহায্য করবে।

"লেজ ধরা", "বন্য ঘোড়া", "হাত ছোঁওয়া" ইত্যাদি জাতীয় দলীয় খেলা এই বয়সে দেওয়া চলতে পারে।

(গ) সহজ দলীয় নাচ, কর্ম-সংগীত (Action song), গানের খেলা, ছন্দ ও তালের সঙ্গে খেলা প্রভৃতি এই বয়সে শিশুদের উপযোগী, যথা।—

(১) চাষীর বর্ষা এলো রে..............

(২) মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে...........

(৩) ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...............
(৪) মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ..................
(৫) বন্ধন হারায়ে বন্ধুর পথ..............
(৬) আমি ভয় করব না ভয় করব না............
(৭) পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয়রে চলে, আয়, আয়, আয়..................
(৮) মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে...............
(৯) চমকে চমকে ভীরু ভীরু পায়............
(১০) আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি...............
(১১) আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি—নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান....

উপর্যুক্ত কর্ম-সঙ্গীত (Action song) কয়েকটি দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া হ'ল। এই বয়সের উপযোগী আরও নূতন কর্ম-সংগীত তালিকাভুক্ত করবার বা বাদ দেবার স্বাধীনতা শিক্ষক শিক্ষিকার থাকবে এবং ছড়াতে সুর সংযোগ ক'রে তিনি ছড়াকে শিশুদের হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলতে পারেন।

(ঘ) **সাঁতার।**—নিশ্বাস নিয়ে ঠাঁই জলে ডুব দিয়ে জলের নিচে মুখ রেখে নিশ্বাস ছাড়া, ডুব সাঁতার, হাত ও পায়ের সঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। ব্যায়ামের সময় বিদ্যালয়ের বেঞ্চ মেঝে ইত্যাদিতে শিক্ষক শিশুদের সাঁতারের অংশ তালিম দিয়ে নিতে পারেন।

৩। **নিয়মানুযায়ী খেলা।**—প্রথম শ্রেণীর শেষের দিকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্য খেলাও ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াবার, বসবার এবং শোবার সুষ্ঠু ভঙ্গীর উপর একটু একটু করে জোর দিতে হবে। নিয়মিত খেলার গঠনও একটু একটু ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুরা লাইনে দাঁড়াতে শিখবে প্রথমে দড়ির সাহায্যে ও চক বা চুনের লাইনের সাহায্যে শেখাতে হবে। ক্রমশঃ হাঁটতে ঘুরতে গোল করতে শিখবে। লাইন শিখলে, সেই লাইনেই হাত ধরে দুই প্রান্তের দুইটি শিশু দৌড়ে এসে হাত ধরলেই গোল হবে। মাঠের চার কোণে চারটি লাইন বা দড়ি দিয়ে ঘর চিহ্নিত ক'রে শিশুদের সেই ঘরে ভাগ ক'রে দিয়ে ঘর বদল করতে শেখাতে হ'বে। ছোট ছোট লাফ দিয়ে এই সময় তারা ঘুরতে শিখবে এবং দিক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান তাদের দিতে হবে। এই বয়সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে দাঁড়ান, হঠাৎ থামতে বললে থামতে পারা ইত্যাদি কাজগুলি শিশুদের ক'রতে পারা চাই।

ব্রতচারী।—"সূর্যি মামা", "হালে, না, খা", "ভগবান হে" প্রভৃতি ব্রতচারী নাচ গান এই বয়সে আরম্ভ করা যেতে পারে।

খেলাধূলার সরঞ্জাম।—নিম্নলিখিত খেলার জিনিষ তৈয়ার করবার জন্য শিক্ষক শিশুদের উৎসাহিত ক'রবেন এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য ক'রবেন।

(১) বল—কর্ক (cork), ছোবড়া, পুরোণ মোজা, টুকরা উল বা নেকড়া প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ার করান যেতে পারে।
(২) ব্যান্ড—সাড়ীর পাড় দ্বারা তৈরী করা যায়।
(৩) স্কিপিংএর দড়ি পাড় বিনুনি ক'রে বাঁশের হাতল দিয়ে তৈরী হ'বে।
(৪) টিনে বালি ভ'রে রঙ ক'রে নিয়ে ব্লকের কাজ চলবে।
(৫) বাঁশ বা বেত ভাল ক'রে সমান ক'রে নিলে লাফাবার কাজ চলবে, লাঠি খেলা শিক্ষা দেওয়া যাবে। এছাড়া শিক্ষক খেলার সরঞ্জাম নিজে ভেবে শিশুদের দ্বারা তা তৈরী করিয়ে নেবেন; তবে তাঁকে মনে রাখতে হ'বে যে তা যেন স্বল্প ব্যয়ে করা যায়।

(গ) স্বাস্থ্য-শিক্ষা

ভূমিকা।—আমাদের সমাজজীবনে স্বাস্থ্য বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও স্বাস্থ্য-বিধি পালনে অবহেলার পরিচয় পদে পদে দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্য আমাদের দেশে গড়পড়তা পরমায়ু মাত্র পঁচিশ বৎসর এবং শিশুমৃত্যুহার সভ্যদেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকেই সকলপ্রকার শিক্ষার ভিত্তি বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রতি অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সত্যসত্যই স্বাস্থ্যময় সমাজজীবন গড়ে' তুলতে হলে মানবজীবনের গোড়া থেকে কাজ সুরু করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে আসবেন তাদের ৫।৬ বৎসর বয়সের সময় থেকে। এত দেরীতে শিশুদের সংস্পর্শে আসার দরুণ তাঁদের কাজ কিছুটা জটিল হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নাই। কারণ অশিক্ষিত মা-বাপের কাছ থেকে ছেলেরা তো সাধারণতঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা পেতেই পারে না, বরঞ্চ, অনেক ক্ষেত্রেই বহু অস্বাস্থ্যকর কু-অভ্যাস ঐ ৫।৬ বৎসর বয়সের মধ্যেই তারা গঠন করে। তবুও নিষ্ঠা এবং উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে গেলে সুফল পাওয়া যাবে সন্দেহ নাই।

বহুল অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে যে শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবহারিক এবং অভ্যাস-মূলক হলে, তবেই যথার্থ ফলপ্রদ হয়। তাছাড়া, শিশুরা সদুপদেশে যত না শেখে, তার চাইতে বেশী শেখে মহৎ উদাহরণে।

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ শুধু বাঁধা-ধরা ক্লাসের ঘণ্টাতে স্বাস্থ্যবিধিগুলি আউড়ে গেলে চলবে না—তাঁদের নিজেদের জীবনে ঐ নিয়মগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে এবং তাঁদের নির্দেশমত সকলে যাতে ঐগুলি ঠিক ঠিক পালন করে, তাও দেখতে হবে। শিশুদের নিজেদের স্বাস্থ্যশিক্ষাও হবে কর্মকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যবিধি পালন, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন এবং সেই বিষয়ের আলোচনার মধ্য দিয়েই তারা স্বাস্থ্যশিক্ষা লাভ করবে।

স্বাস্থ্য-পরিচয়পত্র।—স্বাস্থ্যবিধান ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য প্রত্যেক শিশুর নামে একখানি স্বাস্থ্য-পরিচয়পত্র থাকবে—এই রকম স্বাস্থ্যপত্রের একটি নমুনা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য যে শুধু পরিচয়পত্র তৈরী করে' ও পূরণ করেই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হবে না, যাতে শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্রমিক উন্নতি হয় সে বিষয়ে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীতে গিয়ে, তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদেরও একাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সাফাই।—(১) ব্যক্তিগত, এবং (২) সামাজিক সাফাই অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতাই সকল স্বাস্থ্যের ভিত্তি। সুতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথাই হবে সকলপ্রকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা।

(১) প্রথম শ্রেণী থেকেই শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে শেখাতে হবে। কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারা এ শিক্ষা দেওয়া যায় না,—হাতে নাতে করে' দেখাতে হবে।

(ক) **সাধারণ পরিচ্ছন্নতা।**—শিশুদের মাথা, চুল, চোখ, কান, নাক, দাঁত, জিভ, হাত, পা ও নখ পরিষ্কার আছে কিনা দেখতে হবে। দরকার হলে —এবং প্রথম প্রথম দরকার হবেই—শিক্ষক নিজেই শিশুর দাঁত মেজে, চোখ মুখ ধুইয়ে, চুল আঁচড়িয়ে, হাত পায়ের নখ কেটে, হাত পা ভাল করে' রগড়ে ধুয়ে এবং নাক কান পরিষ্কার করে দেবেন। দুচার দিন এভাবে করলেই শিশুদের নিজেদের ও তাদের অভিভাবকদের মনে একটা স্বাস্থ্য-চেতনা জাগবে এবং তাহলে এর পরে স্বাস্থ্য-নীতিগুলি মোটামুটিভাবে পালিত হবে বলে' আশা করা যেতে পারে।

(খ) স্নান।—স্নানের প্রয়োজনীয়তা এবং, বিশেষ করে, আমাদের দেশের গরম ও সাধারণতঃ ধূলিময় আবহাওয়ার মধ্যে প্রত্যহ স্নান ও হাত পা প্রভৃতি ধোওয়ার আবশ্যকতা যে কত বেশী তা শিশুদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। গরমের সময়ে, অথবা খেলাধুলা করে' ঘাম বেরোবার পরে, কিভাবে, কতক্ষণ পরে ও কেন গা ধুয়ে ফেলা অথবা শুকনো কি ভিজে

গামছা দিয়ে রগড়ে মুছে ফেলা আবশ্যক তা তাদের খুব ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। ভিজে গা ভাল করে' না মুছলে, অথবা ভিজে কাপড়ে বেশীক্ষণ থাকলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে, একথাও বলা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন তেল মাখিয়ে, গা রগড়িয়ে স্নান করিয়ে দেবেন। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েরা তাঁর কাজে সাহায্য করবে।

(গ) **কাপড় চোপড়।**—এর পরেই আসে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়ের কথা। এক্ষেত্রেও হয় তো প্রথমে শিক্ষক মহাশয়কে শিশুদের জামা কাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে হাতে নাতে কাপড় কাচার পদ্ধতি দেখিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দু একদিন পরেই শিশুরা নিজেরাই উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের কাপড় কেচে নেবে।

(ঘ) **স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।**—মলমূত্রাদি ত্যাগ ও শৌচাদি প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে। বেগ চেপে রাখার অপকারিতা এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার আবশ্যকতা তাদের জানা উচিত। যেখানে সেখানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করলে সৌন্দর্যহানি ছাড়াও অন্যান্য কি কি অসুবিধা ঘটতে পারে এবং বিশেষ করে, কি কি রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাও তাদের জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে সুব্যবস্থা রেখে শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সদভ্যাস গঠনে সহায়তা করবেন।

(২) **সামাজিক।**—কেবলমাত্র নিজে পরিচ্ছন্ন থাকাই যে যথেষ্ট নয়, সমস্ত পরিবেশটিকেই নির্মল ও সুন্দর করে তুলতে হবে, এই বোধ শিশুদের মনে জাগানো চাই। একবার শিশুদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা ও সৌন্দর্যজ্ঞান জাগিয়ে তুলতে পারলে শিক্ষক মহাশয়কে মোটেই বেগ পেতে হবে না। উৎসাহের সঙ্গে শিশুরা এগিয়ে এসে সব কাজ করবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শিশুর বয়স এবং সামর্থ্য বুঝে তাকে কাজের ভার দিতে হবে। নিম্নতম শ্রেণীর শিশুরা সবচেয়ে হালকা কাজগুলি করবে।

(ক) **বসবার জায়গা ও শ্রেণীকক্ষ।**—শিশুরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বসবার জায়গা, ব্যবহার করবার জিনিষপত্র প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে যাতে সচেষ্ট হয় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

(খ) **বিদ্যালয়-গৃহ ও প্রাঙ্গণ।**—সম্পূর্ণ শিশুমণ্ডলীটিকে কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে' প্রত্যেক দলের উপরে বিদ্যালয়ের বাড়ী, উঠোন ও চারিধার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ভার দেওয়া ভাল। এতে শ্রমবিমুখতা দূর হবে এবং শ্রমে শ্রদ্ধা বাড়বে;—এ দুইটি বাংলাদেশে একান্ত প্রয়োজন।

(গ) **গ্রাম।**—কিছুদিন বিদ্যালয়ে অভ্যাসের পর প্রতি শনিবার বা যে কোন দিন বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ রেখে গ্রাম-সাফাইর কাজ করা যেতে পারে। সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাস অঞ্চলকে ৫ বা ৬টি মহকুমায় এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে প্রতি মহকুমায় প্রায় সমানসংখ্যক ছাত্রের বাস থাকে। প্রতি অভ্যাস দিবসে এক মহকুমার সকল সভ্যই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অপর যে কোন মহকুমার প্রত্যেক সভ্যের বাড়িতে গিয়ে পরিচ্ছন্নতা বিধান, জলাশয় বা কূপের উন্নতি ইত্যাদি সমাজসেবার কাজ করবে। ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে পর পর অঞ্চল বদলান হবে এবং যে অঞ্চলে কাজ হবে সেই অঞ্চলে প্রতি সভ্য আগন্তুক দলের সঙ্গে প্রত্যেক সভ্যের বাড়ী যাবে। এতে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে চেতনা ছাড়াও নাগরিকতা ও সামাজিকতার অভ্যাসমূলক ও বাস্তব শিক্ষা হবে। অধিকন্তু ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের মিলনে ও সহযোগিতার উন্নততর স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্ভবপর হবে। দেহে, খাদ্যে, পানীয়ে, পোষাকে এবং পরিবেশে সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতাই যে স্বাস্থ্যরক্ষার গোড়ার কথা এ সম্বন্ধে শিশুদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়ে দিতে পারলে ক্রমে অভিভাবকদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হবে। বর্তমান আবর্জনাময় ও পঙ্কিল গ্রাম্য আবহাওয়ার তাহলে কিছুটা উন্নতি সাধিত হবে আশা করা যায়।

(ঘ) আবর্জনা।—আবর্জনাদি কিভাবে আমাদের কাজে লাগতে পারে তাও শিশুদের জানা উচিত। একটা বড় গর্ত খুঁড়ে তাতে সমস্ত আবর্জনা ফেললে এবং পরে সেগুলি পুড়িয়ে ফেললে কেমন করে' সেই ছাইটাকে সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এগুলি হাতে-কলমে করিয়ে শিশুদের শিখিয়ে দিতে হবে।

পাড়াগাঁয়ে কি করে "ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য" মলমূত্রকে অতি সহজে মূল্যবান সারে পরিণত করা যায় সে শিক্ষা দেওয়াও প্রয়োজন।

খাদ্য ও পানীয় জল

(ক) জল।—আমাদের শরীরের মধ্যে জলের প্রয়োজন কি এবং কত রকম ভাবে আমরা সেই চাহিদা মেটাই সে সম্বন্ধে শিশুদের জানা দরকার। কি কিভাবে শরীরমধ্যস্থ ব্যবহৃত জল বেরিয়ে যায়, তাও এই সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে। এরই সঙ্গে আসবে ব্যবহারিক জীবনে জলের প্রয়োজনের কথা। সাধারণতঃ কোন কোন জায়গা থেকে আমরা জল পাই, কি কি-ভাবে জল ব্যবহার করি, এবং এই ব্যবহৃত জলের কি সুব্যবস্থা হতে পারে, সে সম্বন্ধে শিশুদের বলতে হবে।

জল সাধারণতঃ কিভাবে দূষিত হয় তা তাদের জানাতে হবে এবং ছোট শিশুরা যাতে জল দূষিত না করে এ বিষয়ে বড়দের দৃষ্টি রাখতে শেখাতে হবে।

ময়লা পঙ্কিল জল এবং পরিষ্কার জলের মধ্যে কি পার্থক্য তা শিক্ষক মহাশয় নানাবিধ চিত্রের সাহায্যে শিশুদের বোঝাবেন। যদি সম্ভবপর হয় তাহলে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র জোগাড় করে প্রত্যেক শিশুকে ঐ দুরকম জলের পার্থক্য স্বচক্ষে দেখিয়ে দেবেন। ময়লা জলে একটু ফটকিরী বা নির্মলী ফল ঘষে ছেড়ে দিলে কেমন করে' সমস্ত ময়লা তলায় চলে' যায় এবং তারপরে, উপরের থিতোনো জলটাকে খুব সাবধানে অপর একটি পাত্রে ঢেলে কিছুক্ষণ ধরে ফোটালে রোগবীজাণুগুলিকে মেরে ফেলা যায়, এটা সহজেই শিশুদের সামনে হাতে-কলমে করে' দেখানো যেতে পারে।

খাদ্য।—খাদ্য সম্বন্ধেও শিশুদের মনে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। বয়স ও স্বাস্থ্যের উপযোগী পুষ্টিকর, টাটকা, সহজপাচ্য ও সুরক্ষিত খাদ্য, প্রয়োজন এবং তারমধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যাতে উপযুক্ত মাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাও দেখা দরকার। খাদ্যের সাধারণ উপকারিতা এবং কিভাবে প্রস্তুত করলে বেশী উপকার পাবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। মাছি, পিঁপড়ে, আরসোলা প্রভৃতি দ্বারা আ-ঢাকা খাবার কিভাবে নষ্ট হতে পারে তা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। এই সব মাছি, পিঁপড়ে প্রভৃতি সাধারণতঃ কি কি রোগের বীজাণু বহন করে তাও জানা উচিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাওয়া গেলে খুব সহজেই এগুলি দেখানো যায়, অন্যথায় ছবির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। হাট বাজারের সাধারণ দোকান অথবা রাস্তার ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কেনা আ-ঢাকা খাবার যে কেন অনিষ্টকর তা এবার শিশুরা সহজেই বুঝতে পারবে। টাটকা ও বাসি অথবা পচা খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে কি তফাৎ তাও তারা বুঝতে পারবে। একটা বোতলের মধ্যে পচা কলা বা গোবর ও একটার মধ্যে জল রেখে মাছি ও মশার ডিমপাড়া শিশুদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

খাবার পূর্বে ও পরে ভাল করে হাত মুখ ধোওয়া প্রয়োজন এবং খাবার জায়গাটি ভাল করে' পরিষ্কার রাখা দরকার।

শিশুদের ধীরে ও সুস্থভাবে খাদ্যদ্রব্য ভাল করে' চিবিয়ে খেতে শেখাতে হবে। খাবার সময়ে অতিরিক্ত জল খাওয়া যে অনিষ্টকর তাও তাদের বলে দেওয়া উচিত।

যতদূর সম্ভব প্রত্যহ একই সময়ে খাওয়া উচিত। লোভের বশে অতিরিক্ত খাওয়া অনিষ্টকর ; তাড়াহুড়া করে' খেলে সে খাবার ভাল হজম হয় না ; এই সকল বিষয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।

বিদ্যালয়ে যদি প্রত্যহ আহারের ব্যবস্থা থাকে তাহলে তো ভালই। না হলে অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে কোনও উপলক্ষ্য করে' সমবেত ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই সময়ে হাতে-কলমে খাওয়া সম্বন্ধে সদভ্যাস গঠন করাতে হবে।

মুক্ত বায়ু ও খেলাধুলা।—খেলা শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিপোষক একথা আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে। খোলা হাওয়ায় সুন্দর, পরিচ্ছন্ন স্থানে ও নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যে তাদের নিয়মিত খেলার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকা তাদের শারীরিক বৃদ্ধির ও মানসিক স্থৈর্যের অন্তরায়।

সোজা হয়ে না বসে' কুঁজো হয়ে বা এককাত হয়ে বসা ; এক পায়ে দাঁড়ানো; একদিকে অনেক বই বহন করা; খুব ঝুঁকে পড়া বা লেখা প্রভৃতি অভ্যাসগুলি যে অনিষ্টকর তাও শিশুদের জানা উচিত। চলা ও বিশ্রামের সুন্দর ও সুসমঞ্জস ভঙ্গীগুলি ছবির সাহায্যে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে শিক্ষক মহাশয়ের নিজের ভঙ্গী সুষ্ঠু হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্রাম ও নিদ্রা।—প্রথম শ্রেণীর শিশুদের জন্য অন্ততঃ, দুপুর বেলায় বিদ্যালয়ের মধ্যেই কিছুক্ষণ বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কর্মে ও পরিশ্রমে দেহের যে ক্ষতি হয়, বিশ্রাম ও নিদ্রায় তা বহুলাংশে পূরণ হয়। আমাদের দেহযন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। অক্সিজেনের সম্পূর্ণ অভাবে প্রাণহানি ঘটে এবং আংশিক অভাবে দেহযন্ত্র আংশিকভাবে বিকল হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং, জানলা-খোলা ঘরে, পরিষ্কার বিছানায়, প্রচুর অক্সিজেনযুক্ত খোলা হাওয়ার মধ্যে দৈনিক ১ ঘণ্টা বিশ্রাম ও প্রতি রাত্রিতে ৯।১০ ঘণ্টা নিদ্রা শিশুদের পক্ষে প্রয়োজন।

রোগ ও চিকিৎসা।—বলা বাহুল্য প্রথম দুই শ্রেণীর শিশুদের রোগ বা চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান দেওয়া সম্ভবপর নয়। তথাপি অতি সাধারণ কয়েকটি রোগ এবং তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা তাদের বলা যেতে পারে। সংক্রামক রোগ হলে বা গৃহে কোন সংক্রামক রোগী থাকলে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আসতে নিষেধ করতে হবে, এবং এই ব্যবস্থা কেন দরকার তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

সাবান ও গরম জল, ফিনাইল, টিংচার আয়োডিন প্রভৃতির উপকারিতা ও ব্যবহার শিশুদের সাধারণভাবে শেখানো উচিত। কোথাও সামান্য কিছু ছড়ে' বা কেটে গেলে এই সব জিনিষ কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা তাদের হাতে-কলমে শেখা দরকার। জলপটি বা গরম সেঁক দিয়ে কেমন করে সামান্য সামান্য চোট আরাম করা যেতে পারে তাও তাদের জানা দরকার। প্রত্যহ প্রত্যেক শ্রেণীর একটি-দুটি শিশুকে "চিকিৎসক" নির্বাচিত করে এইসব কাজ ও অন্যান্য শিশুদের দাঁত, নখ, চোখ প্রভৃতি দেখার ভার দিলে সুফল পাওয়া যায়। পেনসিল মুখে দেওয়া, আঙুল চোষা, দাঁতে নখ কাটা, নাকে বা কানে কিছু ঢোকান প্রভৃতি অভ্যাস-গুলি যে কত অনিষ্টকর তা শিশুদের শেখাতে হবে। বিদ্যালয়ে কিছু আয়োডিন, বেনজীন, তুলো, পরিষ্কার নেকড়া, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি প্রাথমিক চিকিৎসার অতি সাধারণ জিনিষগুলি জোগাড় করে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশিষ্টে শিশুদের স্বাস্থ্য-পরিচয়পত্রের একটি নমুনা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমে কাজটি কিছু কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, যেহেতু পিতামাতাও শিশুর যথার্থ কল্যাণকামী, শিক্ষক মহাশয় যদি ঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারেন, তাহলে শিশুর পক্ষে কল্যাণকর যে কোনও কাজে শিশুর পিতামাতার সহায়তা নিশ্চয়ই পাবেন।

স্বাস্থ্য-পরিচয় পত্র

শিশুর নাম.......................বয়স.........শ্রেণী.........ঠিকানা { অভিভাবকের নাম.......................
রাস্তা.......................
পাড়া.......................
গ্রাম.......................

বিষয়	প্রথম পরীক্ষা	দ্বিতীয় পরীক্ষা	তৃতীয় পরীক্ষা	বিশেষ মন্তব্য।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তিগত ও সামাজিক	তাং	তাং	তাং	
১। সাধারণ স্বাস্থ্য	...	...	...	...
২। ওজন (সের বা পাউণ্ড)	...	...	...	...
৩। উচ্চতা (ইঞ্চি)	...	...	...	...
৪। কান (কানপাকা, কান থেকে পুঁজ পড়া ইত্যাদি,	...	...	...	...
৫। সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি	...	...	...	...
৬। খোস, চুলকানি প্রভৃতি	...	...	...	...
৭। অন্য কোন পীড়া	...	...	...	...
৮। সাধারণ স্বাস্থ্য	...	...	...	...
৯। মানসিক স্থৈর্য	...	...	...	...
১০। মেলামেশা।	...	...	...	...
১১। খেলাধুলায় আগ্রহ	...	...	...	...
১২। শিক্ষকের অভিমত	...	...	...	...
	প্রধান শিক্ষক	প্রধান শিক্ষক	প্রধান শিক্ষক	

.................................বিদ্যালয়

অভিভাবকের জবাব বা মন্তব্য

তৃতীয় অধ্যায়

(ক) সামাজিক শিক্ষা

নবজাত শিশু সম্পূর্ণভাবে অসামাজিক। ক্রমে ক্রমে বড়দের অনুকরণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা পারিবারিক জীবনে ও নিজস্ব বন্ধুমহলে সে মানিয়ে চলতে শেখে। কিন্তু ভালমন্দ বোধ অথবা ভালমন্দ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা তার তখনও জন্মায় না। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কোনটি ঘটলে ভাল লাগে এবং কোন্‌টি মন্দ লাগে তাই সে বুঝতে পারে। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে কোনও সাধারণ ধারণা তার থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে কোনও অন্যায় ভোগ করতে হ'লে সে ক্ষুণ্ণ হয়। অপরের প্রতি ঠিক সেই একই অবিচার হ'তে দেখলেও সে সব সময়ে তা লক্ষ্য করে না।

গৃহ পরিবারে অপর পাঁচটি ভাইবোনের সঙ্গে বাস ক'রে শিশুরা সামাজিকভাবে বাস করতে শেখে। পিতামাতা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং তৎপর হলে গৃহ পরিবারে সামাজিক শিক্ষা ভালই হয়। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং সময়াভাববশতঃ পিতা মাতা শিশুর সুশিক্ষা লাভের উপযুক্ত পরিবেশ গড়তে পারেন না।

পাঁচ বৎসরের শিশু যখন প্রাথমিক শিক্ষালয়ের প্রথম শ্রেণীতে এসে ভর্তি হয় তখনও তার নীতিবোধ, বা সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয় না। এই বয়সের শিশুদের উপদেশ দিয়ে নীতিধর্ম শেখান যায় না। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে পারলে এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলে তারা তা থেকেই শিক্ষালাভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি আমরা অনর্থক অনেকগুলি বিধি নিষেধ তৈরী ক'রে দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা সেগুলিকে রক্ষা করি তা হ'লে শিশুর মনে তা কোনও গভীর রেখাপাত করে না। কেবলমাত্র শিক্ষক মহাশয়ের বেতের ভয়ে যে শিশু দুষ্টামি বন্ধ করে, শিক্ষক মহাশয় চক্ষুর অন্তরালে গেলেই সে আবার অসামাজিক ব্যবহার করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ থাকা উচিত এবং শিশুদের বাস্তব জীবনে সেগুলির আবশ্যকীয়তা যাতে তারা বুঝতে পারে সেইরকম ব্যবস্থা করা উচিত। তা হ'লে শিশুরা যথার্থই সেই নিয়মগুলি রক্ষা করবার চেষ্টা করবে। উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা, শিক্ষকের সাহায্যে তাদের নিজেদের বাল-সমাজ-জীবনের পালনীয় বিধি নিষেধগুলি নিজেরাই গঠন করতে পারবে। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ছয় বৎসরের শিশুদের সাধারণ নীতিবোধ না জাগলেও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনে ভদ্র এবং সংযত আচরণ করতে শেখে। শিক্ষকের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই বয়সের শিশুরা প্রধানতঃ দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ দ্বারা শেখে। গৃহে অথবা বিদ্যালয়ে যদি শিশুরা সর্বদা কু-দৃষ্টান্ত দেখে তা হ'লে শিক্ষকের সহস্র সদুপদেশ ব্যর্থ হয়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে যদিও শিশুদের সর্বদা সত্যকথা বলতে এবং সাধু আচরণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের উপদেষ্টা—গুরুজনেরা—শিক্ষক এবং পিতামাতা নিজেরাই সর্বদা সত্যকথা বলেন না অথবা সততা রক্ষা ক'রে চলেন না। এমনও অনেক সময়ে দেখা যায় যে গুরুজনেরা শিশুদের নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে বলেন এবং কুবাক্য বলতে নিষেধ করেন। অথচ তাঁরা নিজেরা শিশুদের সম্মুখেই পরস্পরের সঙ্গে অসংযত আচরণ করেন এবং গালিগালাজ ও কটুবাক্য ব্যবহার করেন।

বলা বাহুল্য যে, এই সকল ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা বা সদুপদেশের বিন্দুমাত্র প্রভাব শিশুর জীবনে প্রকাশ পায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুকে সামাজিক শিক্ষা দিতে হলে সর্ব-প্রথমে শিক্ষক মহাশয়কে তার নিজের আচার আচরণ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। এবং তৎপরে

শিশুর গৃহের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে তাহার পিতামাতার সহযোগিতা লাভ করতে হবে। শিশুরা গৃহে সকল সময়ে কু-দৃষ্টান্ত দেখতে থাকলে হয়ত শিক্ষক মহাশয়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

(১) উপযুক্ত দৃষ্টান্ত এবং পরিবেশ পেলে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিশুরাও ক্রমে সকলের সঙ্গে ভদ্র এবং সুন্দর আচরণ করতে শিখবে।

শিক্ষকমহাশয়, পিতামাতা, অতিথি অভ্যাগত এবং অন্যান্য যাঁরা বয়সে ও অভিজ্ঞতায় বড় তাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়, তাঁদের কথা যে শুনতে হয় এসব শিশুদের শেখাতে হবে।

অতিথিসংকারের যে উন্নত আদর্শ ও দৃষ্টান্ত ভারতের জাতীয় জীবনে প্রচলিত ছিল, তাকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে দেখা যায় যে উচ্চ বর্ণের অথবা অবস্থাপন্ন পরিবারের শিশুরা ছেলেবেলা থেকেই নিম্ন বর্ণের এবং দরিদ্র লোকদের যথেষ্ট সম্মান করতে শেখে না। বলা বাহুল্য যে শিশুদের নিজেদের চরিত্রগঠন এবং ভবিষ্যৎ সমাজের জাতিগঠনের পক্ষে এটা অত্যন্ত হানিকর। শিক্ষক মহাশয়কে প্রথম থেকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন শিশুরা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়। ধোপা, নাপিত, মেথর, মুচি বা অন্য কাউকে যেন তারা নিম্ন স্তরের মানুষ বলে মনে না করে। শিশুকাল হতেই যেন ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হতে শেখে, বিদ্যালয়ের গৃহ ও প্রাঙ্গণ যেন তারা নিজেরাই পরিষ্কার করে। বিদ্যালয়ে খাবার ব্যবস্থা থাকলে আসন পাতা ও পরিবেশন হতে সুরু ক'রে উচ্ছিষ্ট তোলা ও বাসনমাজা সকল কাজেই যেন তারা নিজেরা সাধ্যানুসারে সাহায্য করে। এই সকল কাজ ছেলেবেলা হতে নিজের হাতে করলে কোনও শিশুই এই সকল কাজকে নিম্নশ্রেণীর কাজ ব'লে মনে করতে পারবে না। এ সকল কথাও পূর্বে বিশদভাবে বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ের কাজের জন্য যে সকল ব্যক্তির সাহায্য নিতে হবে তাদের যেন শিশুরা বন্ধুভাবে গ্রহণ করে এবং ভৃত্যভাবে অবজ্ঞা না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই সকল বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের নিজের আচরণের গুরুত্ব খুবই বেশী। তিনি নিজে যদি দেশ ও সমাজের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হতে পারেন, তা হ'লে কখনই ছাত্রদের শ্রদ্ধাবান হতে শেখাতে পারবেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নিছক সদুপদেশ ও পুরস্কারের দ্বারা নীতিশিক্ষা দেওয়া যায় না। বরঞ্চ শিক্ষক মহাশয় যদি শিশুদের শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করতে পারেন, তা হ'লে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণে শিশুদের আচার ব্যবহারের উন্নতি হ'তে পারবে।

(২) সমবয়সী ভাইবোন বা বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ শিশুদের শেখাতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে অন্যে তার প্রতি যে রকম আচরণ করলে শিশুরা ক্ষুণ্ন বা ক্রুদ্ধ হয় তারা নিজেরা অপরের প্রতি অনুরূপ আচরণ করে। যদি আলাপ আলোচনার দ্বারা তাদের নিজেদেরকে অপরের স্থানে কল্পনা করে নিতে শেখান যায় তা হ'লে নিজেদের দোষটি উপলব্ধি করবার পক্ষে সুবিধা হয়। শিশুদের পরস্পরের মধ্যে যাতে বিদ্বেষ বা প্রতিযোগিতার ভাবের পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং সদিচ্ছা থাকে সে বিষয় সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। নিজের কোনও আচরণের দ্বারা শিক্ষক মহাশয় কখনও যেন একটি শিশুর বিরুদ্ধে অপর একটি শিশুর হিংসা বা দ্বেষ জাগ্রত না করেন।

উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দেখলে এই বয়সেই শিশুরা নিজেদের হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও লোভ অনেকটা সংযত করতে শিখবে। ঝগড়া বিবাদ না ক'রে পরস্পরের সহযোগিতায় বন্ধুভাবে কাজ করতে শিখবে।

(৩) পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর শিশুরা শিক্ষকের সাহায্যে নিজেদের সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি নিজেরাই গঠন করতে পারে। প্রথম ও

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা নিজেরা নিয়ম গঠন করতে না পারলেও নিয়মগুলির সার্থকতা বুঝিয়ে দিলে তারাও বুঝতে পারে। এই বুঝিয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। না হলে নিয়ম রক্ষায় তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—

(ক) ভদ্র ও নম্র আচরণ সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক।

(খ) প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস খুবই ভাল। তা হ'লে প্রয়োজনের সময় অযথা বিপন্ন হতে হয় না।

(গ) পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করলে সকলেরই সুবিধা হয় এবং কাজটিও ভাল হয়।

(ঘ) সকল কাজ ঠিক সময় করলে এবং সময় নষ্ট না করলে নিজেরও সুবিধা হয়, কাজেও মন বসে।

(ঙ) অযথা চীৎকার ক'রে কথা বললে অথবা অপরের কথার মধ্যে কথা বললে কারো কথাই শোনা যায় না।

(চ) সভার মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা না করলে সভার কাজ পণ্ড হয়।

(ছ) খাবার সময়ে নিয়মানুবর্তিতা না রক্ষা করলে খাবার বিঘ্ন জন্মায়। যে যখন আসে সেই হিসাবে সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়ালে এবং নিজের পালার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করলে সকলেরই সুবিধা হয়। অন্যথায় এমন গণ্ডোগোলের সৃষ্টি হতে পারে যে সকলেরই খাওয়া পণ্ড হ'তে পারে।

(জ) ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এবং ভদ্রভাবে খেতে শেখা উচিত, না হলে নিজের এবং অপরের অসুবিধা হয়।

(ঝ) নিজেদের ব্যবহারের পাঠ্যপুস্তক, খাতা, অন্যান্য বই ইত্যাদি বন্ধুভাবে সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে ব্যবহার করলে সকলেরই সুবিধা হয়।

(ঞ) অসত্য বাক্য ও অসাধু আচরণ একাধারে অত্যন্ত গর্হিত এবং অসুবিধাজনক, কারণ যে এরকম আচরণ করে কেউ তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।

বলা বাহুল্য যে এইরকম বিধি-নিষেধের কোনও একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নয়, এবং অধিকসংখ্যক বিধি-নিষেধ প্রস্তুত করাও উচিত নয়। প্রত্যেকটি নিয়মের প্রয়োজনীয়তা শিশুদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে শিক্ষক মহাশয় তাদের দিয়েই তাদের নিজেদের নিয়মাবলী গঠন করিয়ে নেবেন।

(খ) সামাজিক ও পৌর শিক্ষা

ভূমিকা।—বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের দিকেই শুধু দৃষ্টি দেওয়া হয় না। যাতে সে ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। বলা বাহুল্য যে কতকগুলি পুঁথিগত উপদেশ দিয়ে শিশুকে নাগরিক ক'রে তোলা যায় না।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিশুদের পক্ষে একটি ছোট-খাট সমাজ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রেণীর শৃঙ্খলারক্ষা, আসবাব সংগ্রহ ও তার যত্ন করা, হিসাব

রাখা, শ্রেণীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, পানীয় ও (সম্ভব হলে) জলযোগের সুব্যবস্থা করা, উৎসব অনুষ্ঠান ও পরিচালন, রোগীর শুশ্রূষা, অতিথির সুপরিচর্যা প্রভৃতি কাজ এই সমাজের সম্মুখে স্বাভাবিকভাবে আসে।

শিক্ষক ও শিশুসমাজ।—এই শিশুসমাজ গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালন করা হয়। প্রত্যেক শিশু এই সমাজের সক্রিয় সভ্য। শিক্ষক সমাজপরিচালনে যুক্তি ও উপদেশ প্রদান করেন বটে—শুধু "আদেশ" দিয়েই তিনি তা পরিচালন করেন না। শিশুদের গণতান্ত্রিক মতামতেই তা পরিচালিত হয়—তিনি সেই মতামতকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন। প্রত্যেক শিশু এই সমাজ পরিচালনে নিজ মতামত ব্যক্ত করতে পারে। তারাই বিভিন্ন কাজ চালাবার জন্য তা'দের ভেতর হ'তে এক একজনকে নির্বাচিত করে'। ঐ নির্বাচিত শিশুকে মন্ত্রী বলা হয় যেমন—শ্রেণী মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, সাফাই মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ইত্যাদি। এই 'মন্ত্রী' কথা ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে এর দ্বারা শিশু তাদের প্রাপ্ত কার্যভারকে যথোচিত মর্যাদা দিতে শেখে এবং যে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য তা'রা প্রস্তুত হ'চ্ছে সেখানে "মন্ত্রী" ক্ষমতা ও সম্পদভোগী অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে "সেবক" অর্থেই যাতে ব্যবহৃত হয় তার ভিত্তিও এই শিক্ষার মধ্যে স্থাপিত হ'চ্ছে।

'মন্ত্রী' নির্বাচন।—'মন্ত্রি'মণ্ডলী বা নেতৃমণ্ডলী নির্বাচনের মধ্যে শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করবে—দায়িত্ববোধও জাগ্রত হবে—আর গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানলাভ করবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরে পরে মন্ত্রীদের নির্বাচন হ'বে এবং পুরাতন মন্ত্রীরা শিশুসমাজের কাছে তাদের কাজের বিবরণ দেবে। প্রথম শ্রেণীর শিশুরা লিখিত বিবরণ দিতে পারবে না—তারা মৌখিক বিবরণ দেবে। তারা বেশী দিনের কথা মনে রাখতে পারবে না—তাই তাদের নির্বাচন সাপ্তাহিক হওয়া ভাল। দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্বাচন পাক্ষিক হওয়া মন্দ নয়। তৃতীয় শ্রেণীর নির্বাচন মাসে একবার করাই ভালো। সমগ্র বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজের জন্য একদল শিশুকে পৃথকভাবে নির্বাচিত করার প্রয়োজন হ'বে। এরা হবে বিদ্যালয়ের মন্ত্রিমণ্ডল—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে তুলনীয়।

ভোটদান-পদ্ধতি।—বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নির্বাচনে ভোটদান-পদ্ধতির পরিবর্তন করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে হাত তুলে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাই ভালো। বড়দের জন্য "ব্যালট" ব্যবস্থা করা যায়। পঞ্চম শ্রেণীতে "এককসঞ্চরণশীল ভোট" (Single transferable vote) ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঐরূপ নির্বাচন ব্যাপারে উৎসাহ থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যাতে মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার, ধ্বংসাত্মক সমালোচনা, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি না ঘটে সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন।

মন্ত্রীর সংখ্যা ও কাজ।—শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে নিম্নমত মন্ত্রিপদ সৃষ্টি করা যায়।

১। **শ্রেণী মন্ত্রী।**—এর কাজ হ'বে শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা—শ্রেণীর কাজের জন্য আসবাব প্রভৃতির ব্যবস্থা করা ও তার যত্ন নেওয়া, শিশুদের সাহায্যে শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়ম রচনা করা ও সকলকে সেগুলি মান্য করার প্রতি অবহিত রাখা, উপস্থিতি, অনুপস্থিতির হিসাব রাখা ইত্যাদি।

শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মগুলি সহজ হওয়া দরকার—আর নিষেধাত্মক শব্দ অপেক্ষা অনুজ্ঞাত্মক শব্দ থাকাই ভালো। বেশী বিধি-নিষেধ সৃষ্টি না ক'রে কয়েকটি সহজ আচরণ-যোগ্য নিয়ম মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষা একটা বড় শিক্ষা। সেদিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে হ'বে। কয়েকটি নিয়মের উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল—

(১) "একে যবে কথা কয়, অন্য সবে মৌন রয়।"

(২) "আগেভাগে নাহি যাবো, পালার জন্য সবুর সব।"

শ্রেণীমন্ত্রী শ্রেণীর শৃঙখলারক্ষা ও আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে অন্য শিশুদের সহযোগী মনোভাব সৃষ্টির দিকেই যাতে সচেষ্ট হয়, আইনের কড়াকড়ি না খাটায়, সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি দেবেন। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন শিশুর জন্য কঠোরতার প্রয়োজন ঘটতে পারে—তখন শ্রেণীমন্ত্রী সেই শিশুর আচরণের প্রতি বিচারসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

২। **সাফাই মন্ত্রী।**—বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পাঠই সুরু হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হ'তে—"নঈ তালিম সাফাই সে সুরু হোতি হ্যায়।" প্রচলিত বিদ্যালয় ও তার আবেষ্টনীর অপরিচ্ছন্নতা বিচার করলে, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এই প্রখর দৃষ্টির সার্থকতা সহজেই বোঝা যাবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে শুধু "সাফ" রাখলেই চলবে না; শিশুদের মনে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এমন চেতনাবোধ জাগাতে হবে যেন তারা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা—অপরিচ্ছন্নতা—কাটিয়ে উঠতে পারে এবং পরিচ্ছন্নতা তাদের জীবনের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়। শিক্ষক মহাশয়ের আচরণ এ বিষয়ে আদর্শ হওয়া উচিত। সমগ্র ভারতের দৃষ্টিতে জাতির জীবনে এইরূপ পরিচ্ছন্নতা আনতে হ'লে প্রতি নাগরিককে ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে হ'বে। শৈশব থেকে তাদের অভ্যাসকে এর অনুকূলে গঠন করতে হবে। শ্রেণীগতভাবে উক্ত অভ্যাস সম্বন্ধে সজাগ থাকার কাজ হ'বে সাফাই মন্ত্রীর। সে অপরের সহায়তায় শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের আশ পাশ পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং সকলকে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার বিধান ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করবে।

৩। **শিল্প মন্ত্রী।**—এই কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত শিশু বিভিন্ন শিল্প সংক্রান্ত সরঞ্জাম রক্ষা, বিতরণ ও সংগ্রহের দায়িত্ব নেবে। শিল্প সংক্রান্ত হিসাব রাখবে। সরঞ্জামাদির যাতে অপচয় না হয় সে দিকে দৃষ্টি দেবে। মাল ফুরিয়ে গেলে আমদানির ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজন বুঝলে, বিভিন্ন শিল্প কর্মের জন্য পৃথক মন্ত্রী নির্বাচন করা যেতে পারে।

৪। **উদ্যান মন্ত্রী।**—কৃষি জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়—এজন্য জীবনকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষায় কৃষিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বলা বাহুল্য শিশুরা বাগানের কাজ নিজেরাই করবে। কৃষি মন্ত্রী এই কাজ পরিচালনা করবে। সে সময় পত্রিকা (Time-table) রচনায় অংশ গ্রহণ করবে। কৃষিকাজের জন্য দল ভাগ করবে—কাজের পরিকল্পনা করবে—সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনা করবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে—সারের ব্যবস্থা করবে—সাফাই মন্ত্রীর সহযোগিতায় আবর্জনা হ'তে সার তৈরী করবে—উৎপন্ন সব্জীর হিসাব রাখবে ও বিক্রয় বা বিতরণ করবে—বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সে অবশ্যই একা এই সব কাজ করবে না—তার পরিচালনাধীনে অন্য শিশুরাও অংশ নেবে।

৫। **স্বাস্থ্য মন্ত্রী।**—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার প্রতিই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। এজন্য শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়মগুলি মান্য করানো অবশ্য প্রয়োজন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই কাজ পরিচালনা করবে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাজ। স্বাস্থ্য মন্ত্রী শিক্ষক ও শ্রেণীর শিশুদের সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করবে ও সেগুলি রক্ষা করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

৬। **খাদ্য মন্ত্রী।**—সাধারণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন আহারের ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে, কিন্তু শিশুদের নাগরিক শিক্ষার জন্য ও আনন্দ বিধানের জন্য মাঝে মাঝে সামুদায়িক ভোজনব্যবস্থা করা হ'বে। তাছাড়া যদি অভিভাবকদের সহযোগিতায় একবার জলযোগের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখা যায়, তবে খুবই ভাল হয়। বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ ব্যাপারে শৃঙখলারক্ষা, বিশুদ্ধতা বিধান, অপচয় নিবারণ প্রভৃতি কাজ খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্বভুক্ত হবে। খাদ্য মন্ত্রীর ঐসব দায়িত্ব প্রতিপালনে সাফাই মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও শ্রেণী মন্ত্রীর সহায়তা লাগবে। তাছাড়া অন্য শিশুর সহযোগিতা তো পাবেই।

৭। **সময় মন্ত্রী।**—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সময়ানুবর্তিতা রক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এজন্য এই কাজের ভারও একজন মন্ত্রীকে দেওয়া ভালো। সে শ্রেণীকে সময়ানুবর্তী করার চেষ্টা করবে। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় সঙ্কেত প্রদান প্রভৃতি কাজ তাকেই করতে হ'বে। সময়ের অপচয় নিবারণ ব্যাপারেও তাকে সচেষ্ট হ'তে হ'বে। যথাসময়ে যাতে শ্রেণীর কাজ সুরু হয় এবং শেষ হয় তারও দায়িত্ব নিতে হবে সময় মন্ত্রীকে।

৮। **উৎসব মন্ত্রী।**—বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎসবের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। উৎসবকে শিক্ষণীয় করার কাজে পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও বিচার—এই তিনটি ব্যাপারেই যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। এই সব কাজ একজন মন্ত্রীর দায়িত্বে করার ব্যবস্থা থাকা খুবই ভালো। উৎসব মন্ত্রী উৎসবের যথেষ্ট পূর্ব হতে প্রস্তুতির ব্যবস্থা করবে, সময়-পত্রিকা রচনার ব্যবস্থা করবে, বিভিন্ন উৎসবাঙ্গের সংযোগ স্থাপন করবে—সেই উদ্যোগী হ'য়ে সাফাই মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী, শ্রেণী মন্ত্রী প্রভৃতির সহায়তা নিয়ে উৎসবকে পূর্ণ রূপ দেবে এবং উৎসবে সৌন্দর্য ও চারু-কলার সংযোগবিধান করবে।

৯। **অতিথি মন্ত্রী।**—অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন শিক্ষার বিশিষ্ট অঙ্গ হবার যোগ্য। একাজের জন্য একজন অতিথি মন্ত্রী নির্বাচন ক'রতে পারা যায়। সে অতিথির যথোচিত সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করবে—তাঁর সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেবে—আবশ্যক হ'লে, তাঁর খাদ্য ও শয়নব্যবস্থা করবে।

এছাড়া সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একজন প্রধান মন্ত্রী থাকা ভালো। এঁর কাজ হবে বিভিন্ন শ্রেণীর যৌথ ব্যাপারগুলি পরিচালনা ও মীমাংসা করা। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেশী হ'লে, আবাসিক বা আধা-আবাসিক হ'লে, সমগ্র বিদ্যালয়ের বা ছাত্রাবাসের জন্য এইরকম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো যায়।

বিচার সভা।—সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটা বিচার সভা থাকার প্রয়োজন। এটিও শিশুদের ভোটেই গঠিত হ'বে। এর গঠন ব্যাপারে শিক্ষক মহাশয়ের যথেষ্ট কুশলতা প্রদর্শন করা চাই। কোনও শিশুর বিসদৃশ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই বিচার সভার সহায়তা গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষক মহাশয় দেখবেন বিচার সভার সভ্যগণ যেন বিশেষ উদ্যোগী হয়।

নাগরিকতার শিক্ষা।—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পৌর শিক্ষার যে ব্যবস্থার কথা বলা হ'ল তা হচ্ছে পৌর শিক্ষাপ্রদানের প্রকৃষ্ট পন্থা। এখানে পৌর শিক্ষা পুঁথিগত হচ্ছে না, বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই হ'চ্ছে। অথচ এর সহায়তায় তারা পৌরনীতির অনেক জ্ঞানই ভালভাবে পেতে পারবে। বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত শিশুসমাজ প্রথম থেকেই সম্পূর্ণভাবে গঠন করতে গেলে তা কৃত্রিম হ'বে। প্রথম শ্রেণীর শিশুরা তো অত ব্যাপার বুঝবেই না। তাদের মন্ত্রিসংখ্যাও কমই হ'বে—শ্রেণীমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, সাফাইমন্ত্রী, উদ্যান ও খাদ্য মন্ত্রী হ'লেই চ'লবে। তারা মৌখিক বিবরণী দেবে—নির্বাচনও সপ্তাহান্তে হ'বে যেন মনে ক'রে কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারে। ক্রমেই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে মন্ত্রিসংখ্যা বাড়বে, মন্ত্রীদের কার্যকালও বাড়বে—তাদের দায়িত্ববোধ বাড়বে—তারা লিখিতভাবে বিবরণী দিতে চেষ্টা ক'রবে—আত্মপ্রকাশের প্রেরণা পাবে। আলোচনা ও প্রয়োজনবোধের মধ্য দিয়েই নাগরিকতার শিক্ষা তাদের জীবনে বদ্ধমূল হ'য়ে যাবে—তারা চিন্তায় ও আচরণে আদর্শ নাগরিক হ'বে।

(গ) আনন্দ উৎসব

বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎসবানুষ্ঠানকে শিক্ষাদানের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। আনন্দোৎসব একদিকে যেমন শিশুকে আনন্দদান করে ও তাকে কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে আবার তেমনি এগুলি শিশুমনে জিজ্ঞাসাবোধ জাগ্রত করে। আনন্দোৎসবের ভেতর দিয়ে শিক্ষায়তনের সঙ্গে পল্লীবাসীর ও শিক্ষক-ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবকদের সংযোগ স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠান-সূচীতে বিভিন্ন রকমের কাজ থাকায় শিশুরা নিজ নিজ রুচি-প্রবৃত্তিসম্মত কাজ নির্বাচনের সুযোগ পায় এবং তাই উৎসবায়োজনের মধ্য দিয়ে শিক্ষকগণও শিশুদের রুচি-প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পারেন। শিশুর বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করলে তাতে ক'রে শিশুচিত্তকে তার ঘনিষ্ঠ পরিবেশ থেকে বৃহত্তর জাগতিক পরিবেশে নিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। ফলে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞান শিশুর কাছে আর সংগৃহীত তথ্যনিচয় মাত্র থাকে না। এগুলো তার কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আবার উৎসবায়োজনের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন শিল্প-কলা ও কৃষ্টির স্বাভাবিক পরিবেশন-সহায়ে পল্লীবাসীর মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার কাজও ভালভাবে হতে পারে। উৎসবানুষ্ঠানগুলি ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় এগুলি যে শিক্ষাদানের সুন্দর স্বাভাবিক মাধ্যম হতে পারে তাতে আর সন্দেহ কি।

শিক্ষকগণ যখন বিদ্যালয়ে আনন্দোৎসবের আয়োজন করবেন তখন উপরের কথাগুলি মনে রাখবেন। তাঁরা আরও মনে রাখবেন যে অনুষ্ঠানসূচী রচনায় ও তার সম্পাদনায় শিশুদের-ই সক্রিয় অংশ দিতে হ'বে। তাঁদের কাজ হ'বে পশ্চাতে থেকে সুকৌশলে শিশুদের পরিচালিত করা। উৎসবগুলি নির্বাচনকালে শিক্ষক শিশুর মানসিক ও বৌদ্ধিক অগ্রগতি ও তার পরিবেশকেও বিবেচনা করবেন। তিনি দেখবেন উৎসবগুলি যেন প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত না হয়। এখানে যে উৎসব-সূচী দেওয়া হ'ল তাতে এমন কতকগুলি উৎসবের নাম-ও রয়েচে যা' অনগ্রসর শিশু ও গ্রামবাসীর মনে কোন উৎসাহ ও প্রশ্নবোধ জাগাতে পারবে না। বিদ্যালয় ও পরিবেশকে তাই এমনি যে-সব অনুষ্ঠান শিক্ষা-ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নত করতে না পারবে সে সবের আয়োজন না করাই উচিত। উদাহরণস্বরূপ সিরাজ ও রামমোহনের জন্মদিনের কথা ধরা যেতে পারে। গ্রামবাসী ও শিশুদের মানসিক অগ্রগতি যথেষ্ট হ'লে তবেই এ উৎসবগুলি সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে।

অনুষ্ঠানসূচী রচনায় উৎসবের উদ্দেশ্য সর্বদা মনে রাখতে হ'বে। অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুতকালে দেখতে হ'বে যেন—

(১) অনুষ্ঠান দ্বারা শিশুদের ও গ্রামবাসীর কৃষ্টিগত নৈতিক ও সামাজিক মান উন্নত হ'তে পারে।

(২) এ যেন শিশুদের কাছে আনন্দদায়ক হয়।

(৩) ব্যয়বাহুল্য না হয়।

(৪) অনুষ্ঠানটির দ্বারা যেন এর উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন উৎসবগুলিতে একঘেয়েমী না আনে। কেননা তা'হ'লে এগুলি শুষ্ক প্রাণহীন প্রথায় মাত্র পর্যবসিত হ'বে। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে তার জন্য সময় দেওয়াও দরকার। তাই সময় থাকতে পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মের অসুবিধা না ক'রেই যতদূর সম্ভব কোন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে। উৎসবের ধরণ অনুযায়ী শিল্প, চিত্র, নানা রকমের সংগ্রহ এবং সঙ্গীত ও অভিনয় দিয়ে অনুষ্ঠানকে শিক্ষণীয় ক'রে তুলতে হ'বে। ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা

যেতে পারে। কিন্তু সব সময়েই ব্যয়বাহুল্য ও বাহ্যাড়ম্বর বর্জন করতে হ'বে। শিল্প ও চিত্র প্রদর্শনী দ্বারা শিশুদের ও গ্রামবাসীদের শিল্প ও চিত্রকুশলতাকে উৎসাহ দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হ'বে।

সঙ্গীত ও অভিনয়ের উদ্দেশ্যও তেমনি কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ হ'বে না। এতে যাতে শিশুরা ও গ্রামবাসিগণ শিক্ষালাভ ক'রে ও কলাকৌশল অর্জন করতে পারে তা দেখতে হ'বে। এগুলিতে যাতে শিশুরা ও গ্রামবাসিগণ-ই প্রধান অংশ নেয় সেদিকে নজর রেখে আয়োজন করতে হ'বে। যদি সম্ভব হয় তবে বিনা বা স্বল্প বেতনে কুশলী অভিজ্ঞের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ আবার দেখতে হ'বে যেন ঐ অভিজ্ঞের কলাকুশলতাই আমাদের একমাত্র বিবেচ্য হ'য়ে না ওঠে। ঐ ব্যক্তির আচরণ কোনও মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে—এটাও দেখা প্রয়োজন। সঙ্গীত ও অভিনয় নির্বাচনকালে শিশুদের ও গ্রামবাসীদের বোধশক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচন করতে হ'বে। চিত্র, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দ পরিবেশনের স্থলে এমন কোন কিছু না থাকে যা' নৈতিক ও কৃষ্টিগত উন্নতির পরিপন্থী। শিল্প-প্রদর্শনী সহায়ে বিদ্যালয়ের ও গ্রামের শিল্পোদ্যমকে উৎসাহ দেওয়া হ'বে—শিক্ষা-মূলক প্রাচীরপত্র প্রস্তুতি থেকে প্রদর্শনী পর্যন্ত নানাভাবে শিক্ষাপ্রদ হ'বে—ব্যায়াম প্রদর্শনী স্বাস্থ্যচর্চার উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং সংগ্রহ প্রদর্শনী প্রকৃতিপাঠ—বিজ্ঞান থেকে সুরু করে প্রত্নতত্ত্ব, ভাস্কর্য অবধি শিক্ষার ক্ষেত্রকে বর্ধিত করবে। এ ক্ষেত্রেও শিশুর ও গ্রামবাসীর গ্রহণক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থ্যকে দৃষ্টিপথে রাখতে হ'বে। ব্যায়াম নির্বাচনকালে শিশুর দৈহিক সামর্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ সর্বদাই মনে রাখতে হ'বে যেন কোন ক্ষেত্রেই এই উৎসবায়োজনের মধ্যে শিশুর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব না আসে। কোনও শিশুর উৎসাহের আধিক্য অন্য কোন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত না করে সে-ও দেখা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত কৃতকার্যতার জন্য যেন পুরস্কার দেওয়া না হয়।

পরিশেষে—কোনও উৎসবানুষ্ঠান যেন জাতিগত বা শ্রেণীগত ঘৃণার উদ্রেক না করে সেদিকে শিক্ষক নজর দেবেন। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভাবধারাপুষ্ট উৎসবের অনুষ্ঠান না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পৌষপার্বণ, শ্রীপঞ্চমী, নবান্ন, চৈত্রসংক্রান্তি প্রভৃতি বাংলার সুপরিচিত উৎসব। বিদ্যালয়ে এগুলিকে শিক্ষণীয়ভাবে করা যেতে পারে। পৌষপার্বণে বিভিন্ন শস্যশীর্ষ সংগ্রহপ্রথাকে প্রকৃতিপাঠের সহায়করূপে ব্যবহার করা যায়। নবান্নের পূর্বে শারের ফুল সংগ্রহ ও নবান্নের দিন তাতে অগ্নিসংযোগ বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় সুপ্রচলিত শিশুকৌতুক। একে গণনা শিক্ষার ও সংখ্যামূলক অঙ্কশিক্ষাদানের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এর সজ্জা-বিন্যাস সাহায্যে শিশুদের শিল্পীর কুশলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে মূর্তিপূজা বর্জন করা উচিত। কেননা এ অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদ্ব্যবহার-বিরোধী। শিশুরা যদি গৃহে বা 'পাড়ায়' কোনও মূর্তিপূজার ব্যবস্থা করে তবে তা'তে তাদের বাধা দেওয়া ঠিক নয়। কেননা নানা রকমের সামাজিক শিক্ষা শিশুরা এর মধ্য দিয়ে পেতে পারে। শিশুরা নিজ হাতে মূর্তি তৈরী করতে পারলেই ভাল হয়। শিশুদের আনন্দকে অব্যাহত রেখেও শিক্ষক দেখবেন শিশুরা যেন কেবল আনন্দের জন্যই উৎসব ও এই মূর্তিপূজা না করে, তারা যেন কিছু শিখতে পারে। চৈত্রসংক্রান্তি প্রভৃতি কয়েকটি উৎসবে এমন অনেক প্রথা আছে যা নিষ্ঠুরতাব্যঞ্জক ও কৃষ্টিবিরোধী। শিশুরা যাতে এ সকল প্রথানু-শীলনে প্রবৃত্ত না হয় শিক্ষক শিশুদের মধ্যে সেরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষককে বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে হবে যেন শিশুর বা অভিভাবকগণের মনে বিরোধী প্রতিক্রিয়া না আসে। পূর্বোক্ত ঋতুউৎসবগুলি ছাড়া বৃক্ষরোপণ বা বর্ষোৎসব, নব বর্ষোৎসব, উত্তরায়ণ উৎসব প্রভৃতি করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানসূচী এমনভাবে রচনা করতে হ'বে যাতে শিশুরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সুপরিচিত হ'তে পারে ও তাদের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুশীলন-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

"বোশেখে মাসে বৃক্ষে জলদান", জলসত্র প্রদান প্রভৃতি প্রথাকে সার্থক ও শিক্ষণীয়ভাবে ব্যবহার করা যায়।

পৌষ উল্লাস প্রভৃতি প্রচলিত সামুহিক রন্ধন ও ভোজন উৎসবকেও শিক্ষাপ্রদভাবে করা যেতে পারে। অন্যান্য উৎসবেও রন্ধন ও একত্র ভোজনের আয়োজন করা যায়। আবাসিক নয় এমন বিদ্যালয়ে এরূপভাবেই শিশুদের খাদ্যবিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে। এই রন্ধন ও ভোজন ব্যাপারে বিলাসিতা ও খাদ্যসামগ্রীর অপব্যবহার না হয়, শিশুরা অমিতভোজন না করে, শিক্ষক সেদিকেও নজর রাখবেন। সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিভেদ প্রথাও এতে বর্জন করতে হ'বে।

পশ্চিমবঙ্গের বালিকাদের মধ্যে গোকল নামে একটি ব্রতানুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে গৃহপালিত পশুর প্রতি শিশুদের মমত্ববোধ জাগাতে পারা যায় এবং এ সমস্ত পশু সম্বন্ধে তাদেক জ্ঞানদান করাও সহজ হয়।

রাষ্ট্রীয় উৎসবানুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমরা শিশুদের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে পারি। শিশুদের ও গ্রামবাসিগণের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শিক্ষার জন্য এগুলির একান্ত প্রয়োজন। পতাকা অভিবাদন, সমবেত সুতোকাটা, সমবেত সাফাই, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর উৎসবানুষ্ঠানে হ'তে পারে।

মহাপুরুষ ও কৃতি ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন দ্বারা শিশুদের চেতনা ও জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগ্রত করা যায়। বুদ্ধ, মোহম্মদ, যীশুখৃষ্ট, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণের স্মরণানুষ্ঠান দ্বারা শিশুমনে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আনতেও পারা যায়। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক শিক্ষারত একটি স্বাভাবিক পটভূমিকা রচনা করা সম্ভব হ'তে পারে। বিভিন্ন ধর্মগুরুর স্মরণানুষ্ঠানে ধর্মীয় কৃষ্টি অনুযায়ী অনুষ্ঠানসজ্জা ক'রে ও ঐ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী সদ্‌ব্যক্তিগণের সঙ্গে শিশুদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে ধর্মবিষয়ে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার করা যায়। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, প্রফুল্লচন্দ্র, প্রভৃতি রাষ্ট্র ও সমাজসেবক মহদ্‌-ব্যক্তিগণের স্মরণানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও অনুরূপভাবে শিশুকে জ্ঞান ও আদর্শনিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ দিতে হ'বে। এই সব অনুষ্ঠানে মহাপুরুষদের শিশুবোধ্য সরল এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের কর্মপরিচয়সম্বলিত চিত্র, আলেখ্য প্রভৃতিকে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উঁহাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতা, সঙ্গীত বা অভিনয় অনুষ্ঠানকে অনেকখানি সাফল্যযুক্ত করতে পারে। এই উপলক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুরা তাদের রচনা পড়তে ও আবৃত্তি করতে পারে। চিত্র ও আলেখ্যও শিশুরাই করবে। অনুকরণশীল শিশুরা এ থেকে অঙ্কন করবার ও লিখবার আকাঙ্ক্ষা অর্জন করবে। শিশুদের বয়স, তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধি-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে অতি পরিচিত মহদ্‌ব্যক্তিগণের স্মরণানুষ্ঠান থেকে সুরু ক'রে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত-গণের জন্ম ও মৃত্যুতিথি পালনের ব্যবস্থা করতে হ'বে। এই সব অনুষ্ঠানে যে সকল প্রদর্শনী, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করা হ'বে সেগুলি যেন এমন হয় যাতে উচ্চতর শ্রেণীর শিশুরা এই সব মহাপুরুষদের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়।

উৎসবে যে অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি থাকবে সেগুলো এমন হওয়া উচিত যাতে এগুলি কোনও মানবগোষ্ঠীর প্রতি শিশুকে বীতশ্রদ্ধ না করে। কৌতুক-অভিনয় সম্বন্ধে একথা ভালভাবে মনে রাখা উচিত। কেননা সাধারণতঃ কৌতুকসৃষ্টির জন্য কোনও অঞ্চলের অধিবাসীর বা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণকে বিকৃত ক'রে দেখান হয়। এতে শিশু-মনে সংশ্লিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর প্রতি অশ্রদ্ধা আসতে পারে। তাই এদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানীয় উৎসব উপলক্ষ্যে যে মেলা হয়ে থাকে শিশুরা যাতে সেখানে সুশৃঙ্খলভাবে যায় শিক্ষক সেদিকে দেখবেন। শিশুরা এই সমস্ত মেলায় কিছু কিছু জনসেবার কাজও করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি উৎসবের নাম ও তাদের উদ্‌যাপন দিনের তারিখ দেওয়া হ'ল। বলা বাহুল্য, যে সকল বিদ্যালয়ে এই সব কয়টি উৎসবই যে অনুষ্ঠিত হবে এমন কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষক এগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টির অনুষ্ঠান করা চলে তা ঠিক করবেন—

(১) নববর্ষ [illegible] বৈশাখ।
(২) মোহম্মদ জয়ন্তী—
(৩) রবীন্দ্র জয়ন্তী—
(৪) বুদ্ধ পূর্ণিমা—বৈশাখী পূর্ণিমা।
(৫) বর্ষামঙ্গল—আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ (বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ)।
(৬) রাখীবন্ধন উৎসব—ভাদ্র পূর্ণিমা।
(৭) স্বাধীনতা দিবস—১৫ই আগষ্ট।
(৮) জন্মাষ্টমী—ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী।
(৯) গান্ধী জয়ন্তী—২রা অক্টোবর।
(১০) নবান্ন উৎসব—অগ্রহায়ণ মাস।
(১১) নেতাজী জন্মতিথি—২৩শে জানুয়ারী।
(১২) গণতন্ত্র দিবস—২৬শে জানুয়ারী।
(১৩) মহাত্মাজীর তিরোধান দিবস—৩০শে জানুয়ারী (সর্বোদয় দিবস)।
(১৪) বিবেক পুণ্য দিবস—মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমী।
(১৫) শ্রীপঞ্চমী—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী।
(১৬) কস্তুরবা স্মৃতি দিবস—২২শে ফেব্রুয়ারী।
(১৭) জাতীয় সপ্তাহ—৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের বৌদ্ধিক মান যদি উন্নত হয় তবে নিচের উৎসবগুলি সমগ্র বিদ্যালয়কে নিয়ে বা শ্রেণীগতভাবে পালন করা যেতে পারে। এতে ক'রে শিশুমনকে বৃহত্তর আদর্শ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নিয়ে যাওয়া যাবে—

(১) রামমোহন জন্মদিন—১০ই মে।
(২) সিরাজ জন্মদিন—৩রা জুলাই।
(৩) দেশবন্ধু ও আচার্য রায় স্মৃতি দিন—১৬ই জুন।
(৪) মাইকেল স্মৃতি সিবস—২৯শে জুন।
(৫) তিলক স্মৃতি দিবস—১লা আগষ্ট।
(৬) মহাবীর দিবস—১১ই এপ্রিল।
(৭) রামকৃষ্ণ জয়ন্তী—১৩ই মাঘ।
(৮) চৈতন্য জয়ন্তী—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
(৯) গুরুগোবিন্দ জন্মদিন—২৬শে ডিসেম্বর।
(১০) বিদ্যাসাগর স্মৃতি দিবস—১০ই শ্রাবণ।
(১১) শ্রীঅরবিন্দ জন্মদিন—১৫ই আগষ্ট।
(১২) বঙ্কিম স্মৃতি দিবস—২৬শে চৈত্র।
(১৩) ঈদ্—(পরিবর্তনশীল)।
(১৪) গুড্ ফ্রাইডে—পুণ্য শুক্রবার।
(১৫) শিবাজী উৎসব—ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী।

অন্যান্য উৎসবের তারিখ—

(১) ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া (রাখীবন্ধন)—কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া।
(২) দীপালি উৎসব—কার্তিকী অমাবস্যা।
(৩) চৈত্র সংক্রান্তি—বৎসরের শেষ দিন।

চতুর্থ অধ্যায়

সৃজনাত্মক কর্ম

বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিকে কর্মকেন্দ্রিক ক'রে গড়ে তুলতে হলে প্রথম শ্রেণী থেকেই শিশুদের বহুবিধ বিচিত্র কাজ করবার অবকাশ ও সুযোগ দিতে হবে। কোন শিশু ঠিক কি কাজ করবে তার কোনও নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভবপর নয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূলনীতিগুলি স্মরণ রেখে এবং বিশেষ বয়সের শিশুদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন ও সামর্থ্য বুঝে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুসারে শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন কর্মের ব্যবস্থা করবেন। একটি শ্রেণীর সমস্ত কয়টি শিশুকে যে একই কাজ করতে হবে তার কোন অর্থ নেই। একই সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যেও প্রত্যেকটি শিশুকে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পছন্দ অনুসারে স্বাধীনভাবে সৃজনাত্মক কার্য করতে দিলে ক্রমে তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে।

এস্থানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে সৃজনাত্মক কর্ম বললেই যে অর্থোৎপাদক শিল্প বুঝায় এমন নাও হতে পারে। বরঞ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম দুইটি শ্রেণীর শিশুদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তাদের পক্ষে যে সকল কর্ম স্বাভাবিক এবং যে সকল কর্মের মধ্য দিয়ে তারা শিখতে ভালবাসে এবং ভাল শেখে, সে সকল কর্ম শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সৃজনাত্মক এবং গভীর অর্থপূর্ণ হলেও সমাজ বা জাতির অর্থোৎপাদনের কার্যে সহায়ক না হওয়াই সম্ভব। শিশুদের কার্যকলাপের মধ্যে একটি সহজাত সৃষ্টির প্রেরণা এবং আনন্দ আছে। সকল সময়ে আমরা তা লক্ষ্য করি না, বুঝি না, এবং তাকে যথার্থ মূল্য দিই না। কারণ, আমাদের বয়স্কদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে আমরা শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার সৃষ্টির সার্থকতা বিচার করতে পারি না। ছয় বৎসর বয়সের শিশু যে চিত্রটি আঁকে অথবা যে মাটির পুতুলটি গড়ে, তাই দিয়ে বয়স্ক মানুষের কোন উদ্দেশ্য সাধিত না হতে পারে, এবং তার বাজারদর অর্ধ কপর্দকও না হতে পারে। কিন্তু, শিশুর নিজের কাছে তার স্বহস্তের শিল্প অমূল্য। কেবলমাত্র শিশুর আনন্দলাভের দিক দিয়ে বিচার করলেও সৃজনাত্মক কর্মের কোনও তুলনা হয় না।

কিন্তু প্রধান কথা তাই নয়। সৃজনাত্মক কর্মের মধ্য দিয়ে ক্রমে শিশুর পর্যবেক্ষণশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ হয়; তারা স্বাধীনভাবে এবং অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করতে শেখে; তাদের একাগ্রতা ও দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়; এবং কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে কাজ না ক'রে তারা কাজের মধ্য দিয়ে শিল্পী ও দ্রষ্টার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পারে।

শিক্ষক মহাশয়কে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিল্পকর্ম এবং সৃজনাত্মক স্বাধীন কর্ম এক নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শেখবার ব্যবস্থা থাকবে। শিল্পের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া যাবে। উপরন্তু, প্রত্যহ শিশুদের এমন কিছুক্ষণ সময় দিতে হবে, যে সময়ে তারা স্বাধীনভাবে কোনও সৃজনাত্মক কাজ করবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের শিল্পকার্যকেও কতকটা সৃজনাত্মক কর্মের মধ্যে দেখতে হবে। তার মূল্য বিচার করতে হলে দেখতে হবে শিশুর জীবনে সেই শিল্পের দ্বারা কি উদ্দেশ্য কতখানি সাধিত হল। শিশুকাল থেকে সমস্ত কর্মের মূল্য টাকা, আনা, পয়সায় বাজার দর কষে বিচার করলে, শিক্ষকের ও শিশুদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী অতিমাত্রায় সঙ্কীর্ণ হবার এবং দোকানদারী মনোবৃত্তিই প্রাধান্য পাবার আসক্তি থেকে যায়। ছোট শিশুদের সৃজনাত্মক কর্মের মধ্যে খেলার স্থান অতি উচ্চে। তাদের জীবনে কাজই খেলা এবং খেলাই কাজ। শিশুরা খেলতে ভালবাসে বলেই যে কেবল তাদের খেলতে দিতে হবে তা নয়। খেলার মধ্য দিয়ে তাদের দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার উন্নতি

হবে। সঙ্ঘবদ্ধ খেলার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক চেতনা জাগ্রত হবে। সৃজনাত্মক খেলার মধ্য দিয়ে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ হবে, তাদের আবেগ ও অনুভূতির তৃপ্তিসাধন হবে। শিশুদের খেলার সময়কে যাঁরা সময়ের অপব্যয় বলে মনে করেন তাঁরা শিশুস্বভাবকে সম্যকভাবে বোঝেন নি। উপযুক্ত খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়। আবার খেলার মধ্য দিয়েই শিশু স্বাভাবিকভাবে শিল্পকার্য শিখবার জন্য প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুতির পূর্বেই তাকে শিল্পকার্য শিখতে বাধ্য করলে তার স্বভাবের উপর অত্যাচার করা হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বহুবিধ সৃজনাত্মক খেলার ব্যবস্থা করবার কথায় শিক্ষক মহাশয় যেন মনে না করেন যে, নূতন ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি বহুব্যয়সাধ্য। খেলনার মূল্যের উপরে খেলার মূল্য নির্ভর করে না। বরঞ্চ মূল্যবান তৈরী খেলনার চাইতে শিশুদের সৃজনীশক্তিকে জাগিয়ে তোলে বহুবিধ খেলনা তৈরীর উপকরণ, যথা বালি, মাটি, আঠা, কাগজ, কাঁচি, কাঠি, কাঠ, পেরেক, হাতুড়ি, কাপড়, ছুঁচ, সুতো, রং ও তুলি। খালি শিশি, বোতল, বাক্স, টিন, কৌটা, দেশলাই বা সিগারেটের প্যাকেট এবং কার্ডবোর্ড পেলে শিশুরা মহা আনন্দে নানা জিনিষ তৈরী ক'রে খেলা করে এবং ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের কাজের মধ্যেও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়ে তাদের উপযুক্ত কোন শিল্পকাজ দিলে তারা শিখতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অনেক সৃজনাত্মক কর্ম শিশুরা সংঘবদ্ধভাবে করতে পারে। ছয়, সাত বৎসরের শিশু অপেক্ষা আট, নয়, দশ বৎসরের শিশুদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে কাজ করবার ক্ষমতা ও উৎসাহ বেশী দেখা যায়। এই সকল project যেন শিক্ষক মহাশয় অনিচ্ছুক বা নিরুৎসাহ ছাত্রদের স্কন্দে চাপিয়ে না দেন। পরবর্তী তালিকায় উদাহরণস্বরূপ কতকগুলো সৃজনাত্মক কার্য ও project এর কথা বলা হল। শিশুদের নিজেদের উৎসাহ এবং ঔৎসুক্য অনুসারেই তারা কাজ করবে। তাদের সাহায্যকারী এবং বন্ধু হিসাবে শিক্ষক মহাশয় সকল সময়েই উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজন হলে তাদের কার্যকলাপে তিনি সহায়তা করবেন এবং শিশুদের কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টির মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহার সাহায্য নিয়ে তাদের নূতন বিষয়ে শিক্ষা দেবেন এবং বিভিন্ন শিল্পশিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করবেন। উপযুক্ত একটি project এর মধ্য দিয়ে একাধারে মাতৃভাষা, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল ইত্যাদি বহু শিক্ষা অগ্রসর হতে পারে এবং কাঠের কাজ, মাটির কাজ, কাগজ ও কার্ড-বোর্ডের কাজ, সূচিশিল্প প্রভৃতি শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। এই সকল শিক্ষা শিশুদের স্বাধীন ও স্বাভাবিক আগ্রহকে কেন্দ্র করে বলে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং পাঠ্যবিষয় ও শিল্পকার্যের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। উচ্চতর শ্রেণীতে অথবা পরবর্তী জীবনে যখন তারা এর মধ্যে যে কোনও একটি পাঠ্যবিষয় বা হস্তশিল্পের চর্চা করে, তখন তার শিক্ষা এত দ্রুত অগ্রসর হয় যা অন্যথা সম্ভবপর হত না।

(ক) চিত্রকলা

পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাতে শিল্পশিক্ষা বিশিষ্ট স্থান না পেলেও, আমাদের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় তা অপরিহার্য বলে গণ্য হয়েছে। পাশ্চাত্যদেশে এর প্রচলন অনেক দিন আগে থেকে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। সেখানে তার ফল যা পাওয়া গেছে তা ভবিষ্যতের শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই আশাপ্রদ। পূর্ববর্তী শিক্ষার ভেতর যে নীরসতা ছিল যা শিশুমনকে কিছুতেই আকৃষ্ট করতে পারত না, শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষায় তা' অনেক আকর্ষণীয় ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। এতে যেমনি শিশুর মনের বিকাশ হয়, তেমনি সে মনের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পায়। সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে শিশুর প্রকাশভঙ্গীর ভেতর দিয়ে শিশুকে জানবার এ এক বড় সুযোগ, কেননা সেখানে তার মানসিক বিকাশের সবচেয়ে বেশী পরিচয় পাওয়া যায়।

শিশুর কাছে কর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার খুব বেশী মূল্য নেই। সে জ্ঞান সঞ্চয় করে প্রধানতঃ কাজ করার জন্য। শিল্প হচ্ছে এক রকম সৃজনাত্মক কাজ। এই সৃজনাত্মক কাজের ভেতর দিয়ে সে যেমন তার নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে তেমনি নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে।

শিশুরা স্বভাবতঃই ভাব ও আবেগপ্রবণ। সৃজনাত্মক কাজ, বিশেষ ক'রে ছবি আঁকার ভেতর দিয়েই তারা ভাব ও আবেগকে ভাষা দেয়। এ সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত। সুতরাং এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা যেন এতে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি না করি। এই বাধা-বিঘ্ন থেকে আমরা তাদের বাঁচাতে পারি অযথা অযাচিত নির্দেশ না দিয়ে। কেননা তাদের মন তখনও আমাদের মত তৈরী নয়। আমাদের মত ধারণাশক্তি বাড়েনি, সুতরাং আমাদের নির্দেশ তারা বুঝতে পারবে না। ফলে তাদের নিজেদের কাজে আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিশুরা আবেগপ্রবণ তাই তাদের আঁকার ভেতরেও তারা কেবলমাত্র প্রকৃতির অনুকরণ করে না—তাদের অনুভূতিকে তারা তাদের ছবিতে প্রাধান্য দেয়। যেমন ধরা যাক "মানুষ"। শিশুরা সর্বদাই মানুষের মাথাটা সবচেয়ে বড় আঁকে শরীরের তুলনায়। কেননা তাদের কাছে মাথার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। তাদের যুক্তি অনুসারে মানুষ সবচেয়ে দরকারী কাজগুলি ত মাথাটা দিয়ে করে। সে চোখ দিয়ে দেখে, মুখ দিয়ে খায়, কথা বলে ও কান দিয়েই ত শোনে। শিশু এখানে মানুষ আঁকার সময় নিজকে কল্পনা করে। তাই তার বড় মাথাযুক্ত মানুষ দেখে কেউ যদি বলেন যে না ঠিক হয়নি, তবে তিনি শিশুর মন বোঝেননি; শিশুকে তাঁর নিজের মনের মতন কাজ করার জন্য জোর করছেন। এটা মনে রাখতে হবে যে শিশু ছবি আঁকবে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। তার নিজের অভিজ্ঞতাই তাকে ভবিষ্যতে বাস্তবের দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং শিশুকে ছেড়ে দিতে হবে তার নিজের মত কাজ করতে। বিনা স্বাধীনতায় কোন সৃজনাত্মক কাজ হ'তে পারে না। তবে কি শিক্ষকের কিছু করবার নেই? তিনি কি কেবল দর্শকমাত্র? তা মোটেই নয়। তিনি হ'বেন শিশুর অনুপ্রেরণা ও তার সবচেয়ে বড় সহায়ক। তাঁকে কাছে পেয়ে শিশু সাহসে ভর দিয়ে সব ক'রে যাবে। তিনি দেখবেন শিশুর কাজে যেন কোনও জিনিষের অভাব না হয়। তিনি দেখবেন কি কি জিনিষ পেলে শিশু আরও ভাল ক'রে নিজের মনের মত ক'রে সৃষ্টি করতে পারে, কেমন ক'রে জিনিষ ঠিকমত ব্যবহার করতে হয়, কিসে জিনিষের অপচয় কম হয় ইত্যাদি। তিনি হয়ত দেখলেন যে উজ্জ্বল রঙ পেলে শিশু বেশী আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে পারে। অথবা দেখলেন বড় ক'রে আঁকবার সুযোগ দিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায় ও চোখের পক্ষে তা কম ক্ষতিকর; কিরকম পাত্রে রঙ গুলতে গেলে রঙ পড়ে নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম, তারপর তুলি কিভাবে ধরতে হ'বে, ইত্যাদি।

উৎসাহ পাওয়া শিশুদের পক্ষে বিশেষ দরকার। শিল্পের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে সমস্ত জিনিষটা হ'বে পরোক্ষভাবে। কেননা যদি তারা তাদের কাজ সচেতন অবস্থায় ক'রে, অথবা তাদের কাজ করবার সময় যদি সজাগ করিয়ে দেওয়া হয় তা হ'লে তাদের সৃষ্টির মধ্যে তাদের অন্তর্নিহিত আবেগ কখনও প্রকাশ পায় না, খানিকটা কৃত্রিম হ'য়ে যায় অথবা সৃজনাত্মক প্রেরণা তখনকার মত চলে যায়। যেমন দেখা গেছে শিশু আপন মনে

কাজ ক'রে চলেছে। কেউ হয়ত বলল, "বাঃ! কি সুন্দর ছবি হচ্ছে"। তিনি প্রশংসা ক'রে হয়ত উৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শিশু যেই সজাগ ও সচকিত হ'য়ে গেল তাতে তার প্রকাশের বিঘ্ন হ'ল। প্রশংসা করা ভাল, কিন্তু সে যখন নিবিষ্টচিত্তে কাজ করছে তখন নয়, পরে করা ভাল। বাস্তবিক কেবল শিশুর ক্ষেত্রে কেন, বড়দের বেলাতেও একথা খাটে। তাঁতিরা যখন অভ্যাসমত মাকু চালায় তখন যদি তারা অবহিত হয়ে কাজ করতে যায়, তাদের মাকু আর তেমনভাবে চলে না। সুতরাং বুঝে সুঝে শিশুকে উৎসাহিত করতে হ'বে। মনে রাখতে হ'বে যে কোন শিশু যদি সৃজনাত্মক কাজে উৎসাহ না দেখায় তা হ'লে নিশ্চয় তা তার অপ্রিয় পরিবেশের জন্য। কারণ স্বাভাবিক শিশু মাত্রই সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে গভীর আনন্দ পায়।

পূর্ব কথায় ফিরে আসা যাক। কিভাবে শিশুকে অনুপ্রাণিত করতে হ'বে তার কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না। প্রথমেই দেখতে হ'বে সেই পরিবেশ শিশুর স্বাধীন আত্মপ্রকাশের উপযোগী কিনা। বলা বাহুল্য এটি বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর এবং খানিকটা নির্ভর করবে সাজসজ্জা ও জিনিষপত্র, যা দিয়ে তারা কাজ করবে তার উপর। কাজ করার জিনিষপত্র যদি চিত্তাকর্ষক হয়, তা হ'লে তারা অনেক বেশী উৎসাহ দেখায়। বাস্তবিক জিনিষপত্র কাজের উপযোগী যদি না হয় তা হ'লে প্রাণ ঢেলে কাজ করা যায় কি করে? তবে এর কোন মানে নেই যে জিনিষপত্র বহু-মূল্য হ'তে হ'বে। কম দামেও উৎকৃষ্ট জিনিষ হ'তে পারে শিক্ষক যদি নিজে কষ্ট ক'রে তৈরী করে দেন। যেমন তুলির কথা ধরা যাক। শন্, পাট অথবা ছাগলের বা যে কোনও জন্তুর লোম অথবা খেজুরগাছের ডাল দিয়েই বেশ ভাল তুলি হ'তে পারে। সবিশেষ কৌশল প্রণালী পরে উপাদান সম্বন্ধে বলবার সময়ে ব্যাখ্যা হ'বে। গুঁড়ো সস্তা রঙ কিনে নিয়ে রঙ তৈরী করা যেতে পারে। শিশুদের কল্পনাশক্তি যাতে আরও বৃদ্ধি পায় তার জন্য ভাল জিনিষ দেখা, ভাল ভাল গল্প ও রূপকথা ও বর্ণনা খুবই দরকারী।

শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালের ছবি যতদূর সম্ভব তাদেরই আঁকা হওয়া উচিত। তাতে তাদের উৎসাহ বাড়বে আর তারা বুঝবে যে তাদের কাজের একটা সামাজিক মূল্য আছে।

অনুবন্ধপ্রণালীতে আঁকার মাধ্যমে অন্যান্য অনেক বিষয় শেখানো যায় ও তা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়; যেমন প্রকৃতিপাঠ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। যদি সে প্রকৃতি ও জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ ক'রে তা আঁকতে চায় তবে সে জিনিষটির সম্বন্ধে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভাল হ'বে ও তার সম্বন্ধে আগ্রহও বেশী হ'বে। তারপর বেশী বয়সে ৯ থেকে ১২ বয়সের ছেলেমেয়েদের ইতিহাসের ছবি আঁকিয়ে তার ভেতর দিয়ে অনেক শিক্ষা দেওয়া যায়; ভূগোলও তাই। তবে ৯ বৎসরের আগে বোধ হয় এই ধরণের ছবি আঁকা শিশুদের উপযোগী হ'বে না।

শিল্প বা চিত্রকলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানবার বিষয়গুলি বিবৃত করা হ'ল; এখন শিশুর বিভিন্ন বয়সের পর্যায়ে কি ক'রে শিল্প বা চিত্রকলা শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদানে অগ্রসর হ'বেন তার মোটামুটি খসড়া নিম্নে দেওয়া হল। যে শিক্ষাপ্রণালী নিচে বিবৃত করা হ'বে তাকে একান্ত ব'লে ধ'রে নিলে শিক্ষক ভুল করবেন। মনে রাখতে হ'বে যে শিশুর আগ্রহই মুখ্য। তার আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষককে তাঁর শিক্ষার ধারা নির্ধারণ করতে হ'বে।

(৬-৮) বৎসরের শিশুদের আঁকার বৈশিষ্ট্য

এই বয়সের অনেক আগেই যদিও হিজিবিজি আঁকার সময় বিগত হয়েছে তবুও তারা এই বয়সেও বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্যভাবে এগোয়নি। তখনও তাদের মন এবং প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ স্ব-কেন্দ্রিক। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের আঁকা ছবির বিষয়বস্তু আমরা চিনতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ধরে নেওয়া হ'চ্ছে একটি মানুষ। শিশু একটি গোল রেখা এঁকে মানুষের মাথা বুঝিয়েছে। দুটো বিন্দু দিয়ে চোখ বুঝিয়েছে। আঙুলগুলি করেছে কয়েকটি সরল রেখার সমষ্টি। মানুষের দেহ নেই বললেই হয়। একটি সরলরেখা মাত্র। এই যে প্রকাশভঙ্গীর ধারা তাকে

"Schema" বলা হয়। এই "Schema" হচ্ছে শিশুর বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার বিকাশ। এই "Schema" দিয়েই সে মানুষ আঁকার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে। সুতরাং যখন একটি শিশু বারে বারে একরকম অঙ্কণ করে তখন জানতে হবে যে তার নিজের অভিজ্ঞতায় নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর উপর তার আস্থা এসেছে। আবার যখন সে তা পরিবর্তন ক'রে অন্য নূতন রকম "Schema" আয়ত্ত করে তখন বুঝতে হ'বে যে সে আর পুরাতন "Schema" দিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না ; কারণ তার নূতন অভিজ্ঞতার দরুণ নূতন প্রকাশভঙ্গীর ও নূতন "Schema" র প্রয়োজন উপলব্ধি করছে। তার অভিজ্ঞতা যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার "Schema" ও পরিবর্তনশীল ; তবে অঙ্কনে বিষয়বস্তু তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনশীল, ৫ বৎসর থেকে আরম্ভ করে যে কোন বয়স পর্যন্ত ছবি আঁকার বিষয় বস্তু খুব বেশী বদলাবে না। সেই মানুষ বা গাছ অথবা বাড়ী যা তাদের পরিবেশে রয়েছে সবই প্রায় ঠিক একই থাকবে তবে প্রকাশভঙ্গী তাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হ'বে। কেননা পূর্বেই বলেছি শিশুরা আঁকে যা দেখছে তা নয়, যা সে অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভ করেছে তাই।

অভিজ্ঞতা লাভ যে সব সময়ে বহির্জগৎ থেকেই হয় তা নয়। নিজের দৈহিক (Kinaesthetic, haptic or somatic) অভিজ্ঞতাও হ'তে পারে। এই কারণেই দেখা যায় ৪ থেকে ৬।৭ বৎসর পর্যন্ত শিশুর ছান্দিক রেখার প্রতি ঔৎসুক্য ও আগ্রহ থাকে। এই সময় ছন্দ-রেখার (Rhythmic pattern) সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি অক্ষর লেখা শেখান যায়। যেমন ধরা যাক "ব" "ত" অথবা "ড" ইত্যাদি কয়েকটা বিশেষ অক্ষর ও তাদের আকৃতি যা সামান্য অদল-বদল ক'রে অন্য অক্ষর তৈরী করা যেতে পারে। এই অক্ষরগুলি শিশুরা সমস্ত কাগজটিতে আঁকবে। একই অক্ষর বারে বারে এঁকে যাবে। তারপর দুই অক্ষরের মাঝের স্থানগুলি রঙ দিয়ে ভরে দিতে হ'বে। বলা বাহুল্য এরকম "প্যাটার্ণ" আঁকতে অন্য কিছুর সাহায্য না নিয়ে খালি হাতেই আঁকতে হ'বে।

এখানে একটি বিশেষ কথা মনে রাখতে হ'বেঃ এইরূপ "প্যাটার্ণ" আঁকার উদ্দেশ্যের মধ্যে আকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধিই হ'বে মুখ্য আর অক্ষর হ'বে সেখানে গৌণ। কিন্তু গৌণ হ'লেও অক্ষরের ছবির মধ্য দিয়ে এমন একটা ছাপ রেখে যাবে যে শিশু অক্ষর হিসাবেও তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেবে।

রঙ সম্বন্ধে নূতন করে বলবার কিছুই নেই। শিশুরা যখন তুলি দিয়ে কিংবা "ক্রেয়ন" দিয়ে রঙ লাগায় তখন তারা নিজেদের কল্পনাতে যে রঙ পছন্দ করে সেই রঙ ব্যবহার ক'রে। যদিও এ রঙের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল থাকে না। উজ্জ্বল রঙ তারা পছন্দ করে। এ বয়সে তারা রঙ মেশানোর "কৌশল" ভাল করে জানে না ও অমিশ্রিত রঙই বেশী পছন্দ করে। কারণ অমিশ্রিত রঙের ঔজ্জ্বল্য তাদের কাছে অনেক বেশী নয়নমুগ্ধকর। সাধারণত শিশুরা লাল রঙ পছন্দ করে ও বেশী ব্যবহার করতে চায়। অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে রঙের পছন্দের ভেতর দিয়ে কার কি প্রকৃতি তা জানা যায়। কিন্তু এরকম প্রকৃতি নির্ধারণ বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেননা বিভিন্ন রঙ পাশাপাশি সংস্থাপন করলে শিশু-মনে রঙ সম্বন্ধে ধারণাবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একটি শিশু একটি ছবিতে রঙ দেবে। ছবিকে রঙ করতে হয়ত লালের পাশে হলুদ দিল। হলুদের সঙ্গে হয়ত লাল বেশ দেখাচ্ছে, কিন্তু নীলের সঙ্গে লাল মানায় না। সুতরাং এসব রঙকে বিচার করতে গেলে তার পার্শ্বস্থ রঙটিকে দেখতে হ'বে যে তার সঙ্গে মানাচ্ছে কিনা। শিশুর এরূপ রঙ দেওয়ার মধ্য থেকে শিশু-মনে রঙবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুদের ছবিতে তাদের অবস্থানের ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো না ; কেননা এটা অত্যন্ত নীরস হ'বে। তবে এটুকু জানলেই হ'বে যে তাদের কাছে ছবিতে দূর ও নিকট ব'লে কিছু নেই। যেটা তাদের কাছে আকর্ষণীয় হয় সেটাকেই তারা বড় ক'রে আঁকে ও প্রাধান্য দেয়। ধরা যাক একটি ছবিতে দূরে একটি গাছে ফুল ফুটছে অথবা দূরে একটা আকর্ষণীয় জিনিষ আছে। এরকম ছবি যদি শিশু আঁকে তবে সে ফুলটিকে অপেক্ষাকৃত বড় করে আঁকবে ও তার ছবিতে ফুলকে প্রাধান্য দেবে।

শিক্ষা-প্রণালী

৬বৎসরের শিশুদের শিক্ষা-প্রণালী কি হ'বে তা পূর্বের ভূমিকা হ'তে অনেকটা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সৃজনাত্মক কার্যের জন্য পরিবেশই মুখ্য। শিশুকে এ অবস্থায় বেশী কিছু বলতে হয় না। আপনা আপনি সে কাজ ক'রে যায়। আঁকার সরঞ্জামগুলি সর্বদাই তার হাতের কাছে থাকা চাই। সরঞ্জামগুলিকে সর্বদাই এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রেখে দিতে হ'বে যে শিশু তা দেখলেই কাজ করতে ইচ্ছুক হ'বে। বর্ণনার উপর নির্ভর করে শিশুর আঁকার ইচ্ছা হয় না। সুতরাং বর্ণনা ক'রে তাদের কল্পনাশক্তিকে বাড়ান যেতে পারে; কিন্তু তা থেকে খুব বেশী ফল আশা করা যাবে না। শিশু মাঝে মাঝে হয়ত শিক্ষকের সাহায্য চাইতে পারে; কিন্তু শিশুকে নিজের ধারণা অনুযায়ী আঁক্‌তে দিতে হ'বে। অনেক শিশু ছবি আঁক্‌তে তার নিজের মতকে আমল দিতে চায় না ও নিজে চিন্তা করতে চায় না এবং সহজপন্থা হিসাবে শিক্ষকের কাছ থেকে ইঙ্গিত নিয়ে কোনরকমে কাজটা সমাধা করতে চায়। শিক্ষকের সেই দিকে বিশেষ নজর রাখতে হ'বে। অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে, "মাষ্টার মশাই; বাড়ী কেমন দেখ্‌তে হয়"? অথবা "বাড়ীর ছবি কিভাবে আঁকে"? তখন শিক্ষকের উচিত তাকে বলা, "তুমি কি রকম বাড়ী দেখেছ" অথবা "ওই বাড়ীটা দেখ কি রঙের ও কি রকম দেখ্‌তে"। চেষ্টা করতে হবে যে সে যেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আঁকে, নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। শিক্ষক তার হাবভাবের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন—"এইত আমি রয়েছি তোমাদের সাহায্য করার জন্য। কিন্তু তার আগে তোমরা একবার নিজে চেষ্টা ক'রে দেখ"—যাতে সেও চেষ্টা করলে পারে।

৭ বৎসরের শিশুরা যদি কখনও গল্প থেকে আঁকতে চায় তাহ'লে সে বিষয়ে শিক্ষক তাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করবেন। যে অবস্থায় সাহায্য করলে শিশু আরও এগিয়ে যেতে পারবে সেই অবস্থায় শিক্ষক শিশুকে অতি অবশ্য ইঙ্গিত দিয়ে সাহায্য করবেন।

সরঞ্জাম

ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকার জন্য কি সরঞ্জাম উপযুক্ত তা ভাল ক'রে স্থির করতে হ'বে। সরঞ্জাম এমন হ'বে যে তা নিয়ে কাজ করা সুবিধাজনক হয় এবং কাজের ফলটা ভাল হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বড় তুলি দিয়ে শিশুরা কাজ ভালভাবে করতে পারে ও তাতে ফলও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। এরজন্য বড় কাগজ যা সবচেয়ে সস্তা (সাধারণতঃ সবচেয়ে সস্তা কাগজ হচ্ছে News-print) অথবা খাকি Packing এর কাগজ উপযোগী। পুরাতন খবরের কাগজও উপযুক্ত, তবে তার উপর আঁকতে গেলে এমন রঙ ব্যবহার করতে হ'বে যাতে ছাপার অক্ষরগুলি ঢাকা পড়ে যায়; যেমন মাটির রঙ; গৈরিক মাটি, এলা মাটি ইত্যাদি। রঙিন খড়িও বেশ ভাল। সিমেণ্টের মেঝেতে খড়ি দিয়ে অথবা শ্লেট অথবা ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে আঁকা বেশ ভাল। কাগজে আঁকার জন্য পেন্‌সিল অথবা ক্রেয়ন অথবা Pastel ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে প্রথমেও তুলি ও রঙ দিয়ে আঁকা যায়। তার ফলও সময়ে সময়ে বেশ ভাল পাওয়া যায়।

মাটির রঙ ব্যবহারের উপযোগী করার ভিন্ন রীতি আছে। প্রথমে রঙগুলিকে জলে ভিজিয়ে রাখ্‌তে হ'বে। পরে দেখা যাবে রঙএর গুঁড়োগুলি পাত্রের নীচে জমে রয়েছে। তখন জল ফেলে দিয়ে গঁদের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হ'বে। গঁদ ঠিক ততটুকুই দিতে হ'বে যতটুকু গঁদ দিলে রঙ আর উঠবে না। বেশী গঁদ হয়ে গেলে রঙের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হ'য়ে যাবে। কি কি মাটির রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

১। গৈরিক মাটি (গিরিমাটি, মেটে লাল)।

২। এলা মাটি (ফ্যাকাসে হল্‌দে)।

৩। পিউড়ী মাটি (উজ্জ্বল হল্‌দে)।

৪। ভূষা কালি (কাল)।

৫। সফেদা (সাদা)।

৬। রবিন ব্লুবার্ড (নীল রঙ যা কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়)।

৭। সিন্দুর (উজ্জ্বল লাল)।

আজকাল সহরে রঙের দোকানে এই সকল রঙ Packetএ পাওয়া যায়। নিম্নে কোন কোনটির ইংরাজী নাম দেওয়া হ'ল ঃ—

(১) Lemon chrome ;
(২) Emerald green ;
(৩) Lamp black ;
(৪) Zinc white ;
(৫) Ultra marine ;
(৬) Vermillion ;

এই প্যাকেটের রঙগুলির ঔজ্জ্বল্য অন্যান্য রঙের চেয়ে বেশী। সবচেয়ে ভাল হয় যেখানে কোন কুমোর বা পটুয়া থাকে ; তারা কি ক'রে রঙ প্রস্তুত করে তা তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সস্তায় রঙ তৈরী করতে পারা যায়।

রঙ সংমিশ্রন এই বয়সের ছেলেমেয়ের ছবিতে খুব প্রয়োজন হয় না। অবশ্য সময় বিশেষে তারা রঙ সংমিশ্রনে আগ্রহ দেখাতে পারে। কিন্তু সে শুধু মেশানোর কৌতূহলের জন্যই। সাধারণতঃ এই বয়সের শিশুরা মূল রঙটা বেশী ব্যবহার করে। কারণ তারা সব রঙই এই কয়েকটা মূল রঙের দিক থেকে ভাবে। লাল তাদের কাছে লালই। লালের সামান্য এদিক ওদিকের তারতম্য তাদের কাছে নেই।

তুলি

খানিকটা পাট একটি বাঁশের কাঠির সঙ্গে বেশ ভাল ক'রে বেঁধে নিয়ে তারপর কাঁচি দিয়ে ডগাটি ছেঁটে নিলে বেশ ভাল তুলি হ'বে যে রকমভাবে ঘর চুনকাম করবার সময়ে চুন লাগানোর জন্য তুলি তৈরী করা হয়। সেইরকম একটি তুলি শিশুদের দেখালে তারা সুন্দরভাবে তুলি তৈরী ক'রে নেবে। খেজুরের ডাল কেটে একটু চেঁচে নিয়ে তার ডগাটা একটু ছেঁচে নিলে তুলির মত হ'য়ে যায়। সহরের দোকানে ভাল তুলি পাওয়া যায়। ঐগুলি ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকবার জন্য বিশেষভাবে তৈরী। তার নাম Hog-hair brush; বলা বাহুল্য যে শিশুদের ব্যবহারের জন্য এই তুলি খুব উৎকৃষ্ট। এর ডগাগুলি বেশ মোটা ব'লে এইগুলি শিশুদের বিশেষ উপযোগী। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম তুলিগুলি এই বয়সের শিশুদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম তুলিতে বেশী রঙ ওঠে না ও মোটা দাগ দেওয়া যায় না। শিশুরা বেশী ক'রে রঙ ব্যবহার করতে চায় ও মোটা ক'রে দাগ দিতে চায়। ব্যবহারের পর, তুলিগুলি সঙ্গে সঙ্গেই ধুয়ে ফেলতে হ'বে, না হ'লে নষ্ট হ'য়ে যাবে। রঙিন খড়ি, ক্রেয়ন বা Pastel সম্বন্ধে উল্লেখ করবার বিশেষ কিছুই নাই, কারণ এগুলির ব্যবহার সোজা। পেন্সিলের চেয়ে ক্রেয়ন ভাল, কারণ এর দাগ খুব ঘন ও উজ্জ্বল। এ ছাড়া গাছ গাছড়া থেকে রঙ পাওয়া যেতে পারে এবং এই জাতীয় রঙ সংগ্রহ করা শিশুদের কাছে খুবই আনন্দজনক। শিক্ষককে খুঁজে বার করতে হবে পরিবেশের মধ্যে কিছু পাওয়া যায় কিনা। শিক্ষক দেখবেন কি তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব, ও কি নয়। তবে তিনি যাই সংগ্রহ করুন না কেন তাই দিয়েই শিশু যেন আঁকে, কারণ যে ভাবেই হোক, শিশুকে তার প্রকাশ করবার সুযোগ দিতেই হবে। তা না হ'লে তার ভাব প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফল তার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিফলিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্পকাজ

(ক) ভূমিকা

নূতন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পুস্তকের গুরুত্ব কিছুটা কম ক'রে শিল্পকাজকে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুস্তকভারক্লিষ্ট শিশুর কথা যে এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় ভুলে যাওয়া হয় নি, এটা তারই প্রমাণ। শিশু কাজ করতে ভালবাসে, হয়ত সেই কাজ করার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নিহিত নাও থাকতে পারে, কিন্তু তবু সে কাজ ক'রে আনন্দ পায়। অপরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ কেটে গেলেই সে বিভিন্ন প্রকারের কাজের ভেতর দিয়ে বহিঃপ্রকৃতিকে স্ববশে আনবার চেষ্টা করে এবং তার অভিজ্ঞতার গণ্ডী বাড়াবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তার স্ববশে থাকে না। জন্ম হওয়ার পর সে না পারে ইচ্ছামত দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে, না পারে শ্রবণশক্তিকে প্রয়োগ করতে। তার স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদবোধ কোন কিছুই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। ক্রমশঃ ওগুলির স্ফুরণ হতে থাকে, ক্রমশঃ তার মাংসপেশী সবল হতে থাকে এবং ক্রমশঃ সে কোলাহলমুখরিত বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে নিজের অর্থ খুঁজে পেতে থাকে।

শিশুর ক্রমবৃদ্ধি

প্রথমতঃ শিশু থাকে আত্মকেন্দ্রিক, নিজস্ব প্রয়োজন ছাড়া বহিঃ-পৃথিবীর কোন অর্থই তার কাছে থাকে না। নিজের খাওয়া, শোওয়া, নিজের খেলনা, নিজের মা-বাবা-ভাই প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিকটস্থ বস্তু ছাড়া সে আর কিছুই চেনে না, জানে না। ক্রমশঃ দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে এবং অতি কাছের পরিবেশকে চিনতে শেখে। কিন্তু এই চেনার মূলেও যদি তার নিজস্ব প্রয়োজনের কোন তাগিদ না থাকে, তবে সে চেনার কোন মূল্য তার কাছে নেই। সেইজন্য রঙীন খেলনাটি, রবারের বলটি তার কাছে যত মূল্যবান বড়দের বাক্স পেঁটরা, বাসন-কোসন, ঝুড়ি ঝাঁপি তার কাছে তত মূল্যবান নয়। শিশু তাই তার ঈপ্সিত দ্রব্যটিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করার চেষ্টা করে। খুব ছোট শিশুর হাতে যে কোন জিনিষ দিলেই সে তা মুখে পুরবার জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠে। পরে হয়তো তার স্বাদে কিংবা কাঠিন্যে মধুর কিছু না পেয়ে ফেলে দেয়। যে কোন নূতন বস্তু দেখলেই তার সম্বন্ধে জানবার প্রবৃত্তি শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক।

শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী

নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ (যেমন দৌড় ঝাঁপ) এবং নিকটস্থ পরিবেশকে জানা—এরই মধ্যে ৫।৬ বৎসরের শিশুর সকল কার্যকলাপ নিবদ্ধ থাকে। সে বড়দের দেখাদেখি অনেক কিছু করতে চায়, তা সত্য, কিন্তু বয়স্কেরা যে দৃষ্টি নিয়ে কাজ করে, সেরকম উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ এই বয়সের শিশুর কাছ থেকে আশা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ, বয়স্কের প্রয়োজন এবং শিশুর প্রয়োজন এক হতে পারে না। অপরিচিত পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে সে যেমন বারেবারে নাড়াচাড়া ক'রে বুঝতে শেখে, প্রতিটি কথাকেও সে তেমনি বারংবার আবৃত্তি ক'রে জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর আলোড়ন দ্বারা বলতে শিখে। বস্তুকে চিনবার, জানবার এই অত্যুগ্র বাসনাই তাকে কর্মে প্রেরণা দেয়, সেদিক দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিকই শিশুর মত অনুসন্ধিৎসু নয়, নূতনের আবিষ্কারে শিশুর চেয়ে বেশী আনন্দিত নয়।

দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি যেমন সময়সাপেক্ষ তার মানসিক বৃদ্ধিও তেমনি সময়সাপেক্ষ। ছোট শিশু যেমন অনিবার্য কারণে বড়দের মত ছুটতে পারে না, তেমনি বড়দের দেওয়া অর্থও মানসিক অপরিপুষ্টতার জন্য তার কাছে নিতান্ত অর্থহীন। 'কাঁচের গ্লাসটি নিও না',

'ভাইকে মেরো না', 'ওখানে যেও না',—ইত্যাদি বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভেতরে শিশু থাকতে চায় না। তার কৌতূহল তাকে সেই গণ্ডীর বাইরে যেতে প্রেরণা যোগায়। আমরা দেখে শুনে বিরক্ত হই। কিন্তু সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি, যে বিধি-নিষেধের বেড়াজালের ভেতরে আমরা শিশুকে বেঁধে রাখতে চাই, তা তারই মঙ্গলের জন্য হলেও সে তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। সে স্বাধীনভাবে নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে সব কিছু যাচাই করে নিতে চায়; অন্যের আরোপিত মূল্য, অন্যের মাপকাঠির মাপ তার মনঃপূত হয় না; তাই সে অবিরাম প্রশ্ন ক'রে যায়,—'কেন?', 'কেন এ করব?', 'কেন তুমি আমাকে মারলে?', 'কেন পাখীরা ওড়ে?' 'কেন জলে মাছ থাকে?' 'কেন আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে?' ইত্যাদি। সে এই 'কেন'-র মৌখিক উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হতে চায় না, সে চায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাই সে গ্লাস ভাঙ্গে, বই ছেঁড়ে, ফুল তোলে, আবোল-তাবোল বকে, কাল্পনিক খেলায় মেতে ওঠে। মোটকথা সে খেলার ছলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, বস্তুকে প্রথমে ইন্দ্রিয় দিয়ে এবং পরে মন দিয়ে গ্রহণের চেষ্টা করে।

কর্মের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার বিস্তার

শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় তাই তার অভিজ্ঞতার প্রসারের চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যা কিছু মানসিক সঞ্চয় তা শিশুর পক্ষে বস্তু-নিরপেক্ষ হতে পারে না। জ্ঞানকে বাস্তবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে গ'ড়ে তোলাই বিজ্ঞানসম্মত এবং শিশুর মনোবিকাশের প্রয়োজনসম্মত।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বনাম পুঁথিগত শিক্ষা

তাই শিল্পকাজের ভেতর দিয়ে শিক্ষা পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা অপেক্ষা সুফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সকল প্রকার শিক্ষার মূলেই শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বড় কথা। কাজের মধ্যে শিশুর আগ্রহ স্বাভাবিক, সুতরাং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পুঁথিগত শিক্ষা-ব্যবস্থা (যাতে শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা কমই থাকে) হতে উন্নততর হবে ব'লে আশা করা যায়।

উপরের আলোচনা হতে প্রতিপন্ন হয় যে, শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির জন্য যেমন অপেক্ষা করতে হবে, তার মানসিক বিকাশের জন্যও তেমনি ধীরভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং উভয়ই সময়সাপেক্ষ। সুতরাং শিশুর উপযোগী দৈহিক খাদ্যও যেমন সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত, তার মানসিক পরিপুষ্টির জন্যও তেমনি সুপরিকল্পিত তথ্যাদির সমাবেশ প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় কাজের স্থান অতি উচ্চে হলেও কাজও সুব্যবস্থিত হওয়া উচিত। যে কাজ শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে না, সে কাজ শিশুকে করতে দিলে তার দৈহিক সামর্থ্যে কুলোবে না; (যেমন, চার বছরের শিশুকে ছোট ছুঁচে সুতো পরাতে দিলে সে তা পারবে না, তার কারণ ঐ বয়সের শিশুর দৃষ্টি-শক্তির ততদূর পরিপুষ্টি হয় নি) তাকে র‍্যাঁদা চালাতে দিলে, কাটারি দিয়ে কাটতে দিলে, সাধারণ বাটালি ব্যবহার করতে দিলে, সে শারীরিক অপরিপুষ্টতার জন্যই তা করতে পারবে না। সুতরাং শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রে সহজ হতে ক্রমে কঠিন কাজে অভ্যস্ত করিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সেইজন্যই ৬ হতে ৭ বৎসর বয়সের শিশুর কাছ থেকে প্রাপ্তবয়স্কের নিপুণতা আশা করা ভুল। জোর ক'রে, অনেক কসরৎ ক'রে দু' একটি কাজ তাকে নিপুণভাবে করতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যদিকে তার অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

হাতের কাজ

প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় হাতের কাজ ব'লে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, শিশুর স্বাভাবিক পরিপুষ্টি, তার দৈহিক সামর্থ্য, তার আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতের কাজে শুধু হাতের নয়, তার মধ্যে সমগ্র দেহ ও মনের ক্রমবৃদ্ধির যাতে সুযোগ থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজের মধ্যে যদি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং শিশু যদি নিজে সেই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়, তবে তা তার চিন্তাশক্তির বিকাশের সহায়তা করবে।

সাধারণতঃ, হাতের কাজের মধ্যে সূতাকাটা, কাপড়বোনা, কাগজ তৈরী, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, মাটির কাজ এবং স্থানীয় কোন কুটীর শিল্পের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। ৬।৭ বৎসরের বালক কিংবা বালিকা নিপুণতার সঙ্গে এর কোনটি যে করতে পারবে না এ সম্বন্ধে সকলেই একমত হবেন। কিন্তু ঐ সকল কাজের প্রত্যেকটিকেই যদি শিশুর বয়সের ও সামর্থ্যের উপযোগী ক'রে শিশুর সামনে উপস্থিত করা যায়, তবে সে সাগ্রহে সেটুকু তো শিখবেই, অধিকন্তু বড়দের দেখাদেখি আরও উন্নত ধরণের কাজ শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

হাতের কাজের ক্রমোন্নতি

৫-৫½ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা কাদা, মাটি, বালি, পুরাণো কাপড়, ছোট ছোট টিনের বাক্স, কাঠের টুকরা প্রভৃতি যা কিছু পায়, তা দিয়েই কোন কিছু গড়ার চেষ্টা করে। এ সময়ের আগ্রহ ক্ষণিক, মুহূর্ত পূর্বে যে খেলায় সে সমস্ত প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিল, পরমুহূর্তেই সেদিক হতে তার মন অন্য কিছুতে নিবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কোন নির্দিষ্ট কিছু গড়বার চেষ্টা সে করে না ; উপাদান নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা কিছু হয়ে গেলে সে তার একটা নাম দিয়ে বসে, বাস্তব জগতে তেমন বস্তুর অস্তিত্ব কোন প্রাপ্তবয়স্কেরও হয়তো অজ্ঞাত।

উপাদান নিয়ে এমনিভাবে নাড়াচাড়া করার সার্থকতা এই যে, এইভাবে শিশু তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্তার করবার সুযোগ পায়। হাতের মাংসপেশী, হাত এবং আঙগুল ক্রমে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পায়, চোখ ও হাতের সংযোগ সাধিত হয়। উপাদানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করে।

এই বয়সের কাজকে খেলার পর্যায়ে ভিন্ন অন্য কোন পর্যায়ে ফেলা যায় না। সে হিসাবে এই সকল কাজ শিশুর ইচ্ছানুসারে করতে দেওয়াই সঙগত; শিক্ষক সহানুভূতির সঙ্গে শিশুর এই খেয়াল চরিতার্থ করবার সুযোগ দেবেন এবং প্রশংসার কার্পণ্য করবেন না। ৬ হতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকার স্থায়ী কিছু করবার বা গড়বার ইচ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উপাদান ও উৎসাহ পেলে এই ইচ্ছাই তাকে নিপুণতর কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিশুকে ইচ্ছামত কাজ করতে দেওয়ায় যে বিপদ নেই, তা বলা চলে না। তাকে দেখিয়ে না দিলে সে নীচু ধরণের কাজ ক'রে যাবে এবং যে সকল শিশু নিজের কাজের সমালোচনা নিজে করতে পারে না, তাদের কাছে নিকৃষ্ট ধরণের কাজই উৎকৃষ্ট কাজ ব'লে মনে হতে পারে। ক্রমশঃ ঐরূপ কাজেই তারা অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু একটু সাহায্য করলেই হয়তো তারা এর চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের কাজ করতে পারত।

এমন অবস্থায় শিক্ষক কতকগুলি ছেলেমেয়ের সামনে তাদেরই ব্যবহৃত উপাদান নিয়ে যদি উন্নত ধরণের কাজ ক'রে দেখান তা হ'লে তারাও নিজেদের কাজের উন্নতি করার চেষ্টা করবে।

অনেক সময় শিক্ষক ছেলেমেয়েদের উন্নততর প্রণালীতে (যেমন প্রণালী তারা শিখতে পারে) কাজ করা দেখিয়ে দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ছেলেমেয়েরা মাটির জিনিষ তৈরী করার পরেই রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিতে চায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঐগুলি ফেটে যায়। শিক্ষক যদি মাটি প্রস্তুত ক'রে নেওয়ার প্রণালী দেখিয়ে দেন এবং খেলনা প্রস্তুতের পর ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়ার উপদেশ দেন (কিংবা নিজে ক'রে দেখিয়ে দেন) তবে ছেলেমেয়েরা ঐভাবে কাজ করতে শিখবে এবং ব্যর্থতার হাত থেকেও নিস্তার পাবে।

সকল প্রকার হাতের কাজেই কিছু না কিছু নিয়মকানুন আছে এবং কাজের যন্ত্রপাতিও আছে। প্রথম হতেই ছেলেমেয়েদের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্ত করাতে হবে—যেমন, বুনানি শিখতে হলে টানার সূতার একটির উপর দিয়ে এবং একটির নীচ দিয়ে পড়েনের সূতা পরাতে হবে, অথবা, মাটি দিয়ে পুতুল গড়তে হলেই সে মাটিকে জলে ভিজাতে হবে এবং তার মধ্যেকার কঠিন অংশগুলিকে বেছে বাদ দিতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন শিল্পের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হাতের কাজ সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত কার্যক্রম স্থির করতে গেলে শিক্ষক কয়েকটি প্রধান বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন ঃ—

(ক) হাতের কাজের যে নিয়মকানুন আছে, তারই মধ্যে ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে।

(খ) যদিও একটি সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসারে ছেলেমেয়েরা হাতের কাজ শিখবে, তবু তারই মধ্যে তাদের এইটুকু স্বাধীনতা দিতে হবে যে, তারা যেন তাদের মনোমত জিনিষ গড়ার সুযোগ পায়।

(গ) সহজ হতে কঠিন প্রণালীতে যেতে হবে; এতে দক্ষতার ক্রমবিকাশ হবে এবং শিক্ষার্থী যথাসম্ভব কম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। প্রথমেই কঠিন কাজে হাত দিয়ে বিফল হওয়ার চেয়ে সহজ কাজ হতে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ কঠিনের দিকে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন। যেমন, প্রথমেই যদি ছেলে-মেয়েদের চরকায় সুতো কাটতে দেওয়া হয় তবে তারা সুতা বের করতে অনেক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে প্রথমে চরকা না দিয়ে প্রথমে তকলী দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উপকরণ

হাতের কাজ শিক্ষা দিতে গেলে স্বভাবতই প্রথমদিকে ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু জিনিষপত্র 'নষ্ট' করবেই। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রথমদিকে মূল্যবান উপকরণ দেওয়া সম্ভবপর হবে না। সুতরাং প্রথম প্রথম সহজলভ্য এবং অতি কম মূল্যের উপকরণ দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। পুরানো, বাতিল করা টুকিটাকি, যেমন, ছেঁড়া কাপড়, টিনের বাক্স, দেশালাইয়ের বাক্স, খবরের কাগজ, প্যাকিং বাক্স, ভাঙগা কিংবা অকেজো তালা, চাবি, চট ইত্যাদি হতেও ছেলেমেয়েরা সুন্দর সুন্দর জিনিষ গড়তে পারে। কাদামাটি সহজপ্রাপ্য এবং একে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যায় ব'লে প্রথমদিকে অর্থাৎ ৬।৭ বৎসরের ছেলেমেয়েদের প্রচুর পরিমাণে মাটি দেওয়া যেতে পারে। খেলনাগুলি রঙ ক'রে নিলে ওগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে অধিকতর মূল্যবান মনে হতে পারে। সস্তা রঙ দিয়ে ওগুলিকে রঙ ক'রে দেওয়া যেতে পারে। তালপাতা, খেজুরপাতা হতে সহজ চাটাই বুনান শিখান যেতে পারে। শুকান পাতাগুলিকে রঙ ক'রে নিলে ছোটদের পক্ষে বুনানির সুবিধাও হবে।

বয়সবৃদ্ধির সঙেগ সঙেগ শিশুকে অধিকতর মূল্যবান উপকরণ দেওয়া যেতে পারে। বয়সের সঙেগ সঙেগ সে অধিকতর নৈপুণ্যও অর্জন করেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। যে ছেলে ৬ কিংবা ৭ বৎসরে তালপাতার চাটাই বুনতে শিখল, সে ৮ বৎসর বয়সে চট্ বুনতেও পারবে ব'লে আমরা ধরে নিতে পারি। ৬।৭ বৎসরের যে মেয়ে চটের উপর রঙীন সূতার ফোঁড় তুলে নক্সা (design) করতে শিখল, সে দেখিয়ে দিলে চটের ছোট ছোট আসনও সেলাই করতে পারবে ব'লে আশা করা যেতে পারে। তকলীতে কিছু তূলা নষ্ট করার পর যারা সূতা বের করতে শিখেছে, তাদের হাতে এখন চর্কা দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে যথাসম্ভব অপচয় নিবারিত হবে এবং শিশু ক্রমশঃ সহজ হতে কঠিন প্রণালী আয়ত্ত করবে।

প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য।—প্রথম প্রথম ৬।৭ বৎসরের ছেলেমেয়ে যে জিনিষ প্রস্তুত করবে, বাজারে তার কোন মূল্য হ'বে ব'লে আমরা আশা করতে পারি না। মূল্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এ সকল জিনিষ করাতে গেলে শিশুর পরিশ্রমলব্ধ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাকে বেশী পরিশ্রম করানর চেষ্টা হ'তে পারে। অপরদিকে সৃজনীশক্তির বিকাশসাধনের যে সুযোগ তাকে হাতের কাজের মাধ্যমে দেওয়া উচিত, একটি দুটি কৌশল আয়ত্ত করতে দিয়ে সেই সুযোগ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হ'বে। বয়সবৃদ্ধির সঙেগ সঙেগ অর্থাৎ ৮।৯ বৎসর বয়স থেকে শিশু নিজেই নিজের কাজের সমালোচনা করতে শিখবে, উন্নত প্রণালীর কাজ দেখিয়ে দিলে করতে পারবে; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজন মিটাবার জন্য কাজ করতে চাইবে। বড়দের দেখাদেখি সে-ও দরকারী জিনিষ করতে চাইবে। তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির তাগিদেই সে কতকটা বুঝতে শিখবে যে আগে সে যা করেছে, সে

নিতান্তই 'ছেলেখেলা'। এখন থেকে সে যা করবে, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত হ'লে তা'র কিছুটা মূল্য হ'বে, এদের হাতের তৈরী জিনিষ ব্যবহারযোগ্য হবে এবং বিক্রয় করলে অন্ততঃ কাঁচা মালের দাম উঠে আসবে ব'লে আশা করা যায়। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা ১২ থেকে ১৬ নম্বরের সুতা কাটতে পারবে; চট বুনতে, ছোট গামছা (টানা দিয়ে দিলে) বুনতে পারবে; প্লাইউড থেকে খেলনা কাটতে এবং তা রঙ করতে পারবে; সব্জী ক্ষেতে গাছ লাগাতে, জল দিতে, ছোট ছোট নিড়ানি দিয়ে আগাছা উঠাতে এবং গাছের যত্ন করতে পারবে। এই রকমের ছোট ছোট কাজ যা তাদের শারীরিক সামর্থ্যে কুলায়, তাই তাদের কাছে আশা করা যায়, তার বেশী নয়।

নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য

কাজের ভেতর দিয়ে এই সকল গুণাবলীর বিকাশ যতটা স্বাভাবিক হবে, শিক্ষকের মুখনিঃসৃত উপদেশবাণীতে তা হওয়া সম্ভব নয়। সহজভাবে প্রতিদিনের কাজের ভেতর দিয়ে সে এই সকল অমূল্য গুণাবলী নিজের অজ্ঞাতসারেই আয়ত্ত করতে পারবে। যেমন—শিশুরা যদি নিজেরাই বুঝতে পারে যে যে-ঘরে কাজ করা হয়, সে ঘরের আবর্জনা যদি রোজ পরিষ্কার করা না হয়, তবে ওদের নিজেদেরই অসুবিধা হ'বে, তবে পালাক্রমে ওদের এই কাজ করতে দেওয়া যাবে এবং এইরূপ নির্দেশে ওরা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ওরা নিজেরাই যদি এইরকম নিয়ম গড়ে নেয়, তবে তো আরও ভাল কথা। শিক্ষক শুধু লক্ষ্য রাখবেন যে ওদের নিজেদের গড়া নিয়ম ওরা নিজেরাই ভাঙে কিনা এবং ভাঙলে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারে কিনা।

যৌথ দায়িত্ববোধ

যৌথভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার প্রয়োজন কাজের ভেতর দিয়ে যেমন গড়ে ওঠে, অন্য কোন ক্ষেত্রে তেমন সম্ভব হয় না। বাগানের কাজে কিংবা অন্য কোন বড় কাজে যেখানে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন—তেমন স্থানে দায়িত্ববোধ জাগান'র সম্ভাবনা প্রচুর এবং দায়িত্বহীন ছেলেমেয়েও অন্যের সমালোচনা শুনে নিজেকে সংশোধন করার জন্য সচেষ্ট হ'তে পারে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান বা অনুবন্ধপ্রণালী

সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় কাজের মাধ্যমে অনেকখানি শেখান যেতে পারে। শিশু যা হাতে গড়ল বা করল সে সম্বন্ধে মৌখিক কিংবা লিখিত বর্ণনা করতে বললে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তা বলা কিংবা লেখা তার পক্ষে অনেকটা সহজ হ'বে। কিন্তু যে বিষয়ে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, সে সম্বন্ধে বলতে কিংবা লিখতে দিলে, সে পুস্তকে লেখা অন্যের অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। এটা তা'র স্মরণশক্তির পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর যদি ভাষা কিংবা অঙ্কের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পরবর্তী কালে তা'র চিন্তার সুস্পষ্টতা আসবে এবং ভুল হ'বার সম্ভাবনা কম থাকবে। সেইজন্য হাতের কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দিলে সে যে শুধু একটি প্রয়োজনীয় শিল্প সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করবে তা নয়, তা'র মানসিক বিকাশের পথও এতে অনেকখানি প্রশস্ত হ'বে বলে আশা করা যায়।

উদাহরণ

দৈনন্দিন কাজের হিসাব এবং সেই সূত্রে এক সপ্তাহে কিম্বা একমাসে কত ঘন্টা কাজ হ'ল এবং কতখানি উৎপাদন হ'ল তার হিসাব থেকে ছোট ছোট অঙ্ক শেখান যেতে পারে। ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, ওজন, মূল্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে আসবে। ব্যবহৃত কাঁচামালের ওজন ও তৈরী জিনিষের ওজন ক'রে ছেলে-মেয়েরা ওজন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে। বাগানের কাজ করতে গিয়ে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গজ, ফুট ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবে, মাটি ও সার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ করতে শিখবে। এমনিভাবে যে কোন হাতের কাজের মধ্য দিয়ে ওরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, পুস্তকে লিখিত নীরস তথ্যের চেয়ে তা ওদের কাছে বেশী আনন্দদায়ক হ'বে এবং কার্যকরী হ'বে।

উৎসবাদি উপলক্ষে ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে অনেক হাতের কাজ করে। এই উপলক্ষে তারা অনেক কিছু শিখতে পারে। যেমন—'স্বাধীনতা দিবস' পালন করতে তা'রা এই সব জিনিষ নিজেদের হাতে তৈরী করতে পারবে—

(১) পতাকাদণ্ড তৈরী করতে পারবে;

(২) সুতা কাটতে পারবে;

(৩) ঐ সুতা রঙ করতে পারবে;

(৪) ঐ রঙগীন সুতা দিয়ে জাতীয় পতাকা বুনে নিতে পারবে;

(৫) কয়েকটি জাতীয় সঙগীত শিখতে পারবে।

(৬) (উচ্চতর শ্রেণীতে) বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার ছবি আঁকতে পারবে;

(৭) জাতীয় পতাকায় বিভিন্ন বর্ণসমাবেশের তাৎপর্য শিখতে পারবে ;

(৮) নিয়মতান্ত্রিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অভিবাদন, অবনমন এবং সংরক্ষণ করতে শিখবে;

(৯) কুচকাওয়াজ শিখতে পারবে; এবং এই উপলক্ষে—

(ক) দেশাত্মবোধক কবিতা মুখস্থ করতে পারবে ;

(খ) গান শেখা উপলক্ষে গানটি লিখে নিতেও চাইবে;

(গ) মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, জওহরলালের বাল্যজীবন শুনতে এবং পড়তে চাইতে পারে;

(ঘ) অন্যান্য দেশের জাতীয় পতাকা আঁকতে গিয়ে ঐ সকল দেশের সম্বন্ধে কিছু ভৌগোলিক জ্ঞানও আয়ত্ত করতে পারবে;

(ঙ) স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে পরাধীন ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যাদিও শিখতে পারবে;

(চ) প্রসঙ্গক্রমে অনুরূপ আরো কিছু (যেমন খবরের কাগজ থেকে ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি) পড়তে পারবে।

বিভিন্ন শ্রেণী অবশ্য এই উপলক্ষে বিভিন্ন কাজ করবে, কারণ খুব ছোটদের কাছ থেকে এর সবগুলি কাজ আশা করা ভুল হ'বে। মানসিক ও দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের বিভাগ ক'রে দিলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করতে পারবে ব'লে আশা করা যায়।

অনুবন্ধপ্রণালীর বিপদ

অন্ধভাবে অনুবন্ধপ্রণালীকে অনুসরণ করলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। কাজের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে সকল তথ্যাদি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, শিক্ষক তার দিকেই দৃষ্টি দেবেন; অস্বাভাবিক, অসংযুক্ত অথবা অনুপযোগী তথ্য পরিবেশন ক'রে শিশুর মানসিক বদহজমের ব্যবস্থা করবেন না। কাঠের কাজ করতে দিয়েই শিশুকে যদি সবরকমের কাঠ, তাদের উৎপত্তিস্থান, মাটির প্রকৃতি, কাঠের তারতম্য প্রভৃতি বলতে আরম্ভ করা হয়, তবে কাজের প্রতি শিশু বীতরাগ তো হবেই অধিকন্তু শিক্ষকের বক্তব্যের অর্থ বহুলাংশেই সে বুঝতে পারবে না।

মোটকথা, শিশুর মানসিক বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হ'বে। ৬ বছরের শিশু মাটি দিয়ে খেলতেই ভালবাসে; মাটির স্তরবিভাগ, উর্বরতা, অনুর্বরতা প্রভৃতির কথা উঠালে, তা থেকে শিশুর উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী। অনেক সময় কোন কিছু শিখবার সুযোগ না পেলেও নিরুৎসাহ হ'বার কারণ নাই; শিশু কাজ করছে, এটাই মস্ত শিক্ষা।

পুস্তকের স্থান

কেবলমাত্র কাজকে কেন্দ্র ক'রে সকল প্রকার শিক্ষা দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আওতায় যেটুকু পড়ে, তা ছাড়াও শিশুকে অনেক কিছু শিখতে হ'বে। সেরূপ ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিতে হ'বে, কিন্তু সেখানেও কাল্পনিক বস্তুর যথাসম্ভব বাস্তব রূপ দিলে তবে শিশুর পক্ষে তা সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

'হিমালয়' সম্বন্ধে কোন শিশুরই বাস্তব অভিজ্ঞতা হ'তে পারে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে 'নগাধিরাজ'কে প্রত্যক্ষ করছে; সেরূপ ক্ষেত্রে মেঘ দেখে ছোট টিলা কিংবা পাহাড় দেখেই শিশু ঐ সম্বন্ধে একটি ধারণা করতে বাধ্য হ'বে। ছবি, ম্যাপ, মডেল প্রভৃতির প্রভূত ব্যবহার সেইজন্যই শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত। হাতের কাজের মধ্য দিয়ে, পরিবেশের ভেতর দিয়ে শিশু অসংবদ্ধভাবে যা কিছু শেখে, তা কখনই পুস্তকে লেখা তথ্যের মত সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত হ'তে পারে না এবং লিখে না রাখলে অনেক কথাই ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেইজন্য প্রথম দুই একবৎসর নির্দিষ্ট কোন পুস্তক না থাকলেও পরবর্তী কালের জন্য পুস্তকের প্রয়োজন আছে। প্রথম দুই বৎসর তা'র অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রেই সে লিখতে পড়তে শিখবে এবং প্রয়োজনের তাগিদও তাকে অনেক সময় লিখতে পড়তে প্রেরণা দেবে যেমন—নাম লিখে না রাখলে খাতা কিংবা ছবি কিংবা তৈরী জিনিষ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গল্প শুনে, কবিতা শুনে, ছবি দেখে সে ছবির বই, গল্পের বই পড়তে চাইবে এবং যখন সে দেখবে তারই অভিজ্ঞতার কাহিনী পুস্তকেও লেখা আছে, তারই প্রিয় গল্প ও কবিতা পুস্তকে স্থান পেয়েছে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই পড়ার দিকে আকৃষ্ট হ'বে। সুতরাং যে শিশুর অভিজ্ঞতার গণ্ডী যতখানি প্রশস্ত, তার পক্ষে শিক্ষালাভ ততটা সহজ হয়; এবং বাল্যে কাজের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, তার ছাপই মনে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। সেই জন্য, শিশুকে কাজ করার প্রচুর সুযোগ দিতে হবে এবং সে যেন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তা দেখতে হবে।

উপসংহার

প্রথম ২।১ বৎসর (অর্থাৎ ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত) শিশুকে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এই বয়সে হাতের কাজের খুঁটিনাটি বিষয় জোর ক'রে শেখাতে গেলে ঐ কাজের সম্বন্ধে শিশু বীতরাগ হয়ে উঠতে পারে। তার শারীরিক পরিপুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে কাজের নির্দেশ দিতে হ'বে।

(১) তবে শিশু যদি কোন কৌশল আয়ত্ত করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, এবং ঐ কৌশল আয়ত্ত করতে যদি তার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা'কে সহজ কৌশলগুলি শেখান যেতে পারে। ক্রমশঃ দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে তাকে অন্যান্য কঠিনতর প্রক্রিয়াগুলি শেখান সম্ভবপর হবে।

(২) একসঙ্গে অনেকগুলি কৌশল শিখতে না দিয়ে একটি অতি সহজ প্রক্রিয়া থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে। যেমন—পাতার চাটাই বুনতে সহজ সেলাইয়ের পদ্ধতিতে একটির উপর দিয়ে এবং একটির নীচ দিয়ে পাতা পড়ানর পদ্ধতি প্রথমে শেখান উচিত। ঐ প্রক্রিয়া আয়ত্ত করার পর, ২টির উপর দিয়ে, দুইটির নীচ দিয়ে এবং ক্রমশঃ ৩টির উপর এবং ৩টির নীচ দিয়ে বুনানি শিখান যেতে পারে।

(৩) শিশুকে যে কাজই দেওয়া হোক না কেন, অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ হওয়া চাই এবং তৈরী জিনিষ সকলকে দেখানর সুযোগ দেওয়া চাই (এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ছোটদের হাতের কাজের 'প্রদর্শনীর' ব্যবস্থা করা যেতে পারে)। একটি কাজ শেষ করতে বহুদিন লেগে গেলে, শিশুর ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা আছে এবং এর জন্য শিশুকে দায়ী করা চলে না।

(৪) ছেলেমেয়েরা যাই করুক না কেন, কি উদ্দেশ্যে, কেন করছে, সে সম্বন্ধে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।

(৫) প্রত্যেকটি কাজ—তা যত ছোটই হোক, না কেন—যেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখার শিক্ষা শিশুকে দেওয়া হয়। খাপছাড়া, দায়িত্ব-হীন, অর্থহীন কাজের স্থান শিক্ষায়তনে নাই।

(৬) স্থানীয় হস্তশিল্পের কাজ দেখানর জন্য ছোটদের নিয়ে ঐ সকল কারিগরের বাড়ী গিয়ে তাদের কার্যপ্রণালী দেখাতে হবে এবং তাদের জীবনযাত্রা, উপার্জন ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি বালকবালিকা জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হ'বে।

(৭) যে সকল উপকরণ কেনা হ'বে, তার খরচের হিসেব রাখতে হ'বে এবং প্রত্যেকটি তৈরী জিনিষে কতখানি কাঁচামাল ব্যবহার করা হ'ল, কত ঘন্টা পরিশ্রম করা হ'ল এবং তার কত খরচ পড়ল, তারও হিসেব রাখতে হ'বে।

(৮) ৭ বৎসর থেকেই বালকবালিকারা হাতের কাজের দিনলিপি রাখতে শিখবে।

(৯) ওরা কোন কাজে বেশী অনুরক্তি এবং উন্নতি দেখায় শিক্ষক সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন এবং তাঁর দিনলিপিতে উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে মন্তব্য লিখে যাবেন।

(১০) গৃহস্থালীর কাজে যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, নিত্যপ্রয়োজনে যে সকল জিনিষ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, বালকবালিকা নিজস্ব প্রয়োজনে যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করতে চায়, আগে সেই সকল জিনিষ প্রস্তুত করানই শেখাতে হ'বে।

বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করার কৌশল প্রথম থেকেই শেখানর কোন সার্থকতা নেই। তবে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতি ক্ষুদ্র জিনিষটিতেও যাতে সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে।

(খ) কাতাই শিল্প

কর্মকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় কোন কাজকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হলে বিবেচনা করতে হবে কাজটি শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের সহায়ক কি না? এ ছাড়া উৎপাদনের দিক হতেও কাজটির উপযোগিতা বিচার করা যেতে পারে। এই সব বিচারে কাতাই শিল্পকে শিশুশিক্ষার একটি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা খুবই ঠিক হয়েছে।

কাতাই শিল্প অনেকগুলি প্রক্রিয়াসমন্বিত ও বিভিন্ন বয়সের শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী বিভিন্ন প্রক্রিয়া নির্বাচন করা যায়। কাতাই শিল্প বাস্তবিক একটি মাত্র শিল্প নয় এবং কাতাই শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র 'সুতোকাটা' বোঝান হয় না। ইহা কতকগুলি সম্বন্ধযুক্ত শিল্পসমষ্টি। তুলোর চাষ হ'তে বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত কাতাই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। তুলোর চাষ, তুলো ধোনা, সুতো কাটা, কাপড় বোনা, সরঞ্জাম তৈরী, রঞ্জন-শিল্প, ধৌতিশিল্প প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে ব'লেই শিশুর বর্ধনশীল যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী একে বিভিন্ন পর্যায়ে সাজানো যায়।

এই শিল্পটির মধ্যে শিক্ষালাভের সম্ভাবনা প্রচুর। শিল্পটি যথেষ্ট ব্যাপক হওয়ায় শিশু একটি শিল্পোদ্যোগের মধ্য দিয়ে নানারূপ সহায়ক শিল্পের সংস্পর্শে আসে। এজন্যও শিশুর ক্রমবর্ধনশীল জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এই শিল্পটী সকল অবস্থাতে সংযুক্ত থাকার উপযোগী। কাতাই শিক্ষায় ব্যবহৃত উপাদানসমূহের অপচয়ের পরিমাণও অল্প। সুতো অথবা তুলো যা অপচয় হয় তাও লেপ, তোষক বা কাগজ প্রস্তুতের কাজে লাগানো যায়। অপকৃষ্ট সুতোও দোতার, তিন তার ক'রে পাকিয়ে রঙ ক'রে নানারূপ আসন, তোয়ালে প্রস্তুত করানো যায়। গেঞ্জি, মোজা, 'সোয়েটার' বোনাও সম্ভব।

গ্রাম-সভ্যতার বিকাশসাধন বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির একটি লক্ষ্য। এদিক হ'তেও কাতাই শিল্প সুযোগ্য।

উপরোক্ত যুক্তিগুলিকে শিক্ষক সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারলে কাতাইএর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সার্থক হ'বে। কাতাইকে শিশুর নিকট যতদূর সম্ভব মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ

করতে চেষ্টা করতে হ'বে। কোন কাজকে শিশুর উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দিয়ে তার শ্রম ক্ষমতাকে ভারাক্রান্ত ও চিত্তকে নিরানন্দ করা উচিত হ'বে না। আবার একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সুকৌশলে ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালিত করতে পারলে শিশুর শিক্ষাগত অগ্রগতি ও আনন্দের পরিপোষকভাবেও কাতাই শিল্পকে যথেষ্ট উৎপাদনাত্মক করা যায়।

কাতাই শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হ'লে কার্পাস উৎপাদন হ'তে বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হ'বে। সুতরাং কার্পাস উৎপাদন সম্বন্ধেও শিক্ষকের উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এখানে প্রথমতঃ তুলো ও তুলোর চাষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বর্ণিত হ'ল।

সাধারণতঃ আমরা বালিশ, গদি প্রভৃতির জন্য শিমুল তুলা ব্যবহার করি এবং বস্ত্রের জন্য কার্পাস তুলা ব্যবহার করি। এছাড়াও আকন্দ প্রভৃতি গাছ থেকেও তুলা পাওয়া যায়, কিন্তু শিমুল তুলা বা আকন্দ তুলা হইতে সুতা হয় না। কারণ এসব তুলোর আঁশ ছোট, চকচকে এবং এর আঁশে কার্পাসের তুলোর আঁশের মত 'পাক' থাকে না। সুতরাং সুতো কাটার পক্ষে ইহা অনুপযুক্ত। কার্পাস তুলোর আঁশও ছোট, বড়, মসৃণ হয়, কিন্তু কার্পাস তুলোর আঁশে স্বাভাবিক পাক থাকায় তাতে সুতো কাটার পক্ষে কোন রকম বাধা হয় না। তবে আঁশের শুভ্রতা, সূক্ষ্মতা ও দৈর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে সরু, মোটা ও মজবুত সুতো হ'য়ে থাকে। কার্পাস সম্বন্ধে জানবার অনেক কিছু আছে, এখানে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়। আশা করি পুস্তকাদির সাহায্যেই শিক্ষকগণ তা জানতে পারবেন। যে সমস্ত কার্পাস সহজে আমাদের এই বাংলাদেশে হ'তে পারে তার চাষ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হ'ল।

কার্পাস চাষ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—(১) উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশেই কার্পাস ভাল হয়। (২) জমি ভালভাবে কর্ষিত ও উর্বর হওয়া প্রয়োজন। (৩) জমির আর্দ্রতা বজায় রাখবার জন্য ঠিকমত সার ও জলসেচ দিতে হ'বে। (৪) কার্পাসের বীজ ঠিকমত বাছাই হওয়া চাই এবং বপনকালে এমনভাবে লাইন ক'রে বুনতে হ'বে যেন গাছে গাছে জড়িয়ে না যায় এবং কার্পাস তুলবার সময় জমিতে যাতায়াতের উপযোগী উপযুক্ত রাস্তা রাখতে হবে। (৫) অতিরিক্ত বেলে জমি বা নীচু জমিতে কার্পাস হ'বে না। কার্পাসের জমিতে খৈল, ছাই, হাড়ের গুঁড়ো, সবুজসার উপযোগী হবে। বিঘাপ্রতি ।২, ।২॥ সের বীজ প্রয়োজন হ'তে পারে। পাঞ্জাব, আমেরিকান, কাম্বোডিয়া, ইন্দোর প্রভৃতি জাতীয় কার্পাস বর্তমানে চাষ ক'রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে। দেব কার্পাস ও বুড়ি কার্পাস নামীয় দুই প্রকারের কার্পাস বহুদিন হ'তে বাংলাদেশে উৎপন্ন হ'য়ে আসছে। এগুলির গাছ ভালভাবে যত্ন করতে পারলে কয়েক বছর ধ'রে ভাল ফসল পাওয়া যেতে পারে। গৃহস্থের বাড়ীর উঁচু ডাঙ্গা জমিতে ৮।১০ হাত অন্তর লাগান যেতে পারে। প্রতি গাছে ৪।৫ সের (বীজসমেত) কার্পাস হ'তে পারে। বীজ ছাড়ালে এক-তৃতীয়াংশ তুলো পাওয়া যেতে পারে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণতঃ কার্পাস চাষ করা হ'য়ে থাকে। কোন কোন জাতীয় কার্পাস আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসেও চাষ করা হ'য়ে থাকে। বিঘাপ্রতি ১৷ মণ ১॥ মণ তুলো পাওয়া যেতে পারে। বীজ বপনের পূর্বে বীজগুলি গোবর জলে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে বপন করলে ভাল হয়।

কার্পাস ভালভাবে হ'লে ৬।৭ মাস পর হ'তেই তুলো পাওয়া যেতে থাকে। কার্পাস ভাল ক'রে না পাকলে তোলা উচিত নয়। এবং তোলবার সময়ে শুখনো পাতা বা ময়লা তুলোর সঙ্গে যাতে জড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'বে। তোলার পর অন্ততঃ মাসখানেক রোদে দিলে পর সেটা সুতো কাটা ও বীজ ছাড়িয়ে পাঁজ করার উপযুক্ত হয়। বীজ নরম থাকলে ওটাই করা যায় না এবং কার্পাস ভালভাবে না শুকালে ভাল সুতো বা ভাল কাপড় হ'বে না এদিকে খেয়াল রেখে কার্পাস চয়ন, পরিষ্কার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হ'বে। কাতাই শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করতে হ'লে ঐ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে শিক্ষকের

জ্ঞান যত গভীর হ'বে এর প্রয়োগও ততই ঠিকমত হ'বে এবং শিশুরাও সহজে ভুল আয়ত্ত করতে পারবে। কোন ভুল পদ্ধতি শিশুর সামনে উপস্থিত করা উচিত হ'বে না। প্রথমতঃ শিশু সরঞ্জামগুলির নাম, কোনটির কি কাজ এবং কিরকমভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হয়, জিনিষের দোষ গুণ, ভাল মন্দ প্রভৃতির সহিত পরিচিত হ'তে থাকবে। কৌতূহল বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সহজ সরল প্রক্রিয়াগুলি তাদের সামনে উপস্থিত করতে হ'বে—শিশু তার স্বাভাবিক সৃজনী শক্তির দ্বারা জিনিষের যথাযথ রূপ দেবার চেষ্টা করবে। শিক্ষকের উপযুক্ত সাহায্য পেলে শিশুর উৎসাহ বর্ধিত হতে থাকবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্তে এসে যাবে। শিশুকে নিয়ে এইভাবেই কাজে অগ্রসর হ'তে হ'বে। শিশু যা করবে তা যে কাজের হ'তে পারে এবোধ বা বিশ্বাস জাগ্রত রাখতে হ'বে।

শিশু যখন তাঁত বোনা দেখবে, সুতো কাটা, পাঁজ করা প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখতে থাকবে তখন তাকে সুতো কাটতে দিলে খুসীই হ'বে। কাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত কিছু সময় সুতো কাটতে দিলে সে সুতোকাটা আয়ত্ত করতে পারবে। এইভাবে অনেক কিছু প্রক্রিয়াই তাহার বয়স, বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে শিখতে পারবে। শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ঠিকমত প্রয়োগ করা হ'লে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা কাতাই শিল্পের প্রাথমিক কাজগুলি, কার্পাস চয়ন, কার্পাস পরিষ্কার, শুখান, বীজ ছাড়ান এবং যথাস্থানে রাখা, মাপ, ওজন, সংখ্যা গণনা প্রভৃতি সমবায়ী জ্ঞানলাভ করবে। ৬ বয়সের শিশু তকলীতে সুতো কাটতে, শলা পাটাতে, তুলোর বীজ ছাড়াতে, তুলো পিঁজতে, বাঁশের ধনুকে তুনাই করতে, ধোনা-তুলো হ'তে পাঁজ করতে শিখবে এবং ঐ কাজগুলির সাহায্যে একসঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হ'বে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাতাইয়ের অন্য প্রক্রিয়াগুলি করতে সক্ষম হ'বে।

প্রথমতঃ শিশুদিগকে সুতোকাটা ও ধোনা তুলো থেকে পাঁজ করতে শিক্ষা দিতে হ'বে। শিক্ষক নিজে সুতোকাটা ও পাঁজ তৈরী দেখাতে থাকবেন। ক্রমে তা শিশুমনে সংক্রামিত হ'বে। প্রথম প্রথম শিশুকে খালি তকলী কখনও ডান হাতে, কখনও বাম হাতে ঘুরাতে দিতে হ'বে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী বা মধ্যমার সাহায্যে অভ্যাস করবে। তকলী ঘুরানোর সময়ে একদমে কতবার ঘোরে শিক্ষক এক, দুই ক'রে গুণতে থাকবেন। ঘূর্ণন বেগ একটি নির্দিষ্ট মাপে এলে ধরা যাক ১০ সেকেন্ড একদমে ঘুরাতে পারলে তাকে সুতো কাটতে শুরু করতে দেওয়া হবে। প্রথমে তকলীটি দপ্তীর উপর ঠেকিয়ে এক হাতে একটু করে পাক দেবে, আর এক হাতে একটু ক'রে টানবে এইভাবে সুরু করতে পারে। তকলীর নাটাইতে ১০ তারে এক 'কলি', ৪০ তারে ১ 'পাটী', ৮ 'পাটীতে' আধ 'শুণ্ডী', ৪ ফুটে এক 'তার' এইভাবে সুতো তুলবার নিয়ম শিক্ষা দিতে হ'বে। ফলে শিশুরা গণনা শিখতে পারবে ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য জ্ঞানও লাভ কর্তে পারবে। সরঞ্জামের নাম, মাপ, ওজন, ধাতুজ্ঞান, ভাল মন্দ বিচার, সুতার অঙ্ক, পাক, সমতা, শক্তি সম্বন্ধেও ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ করবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষের দিকে যখন তকলীতে সুতো কাটা আয়ত্তে আসবে তখন চরকা বা ধনুষ টেকোতে সুতো কাটতে শিখবে এবং বাল ধুনকীতে তুলো ধোনা অভ্যাস করতে আরম্ভ করতে পারবে বলে আশা করা যায়। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যতদূর সম্ভব বিদ্যালয় হ'তে উৎপন্ন করবার চেষ্টা করতে হ'বে। তুলো উৎপাদন, বস্ত্রবয়ন, সরঞ্জাম তৈরী প্রভৃতি কাজ বিদ্যালয়ে বা স্থানীয়ভাবে ক'রে নেওয়াই ভাল। আমরা স্বাবলম্বন বলতে শুধু আর্থিক দিকটাই ধরব না। সরঞ্জামগুলি যতদূর সম্ভব স্বল্প ব্যয়ে ও স্থানীয় উপকরণ হ'তে ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এবং যাতে তা বিজ্ঞান-সম্মত ও কলাত্মক দৃষ্টি দিয়ে প্রস্তুত করা হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হ'বে। গ্রামে সহজ-লভ্য কাঠ, বাঁশ, বেত, তালপাতা, খেজুরপাতা, খড়, ঘাস প্রভৃতির সাহায্যে আবশ্যকীয় সরঞ্জামের অনেক কিছু তৈরী করা সম্ভব। এই সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুতের মাধ্যমে আমরা শিশুদের নানাভাবে সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে পারি। সরঞ্জাম বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য সেই সম্বন্ধে বই ও পরীক্ষাকার্যের প্রয়োজন আছে মনে রাখতে হ'বে। শিক্ষকের নিজের মধ্যে জ্ঞান আহরণ ও পরীক্ষা করার মনোভাব থাকা চাই, সেটাই ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে তাদের জ্ঞানান্বেষী করতে পারবে।

কাতাই কার্যের জন্য অতি আবশ্যকীয় কতকগুলি সরঞ্জামের প্রয়োজন হ'বে; এর মধ্যে অধিকাংশগুলি স্বল্পব্যয়ে স্থানীয় চেষ্টায় উৎপন্ন হ'তে পারে। নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হ'ল:—

(১) বসবার আসন, (২) তুলো রাখবার ঝাঁপি, (৩) তকলীর বাক্স, (৪) পাঁজ জড়াবার আবরণ, (৫) দগ্তী, (৬) তুনাই, ছুরী ও ধনুক, (৭) বালধুনকী, যুদ্ধ ধুনকী ও মধ্যম ধুনকী, (৮) তুলো ধোনার চাটাই, (৯) পাঁজ পিঁড়ি ও পাঁজ কাঠি, (১০) সলাই পটরী, (১১) কেরকী, (১২) সুতা পাকানর জন্য চরকী প্রভৃতি সরঞ্জাম, (১৩) তকলী, অটেরণ, চরকা, নাটাই, (১৪) সুতো মাপার নিক্তি ওজন, (১৫) সুতোর শক্তি মাপা সরঞ্জাম, (১৬) ছুতারের যন্ত্রপাতি ১ সেট, (১৭) আসন, তোয়ালে প্রভৃতি বয়নের জন্য ছোট আসামী বা মণিপুরী তাঁত কয়েকখানা এবং ঠকঠকি তাঁত ১ খানা।

প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত সংখ্যক সরঞ্জাম সমস্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকা একান্ত দরকার। শিশুদের তুনাই, ধুনাই, সুতোকাটা প্রভৃতি প্রগতি সম্বন্ধে হিসাব ও লেখ (graph) রাখলে তাদের ক্রমোন্নতি বোঝা সহজ হ'বে। উচ্চতর শ্রেণীতে তারা উৎসাহের সঙ্গে নিজ নিজ কাজের হিসাব, ডায়েরী, প্রগতি-লেখ ও শ্রেণীর প্রগতি-লেখ রচনা করবে। উন্নতি ব্যহত হ'লে কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারে যত্নশীল হ'বে। এখানে কিভাবে হিসাব রাখতে হ'বে ও প্রগতি-লেখ তৈয়ার করতে হবে তা দেখান হ'ল। প্রতি সপ্তাহে ঘন্টায় গতি একটি ছক কাগজে চিহ্নিত ক'রে উক্ত প্রগতির একটি লেখ ও দেওয়া হ'ল। অনুরূপভাবে ওটাই, তুনাই, ধুনাই ইত্যাদিরও লেখ রাখা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষক ছাত্রদের কাজের হিসাব রাখতে পারেন। শিক্ষক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের দিয়ে এইভাবে হিসাব রাখবার আবশ্যকীয় ছক কেটে দিতে পারেন—

১। কার্পাস চয়ন হিসাব

ছাত্রের নাম .... শ্রেণী ....

ফসলের জমির পরিমাণ ....

তারিখ	চয়ন সময়	কার্পাস পরিষ্কার সময়	কার্পাসের ওজন	বিভাগ করণ		শুখানর পর ওজন	ওটাই পর প্রাপ্ত তুলার ওজন	দর	মূল্য	মন্তব্য
				উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট					

২। ওটাই (বীজ ছাড়ান)।

তারিখ	পরিষ্কার সময়	ওজন	ওটাই সময়	তুলার ওজন	বীজের ওজন	শতকরা তুলার পরিমাণ	কার্পাসের জাতি	আঁশের দৈর্ঘ্য		মন্তব্য

৩। তুনাই

তারিখ	কার্পাস ওজন	ওটাই সময়	তুনাই সময়	পাঁজ করবার সময়	পাঁজের সংখ্যা	পাঁজের ওজন	তুনাই পদ্ধতি			মন্তব্য
							ছুরী	ধনুক	পুনাই বা হাতে	

৪। ধুনাই

তারিখ	তুলার ওজন	পেঁজার সময়	পাঁজ করবার সময়	পাঁজের সংখ্যা	পাঁজের ওজন	বাছানি তুলার ওজন	ফেরৎ তুলা	অপচয়	মোট তুলার হিসাব	এক তোলায় পাঁজ সংখ্যা	গতি $\frac{১}{২}$ ঘণ্টায়	মন্তব্য

৫। সুতোকাটা

তারিখ	পাঁজের ওজন	উৎপন্ন সুতা				পাঁজ ফেরৎ	অপচয়	মোট পাঁজের হিসাব	পদ্ধতি		সুতো জড়ান		দোবটী		মন্তব্য
		সময়	গুণ্ডী	তার	ওজন				আসন	বাম বা ডান হাত	সময়	তার	সময়	গুণ্ডী	

কাতাইয়ের ক্রমোন্নতি হিসাব (প্রগতি লেখ দ্রষ্টব্য)

সপ্তাহ	সময়	তার	ঘণ্টায় গতি	মন্তব্য
১ম	২ঘণ্টা	২০	১০ তার	
২য়	৩ঘণ্টা ১৫মিঃ	৪৪	১৪ তার	
৩য়	২ঘণ্টা ৪৫মিঃ	৫০	১৮ তার	
৪থ	৩ঘণ্টা	৬৬	২১ তার	
৫ম	৩ঘণ্টা	৬৯	২৩ তার	
৬ষ্ঠ	২ঘণ্টা ৩০মিঃ	৬০	২৪ তার	
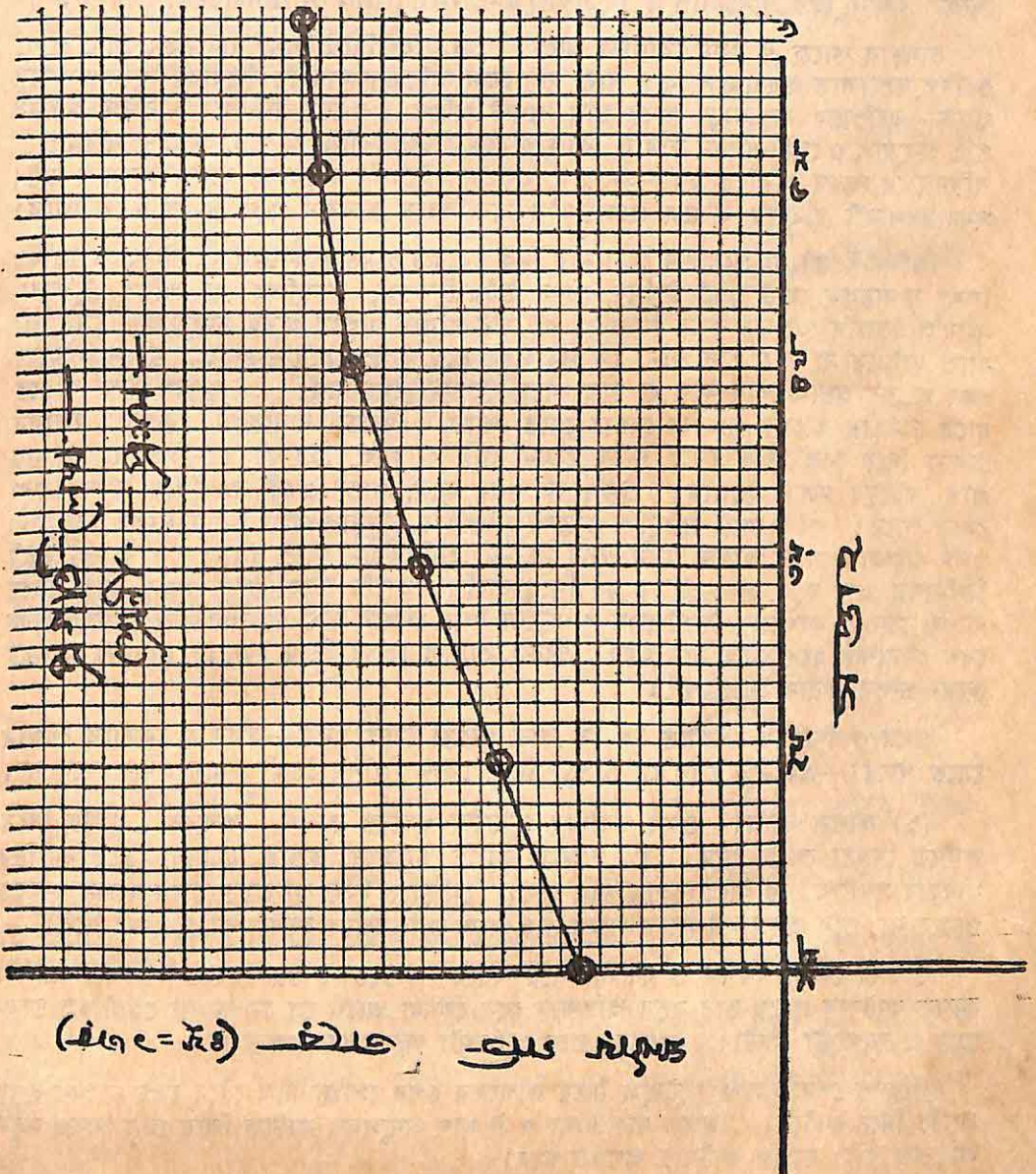
(গ) চামড়ার কাজ

প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ে চামড়ার কাজ কেন, কখন ও কেমন ক'রে শেখাব

সূচনা।—পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিশু সব সময়ে একটা কিছু করতে চায়—কাজ তার জীবনের সবচেয়ে বড় স্থান অধিকার ক'রে থাকে। নানারকম কাজের ভেতর দিয়ে সে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে। হাতে কলমে কাজ করবার ও শেখবার জন্যে তার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। কাজের ভেতর সে যথেষ্ট আনন্দ পায় এবং নিজেকে প্রকাশ ক'রতে চায়। বিশেষ ক'রে যেসব কাজে হাতিয়ার (Tools) ব্যবহার ক'রতে হয় সেসব কাজ তার কাছে আরও মনোযোগ ও আকর্ষণের বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে শিশুর জিনিষ তৈরী করবার ক্ষমতা হ'য়ে থাকে। হাতিয়ার ব্যবহার ক'রলে তার দেহের পেশীগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ (Co-ordination of muscles) হ'য়ে থাকে।

চামড়ার কাজে ঐ রকম বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে দিয়ে শিশু নানারকম জ্ঞান, গুণ, ও নিপুণতা লাভ করবার সুযোগ পায়; নানারকম হাতিয়ার ব্যবহার করবারও সুযোগ পেয়ে থাকে—হাতিয়ার নাড়াচাড়া ক'রে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বাড়ে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজের প্রতি অনুরাগ ও সৌন্দর্যজ্ঞান জন্মায় ; কাজ ক'রতে ক'রতে বিভিন্ন আকার, আয়তন, পরিমাপ ও পরিমাণের সঙ্গে পরিচিত হয়—অনুরাগ, একাগ্রতা ইত্যাদি বাড়বারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। সমবায়প্রণালী ব্যবহার ক'রলে প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ে জ্ঞানদান করা সম্ভব হ'তে পারে।

জিনিষ তৈরী বা প্রয়োজন মেটানোর দিক থেকেও চামড়ার কাজের যথেষ্ট মূল্য আছে। শিশু নানারকম ছোট ছোট জিনিষ, যেমন ইটের টুকরো, পেন্‌সিল বা খড়ির টুকরো, মার্বেল ইত্যাদি যোগাড় ক'রে জামা বা প্যান্টের পকেটে রাখতে খুবই ভালবাসে—সেগুলো যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্যে সে সব সময় যত্নে রাখতে চায়—ওগুলো রাখবার জন্যে এমন পাত্রের অভাব বোধ করে যা তার কাছে সহজেই রাখা যায়। এই অভাব পূর্ণ ক'রতে হ'লে চামড়ার কাজের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া নানারকম দরকারী জিনিষ চামড়া দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে, যেমন ব্যাগ বা থলি, চিরুণী, পেনসিল বা চশমার খাপ, বইয়ের মলাট ইত্যাদি। ঐগুলোর ওপর ফুল, পাতা এঁকে রঙ দিয়ে সুন্দর করা যেতে পারে। তবে ছোট শিশুকে প্রথমেই সত্যিকার চামড়ার কাজ করান সম্ভব হবে না। প্রথম অবস্থায় মোটা কাগজ দিয়ে ঐসব জিনিষ তৈরী করান যেতে পারে। কাগজের তৈরী জিনিষের ওপর ফুল, পাতা এঁকে রঙ দিতে পারে। কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটা, আঠা দিয়ে কাগজ জোড়া, কাগজের তৈরী লেস বা সুতো দিয়ে সেলাই করা ইত্যাদি কাজ শিশুর কাছে বেশ আনন্দের হবে ব'লে মনে হয়। এরকম কাজের ভেতর দিয়ে শিশুকে চামড়ার কাজের জন্যে প্রস্তুত করান যেতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কি কি কাজ দেওয়া যেতে পারে—কখন ও কিভাবে শেখান যেতে পারে।—এই দুই শ্রেণীতে চামড়া দিয়ে কোন জিনিষ তৈরী করান সম্ভব হবে না।

(১) **কাগজ কাটা।**—প্রথম অবস্থায় পুরানো খবরের কাগজ শিশুকে কাঁচি দিয়ে কাটতে দেওয়া যেতে পারে। সে ইচ্ছেমত কাঁচি চালিয়ে কাগজ কাটবে—এতে কাঁচির ব্যবহার সম্বন্ধে তার হাতে কলমে জ্ঞান হবে। গোড়াতে হয়ত সে সোজাভাবে কাগজ কাটতে পারবে না, তবে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষে সোজাভাবে কাগজ কাটা সম্ভব হবে।

তারপর মোটা কাগজ ও কাঁচি দিয়ে তাকে কাটতে দেওয়া যেতে পারে। এরকম কাগজ কাটবার সময়ে তার নতুন অভিজ্ঞতা হবে কেননা আগে সে যে কাগজ কেটেছিল তার-চেয়ে এ কাগজটা মোটা। এখানেও তার খানিকটা অভ্যাসের দরকার হবে।

তারপর পেন্‌সিল ও ফুটরুল দিয়ে কাগজের ওপর সোজা দাগ টেনে সেই দাগের ওপর কাঁচি দিয়ে কাটবে। সোজা দাগ টানা ও ঐ দাগ অনুসারে কাটতে গিয়ে তার আরও নতুন অভিজ্ঞতা এবং কাগজ কাটবার অভ্যাস হবে।

কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটায় খানিকটা অভ্যস্ত হলে শিশুকে একটা নির্দিষ্ট আকারের (যার নমুনা দেওয়া হবে) কাগজ সমান ক'রে কাটতে বলা যেতে পারে। এতে আকার, আয়তন ইত্যাদির সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার সুযোগ হবে। কি ক'রে একটা নির্দিষ্ট আকারের কাগজ কাটা যায় সে সম্বন্ধেও তার ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাকে এরকম কাজ করবার সুযোগ দিতে হবে।

সোজা লাইনে কাটবার অভ্যাস হবার পর শিশুকে গোলাকার, ত্রিকোণাকার ইত্যাদি কাগজ কাটতে বলা যেতে পারে।

এই ধরণের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর মাংসপেশীর সুসমঞ্জস বিকাশেও সাহায্য হবে।

(২) আঠা দিয়ে কাগজ জোড়া দেওয়া।—যে সমস্ত কাগজের টুকরো শিশু কাঁচি দিয়ে কেটেছে সেগুলো আঠা দিয়ে জুড়তে সে খুবই আনন্দ পাবে। একটা টুকরোতে সম্পূর্ণ আঠা দিয়ে আর একটা টুকরো তার ওপর ফেলে জুড়ে দিতে পারে কিংবা একটা টুকরোর তিনদিকে আঠা দিয়ে আর এক টুকরোর তিনদিক জুড়ে দিতে পারে। কাগজের ব্যাগ বা থলি তৈরী করবার সময় কাগজের তিনদিকে আঠা দিয়ে একদিক খোলা রাখা দরকার হবে—তার প্রস্তুতি এখন থেকেই হ'তে পারে।

(৩) **কাগজে ফুটো করা ও সেলাই করা।**—কাগজ বা চামড়া ফুটো করবার যন্ত্রের সঙ্গে শিশুকে প্রথমেই পরিচিত করান যেতে পারে। ফুটো করার যন্ত্র (punching machine) কি রকম তার ছবি নিচে দেওয়া হল:—
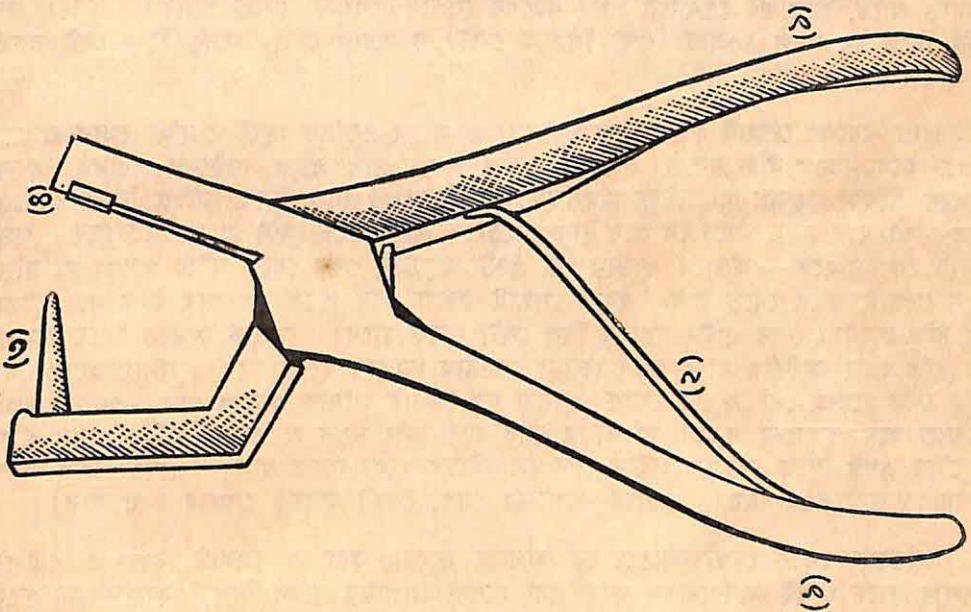
(১) হাতল—**এক হাতে দুটি হাতল একসঙ্গে চাপতে হয়**—হাতলের শেষের দিকে চাপ দিতে হয়।

(২) স্প্রিং—হাতল চেপে ছেড়ে দিলে আবার যথাস্থানে আসবার জন্যে স্প্রিংয়ের দরকার।

(৩) ব্লেড—হাতল চাপলে ব্লেডটি নিচের প্ল্যাটফর্মের সংস্পর্শে আসে এবং চামড়া বা কাগজ ফুটো হয়।

(৪) প্ল্যাটফর্ম—এর ওপর কাগজ বা চামড়া (যা ফুটো করতে হবে) রাখতে হয়। যে কাগজ বা চামড়া ফুটো করতে হবে তার নীচে অন্য মোটা কাগজ বা চামড়া দিয়ে নিতে হয়, তা না হ'লে ব্লেড প্ল্যাটফর্মের সংস্পর্শে বেশী এলে ব্লেডের ধার নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

এই যন্ত্র কিভাবে ব্যবহার করতে হয় শিক্ষক প্রথমে শিশুকে দেখিয়ে দেবেন। তারপর শিশুকে সেটা ব্যবহার করবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। শিশু নিজে কাগজ ফুটো ক'রে একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং যথেষ্ট আনন্দ পাবে। প্রথম অবস্থায় কাগজের এদিক ওদিক যেখানে ইচ্ছা শিশু ফুটো করবে—তারপর নির্দিষ্ট আকারের কাগজের টুকরোতে একের পর একটি ফুটো করতে শিশুকে বলা যেতে পারে। যাতে সোজা লাইনে একের পর একটি ফুটো ক'রে যেতে পারে সে সম্বন্ধেও তাকে বলা যেতে পারে—ফুটোগুলোর দূরত্বও যেন সমান হয় সে বিষয়েও শিশু অভ্যাস ক'রতে পারে।

এইভাবে কাগজে ফুটো করবার পর বিভিন্ন আকারের কাগজ কেটে নির্দিষ্ট স্থানে সোজা লাইনে ফুটো করতে শিশুকে দেওয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট আকারের কাগজে নির্দিষ্ট স্থানে, সোজা লাইনে ও সমান দূরত্বে ফুটো করবার অভ্যাস খানিকটা হ'লে সেলাই করা শেখান যেতে পারে।

কাগজে ফুটো করবার পর সেলাই শেখান দরকার। প্রথমে মোটা সুতো বা সরু দড়ি দিয়ে ঐ ফুটোগুলোর ভেতর দিয়ে কিভাবে সেলাই করা যায় তা শিক্ষক দেখিয়ে দেবেন। এখানে জেনে রাখা দরকার যে কলের সেলাই বা হাতে ছুঁচ দিয়ে সেলাই এবং এই রকম সেলাইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুতো বা দড়ি দিয়ে সেলাই শেখাবার পর শিশু নিজে সেলাই ক'রবে। এই রকম সেলাই করবার কাজে তার অভিজ্ঞতা হ'লে মোটা কাগজের লেস কাঁচি দিয়ে কাটান যেতে পারে। বলা বাহুল্য চামড়ার কাজে একাধিক প্রকারের সেলাইয়ের পদ্ধতি আছে, তবে এই শ্রেণীতে প্রথম ধরণের সেলাই শেখান যেতে পারে। সুতো বা দড়ি দিয়ে যে রকম সেলাই শিশু শিখবে মোটা কাগজের লেস দিয়েও ঠিক সেই রকম সেলাই শিশু ক'রবে।

প্রথম ধরণের সেলাই ক'রতে গেলে সুতো বা দড়ির একদিক ফুটোর নীচে থেকে ওপরে তুলতে হবে—আধ ইঞ্চি মত ঐ সুতো বা দড়ি ওপরে ডান ধারে লাইনের বরাবর ফেলে রাখতে হবে। সুতো বা দড়ির অন্যদিক ফুটোর ওপর দিক দিয়ে নিচের দিকে আনতে হবে—আনবার সময় ওপরে যে আধ ইঞ্চি সুতো বা দড়ি আছে সেটা চেপে দিতে হবে—এতে একটা ফোঁড় হবে—এইভাবে একটার পর একটা ফুটোর ওপর থেকে নীচে সুতো বা দড়ি এনে সেলাই ক'রে যেতে হবে—এরূপ সেলাই করলে ক্রমে পূর্বে যে আধ ইঞ্চি মত সুতো বা দড়ি ফুটোর ওপর লাইন বরাবর ছিল সেটা ঢেকে যাবে। সেলাই ক'রতে গিয়ে সুতো বা দড়ি যখন ফুরিয়ে যাবে তখন জোড়া দেওয়ার দরকার হবে। যে ফুটোতে সুতো বা দড়ি শেষ হয়েছে সেই ফুটো থেকে পূর্বের মত সেলাই আরম্ভ ক'রতে হবে—এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে পুরানো সুতো বা দড়ির শেষ অংশ এবং নতুন সুতো বা দড়ির প্রথম অংশ ফুটোর ওপর দিকে সোজা লাইনে যেন সেলাইয়ের মধ্যে ঢেকে যায়। এভাবে সেলাইয়ের সময় জোড়া দেওয়া হয়। এভাবে কাগজের লেস তৈরী ক'রেও সেলাই করা যায়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে কাগজে ফুটো করা ও সেলাই করা এ বয়সের শিশুর কাছে খুবই আনন্দদায়ক কাজ এবং যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে শিশু একাজগুলো ক'রে থাকে।

(৪) **বিভিন্ন আকারের কাগজ কাটা ও নক্সা বা ছবি আঁকা।**—প্রদত্ত নমুনা অনুসারে কাঁচি দিয়ে মোটা কাগজ নির্দিষ্ট আকারের সমান ক'রে কাটতে শিশুকে বলা যেতে পারে। কিভাবে নমুনার সমান ক'রে কাটতে হয় তাও শিশুকে শেখান দরকার—নমুনা কাগজের ওপর ফেলে কাঁচি দিয়ে কাটতে পারে কিংবা নমুনাটা মেপে নিয়ে সেই মাপ অনুযায়ী কাগজ কাটতে পারে। কাগজ কাটবার পর তার ওপর পেন্‌সিল দিয়ে নক্সা বা ছবি শিশুর পছন্দমত আঁকতে পারে—তারপর ওগুলো রঙ ক'রতে পারে। নক্সা বা ছবি রঙ করা বা রঙ দিয়ে কোন কিছু আঁকা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ব'ললেও চলে। বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন ছবি বা নক্সাতে ব্যবহার ক'রতে পারে—বিভিন্ন রঙের সঙ্গে পরিচিত হবার শিশুর সুযোগ হয়—বিভিন্ন রঙ মেশালে কি ফল হয়, কি রকম দেখতে হয় সে সম্বন্ধেও

তার অভিজ্ঞতা হয়। রঙ নিয়ে শিশু খেলা করে—রঙ বা রঙগীন জিনিষ তার কাছে খুবই আকর্ষণের বস্তু। নক্সা বা ছবিতে রঙ দিতে গিয়ে সে তার নিজের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ঐ কাজ ক'রতে সে উৎসাহিত হবে। বলা বাহুল্য এই বয়সের শিশুর জন্য নক্সা বা ছবি সরল ও স্বাভাবিক ধরণের হবে। এরকম কাজ ক'রতে ক'রতে সৃষ্টির আনন্দে সে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে। কোন রঙ কোথায় দিলে তার নক্সা বা ছবি কেমন দেখাবে সে সম্বন্ধেও সে পরীক্ষা ক'রবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ ক'রবে। এসময় অন্য শিশুর আঁকা নক্সা বা ছবির সঙ্গে তার নিজের কাজের তুলনা ক'রবে এবং সে তার নিজের কাজে যদি কোন ত্রুটি লক্ষ্য করে তা সংশোধন ক'রতে চেষ্টা ক'রবে। অনেক সময় নিজের কাজ নিজে দেখেও সংশোধনের চেষ্টা ক'রে থাকে। অন্যের কাজ দেখে সে উৎসাহিত হবে—নিজের কাজের উন্নতি ক'রতে চেষ্টা ক'রবে। সৃষ্টিমূলক বা সৃজনাত্মক কাজের বৈশিষ্ট্য এখানেই দেখা যাবে।

প্রয়োজনবোধে শিক্ষক নক্সা ও ছবি এঁকে দিতে পারেন—শিশু তার ওপর রঙ দিতে পারে। তা হ'লেও শিশুর সৌন্দর্যানুভূতি ও কাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরিপুষ্টিলাভ করবার সুযোগ পাবে।

(৫) **কাগজের ব্যাগ বা থলি তৈরী।**—কাগজের একটা ব্যাগ বা থলির নমুনা শিক্ষক শিশুর কাছে উপস্থিত ক'রবেন। ঐ নমুনা অনুসারে শিশুকে ব্যাগ বা থলি তৈরী ক'রতে বলা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নমুনাটি যেন খুব সহজ হয়। প্রথমে শিশু নমুনাটী হাতে নিয়ে দেখবে কোথায় কি আছে এবং কিভাবে তৈরী করা হয়েছে। তারপর ঐ নমুনাটির চারদিকের পরিমাপ (আঙ্গুলের বা ফুটরুলের সাহায্যে) নিতে চেষ্টা ক'রবে কিংবা মোটা কাগজের ওপর নমুনাটি ফেলে পেন্‌সিল দিয়ে চারদিকে দাগ দেবে।

ব্যাগ বা থলির জন্য দুই টুকরো কাগজের প্রয়োজন হয়—একটি বড় আর একটি ছোট। বড় কাগজটি ওপরের দিকে কতকটা বাড়তি থাকে যাতে ভাঁজ ক'রে ব্যাগ বা থলিটা বন্ধ করা যায়—ছোট কাগজটি পকেটের কাজ করবে। ঐ রকম দুটো কাগজ শিশু কাটবে—দেখতে হবে চারদিক যেন সমান হয়।
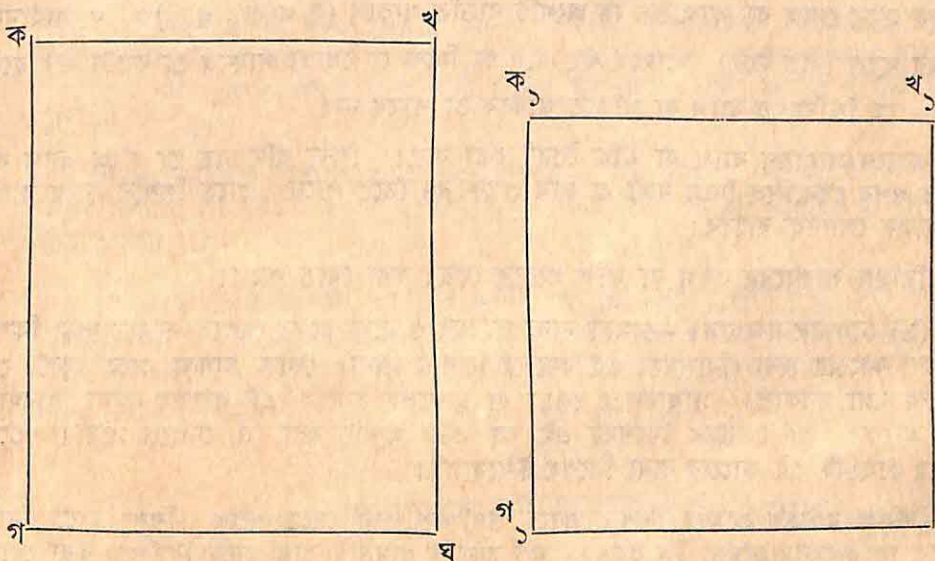
দুটো কাগজ এমনভাবে কাটতে হবে যাতে চওড়া সমান থাকে—লম্বা বড় ও ছোট হবে। বড় কাগজের ওপর ছোট কাগজ এমনভাবে বসাতে হবে যাতে গ ঘ এর ওপর গ১ ঘ১ সমানভাবে পড়ে। ছোট কাগজের তিনদিকে (ক১ গ১, গ১ ঘ১ ও খ১ ঘ১) ½ ইঞ্চি জায়গায় আঠা দিতে হবে—ওপর দিক (ক১ খ১) খোলা থাকবে সুতরাং আঠা দিতে হবে না। আঠা দিয়ে লাগাবার পর ব্যাগ বা থলির চেহারা কেমন হবে নিচে দেখান গেল ঃ—
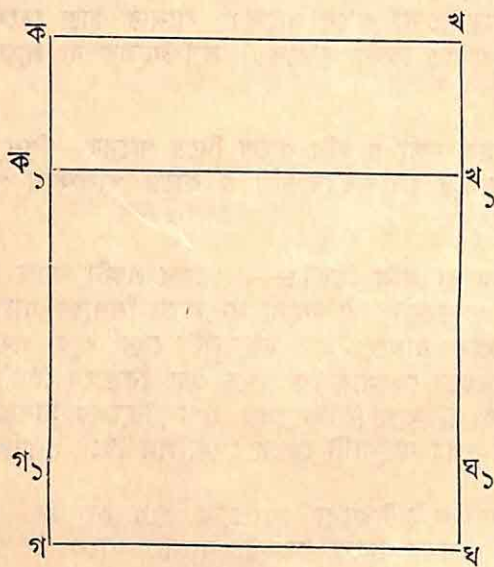
আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়ার পর ফুটো করবার যন্ত্র দিয়ে চারদিকে সোজা লাইনে ও সমান দূরত্বে ফুটো ক'রতে হবে। ফুটো করবার পর কাগজের লেস্ কেটে সেলাই ক'রতে হবে। সেলাই হ'য়ে গেলে বড় কাগজের যে অংশটি বাড়তি থাকবে (ক খ ক১ খ১)ক১ খ১ লাইনের বরাবর মুড়ে দিতে হবে। তাহলে ক১ খ১ এর দিকে যে খোলা থাকবে তা কতটা বন্ধ হয়ে যাবে—যে জিনিষপত্র ব্যাগ বা থলিতে থাকবে তা পড়বে না।

এভাবে সাধারণ ব্যাগ বা থলি তৈরী করা যায়। শিশু যদি চায় তা হ'লে ব্যাগ বা থলির ওপর পেন্‌সিল দিয়ে নক্সা বা ছবি এঁকে রঙ দিতে পারে—তাতে শিশুর কাছে ব্যাগ বা থলির সৌন্দর্য বাড়বে।

বিভিন্ন আকারের ব্যাগ বা থলি এভাবে তৈরী করা যেতে পারে।

(৬) **চামড়ার ব্যবহার।**—চামড়া নানা রকমের ও নানা রঙের দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু চামড়ার কাজের জন্য (বিশেষতঃ এই বয়সের শিশুর জন্য) কোন চামড়া সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্বন্ধে বলা দরকার। সাধারণতঃ ভেড়া বা ছাগলের চামড়া এই কাজের জন্য ব্যবহার হ'য়ে থাকে। এই চামড়ার বিশেষত্ব এই যে এটা খুবই নরম ও দেখতে সাদা। তবে ভেড়ার চামড়াই এই কাজের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বিভিন্ন রকমের চামড়া শিশুর কাছে উপস্থিত করা যেতে পারে—শিশু হাতে নিয়ে দেখতে পারে কোন চামড়া কি রকম। যত রকমের চামড়াই তার কাছে উপস্থিত করা হোক না কেন চামড়ার একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য সে লক্ষ্য করবে—চামড়ার দুই পিঠের মধ্যে একপিঠ খুবই মসৃণ আর এক পিঠ খসখসে। মসৃণ পিঠটা লোমের দিক (Hair-side)

ও খসখসে পিঠটা মাংসের দিক (Flesh-side)। শিশু বিভিন্ন চামড়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে চামড়ার পার্থক্য বুঝতে পারবে। মোটা চামড়া কাটা বা তাতে কোন কাজ করা এই বয়সের শিশুর পক্ষে কঠিন। তাছাড়া চামড়ার ওপর কোন কাজ ক'রতে গেলে চামড়াটা সাদা হ'লে ভাল হয়। বাজারে যেসব চামড়া কিনতে পাওয়া যায় তার অধিকাংশই রঙগীন এবং মোটা। এসব কারণেই ভেড়া বা ছাগলের চামড়া এই কাজের উপযোগী হবে।

চামড়ার সঙ্গে শিশুর পরিচয়ের বেলায় সমবায় প্রণালীর সাহায্যে শিশুকে ভেড়া বা ছাগল সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানদান করা যেতে পারে। অবশ্য এই বয়সের শিশু প্রায় প্রত্যেকেই ভেড়া বা ছাগল দেখেছে এবং ওগুলো সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতাও শিশুর থাকা সম্ভব। শিশুর বয়স ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী সমবায় প্রণালীর ব্যবহার ক'রতে হবে —এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যে জ্ঞান লাভ করবে তা যেন স্বাভাবিকভাবে আসে। ভেড়া বা ছাগল থেকে কি উপায়ে চামড়া কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয় সে বিষয়ে এই বয়সের শিশুকে বোঝান সম্ভব হবে না।

চামড়ার কাজ ক'রতে হ'লে কিভাবে চামড়া কাজের উপযোগী ক'রতে হয় তা শিশুকে দেখান যেতে পারে। কেন এইরকম করা দরকার তাও শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। দোকান থেকে যখন চামড়া কিনে আনা হয় তাতে ময়লার দাগ, কাটার দাগ, ভাঁজ ইত্যাদি থাকে; ওগুলো প্রথমে দূর করা দরকার।

প্রথমে তুলো বা নরম কাপড়ের টুকরো ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলে (জলের সঙ্গে একটু Oxalic acid মিশিয়ে নিলে আরও ভাল হয়) ভিজিয়ে চামড়ার মসৃন পিঠ বেশ ভাল ক'রে ঘসতে হবে। যখন চামড়ার সমস্ত অংশ ঘসা হ'য়ে যায় তখন কাঠের বেলুন দিয়ে রুটী বেলার মত নিচ থেকে ওপর ও ওপর থেকে নিচে এইভাবে চামড়ার চারদিক বেলতে হয়। যত বেলা হবে ততই চামড়ার মসৃণ পিঠ থেকে ময়লা, কাটার দাগ, ভাঁজ ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে—চামড়ার ওপর মসৃণ পিঠটা আরও মসৃণ হবে এবং কাজের উপযোগী হবে। চামড়ার কাজ ক'রতে গেলে সর্বপ্রথম এই কাজ ক'রতে হয়।

(৭) **চামড়া কাটা ও ফুটো করা।**—কাঁচির সাহায্যে শিশুকে চামড়া কাটতে দেওয়া যেতে পারে। কাগজ কাটবার সময় শিশু যে যে নিয়ম পালন ক'রেছিল চামড়ার বেলায়ও সেই সব নিয়ম তাকে পালন করতে হবে। বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের সমান ক'রে চামড়া শিশুকে কাটতে দেওয়া যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে ভেড়ার চামড়া খুবই নরম এবং এই বয়সের শিশুর পক্ষে কাটা কঠিন হবে না। শিশু আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এই কাজ ক'রবে।

চামড়া কাটবার অভ্যাস হবার পর চামড়া ফুটো করবার যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ায় ফুটো ক'রতে শিখবে। কাগজ ফুটো করবার সময় শিশু যা যা করেছিল চামড়ার বেলায়ও তাই ক'রতে হবে।

(৮) **চামড়ার ওপর নক্সা বা ছবি আঁকা ও রঙ করা।**—নির্দিষ্ট আকারের চামড়া কাটবার পর পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী চামড়া পরিষ্কার ও মসৃণ ক'রতে হবে। চামড়ার ওপর নক্সা বা ছবি আঁকা ও স্পষ্ট করবার জন্য একটি যন্ত্রের দরকার। সেই যন্ত্রের ছবি নীচে দেওয়া হল :—
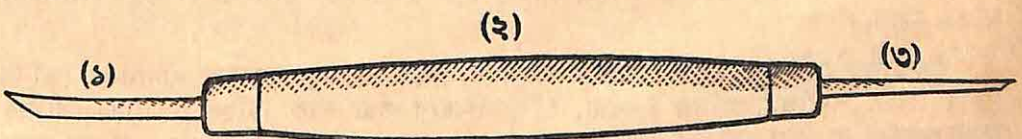
(১) মডেলার। (২) কাঠের হাতল। (৩) ট্রেসার।

চামড়ার ওপর শিশু যদি একবারে নক্সা বা ছবি আঁকতে চায় তবে ট্রেসারের সাহায্যে চামড়ার ওপর দাগ দিতে পারে। কাগজে পেনসিলের যে কাজ চামড়ায় ট্রেসারের সেই কাজ। চামড়ার ওপর পেন্‌সিলের দাগ দেওয়া উচিত হবে না কেননা সে দাগ আর উঠবে না। রঙ করবার সময় পেনসিলের দাগ সমস্ত ছবিটাকে বিকৃত ক'রতে পারে। প্রথম অবস্থায় শিশু ট্রেসারের দ্বারা চামড়ার ওপর তার ইচ্ছামত ছবি আঁকতে পারে। ছবি আঁকার পর মডেলারের সাহায্যে ছবিটা আরও স্পষ্ট করতে পারে—ট্রেসার দিয়ে যে লাইনগুলো চামড়ার ওপর দেওয়া হয়েছে ঐ লাইনগুলোর ওপর মডেলারের সরু দিক দিয়ে (বাঁ দিক থেকে ডান দিকে) লাইনগুলো আরও স্পষ্ট ক'রতে হবে। ছবিতে যে দিকটা একটু নামিয়ে দেওয়া দরকার সে দিকটা মডেলারের চ্যাপটা দিক দিয়ে চেপে দিতে হবে। তা হ'লে ছবিটা বেশ ফুটে উঠবে।

এইভাবে ছবি চামড়ার ওপর তোলার পর রঙ দেওয়ার কাজ ক'রতে হবে। বিভিন্ন রঙ ব্যবহার ক'রলে কি রকম ফল (effect) হয় শিশু আগেই তার অভিজ্ঞতা থেকে লাভ ক'রছে। কাগজে রঙ করবার সময় রঙের গুঁড়ো জল দিয়ে গুলে নিয়েছে, কিন্তু চামড়াতে রঙ করবার সময় রঙের গুঁড়ো জল দিয়ে গুললে হবে না। চামড়ায় রঙ করবার জন্য ভিন্ন রঙ আছে—তাকে spirit stain বলা হয়। ঐ রঙের গুঁড়ো মেথিলেটেড স্পিরিট (methylated spirit)এ গুলতে হয়—স্পিরিটে গোলা রঙ চামড়াকে খুব সুন্দর ও উজ্জ্বল করে। রঙ যত উজ্জ্বল হবে শিশু ততই আকৃষ্ট হবে এবং রঙের ফল সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা ততই বাড়বে। শিশু চামড়ার ওপর ছবি আঁকবে ও রঙ দেবে।

একটা ছোট মাটির পাত্রে (যেটা খুব ভাল ক'রে পোড়ান ও মসৃণ হবে) সামান্য রঙের গুঁড়ো দিয়ে তাতে স্পিরিট মেশাতে হয়। রঙ গোলা হ'য়ে গেলে নরম সাদা কাপড়ের টুকরো দিয়ে তুলি বানিয়ে গোলা রঙের মধ্যে ডুবিয়ে চামড়ার উপর যে ছবি আছে তাতে রঙ দিতে হয়। রঙ দেওয়ার কাজটা একটু তাড়াতাড়ি না করলে স্পিরিটটা উড়ে যাবে, আবার স্পিরিট মেশাতে হবে। রঙ করার সঙেগ সঙেগ অবশ্য ছবির রঙ শুকিয়ে যাবে। ছবিতে রঙ দেওয়া হ'য়ে গেলে কাঁচের কাগজ-চাপা (Glass paper weight) দিয়ে রঙ করা ছবিটা এবং তার আসেপাশের স্থান (যা রঙ করা হয়েছে) বেশ ভাল ক'রে ঘসতে হবে—কাঁচের কাগজ-চাপার গোল মসৃণ দিক দিয়ে ঘসতে হয়। ঘসা হ'লে পর চামড়ার ওপর ছবিটা খুব চকচকে দেখাবে।

(৯) **পাঠটীকার নমুনা—চামড়ার কাজের মাধ্যমে সমবায় প্রণালীতে শিক্ষাদান—**

পাঠটীকা।—শ্রেণী—দ্বিতীয়। বয়স—৭-৮ বৎসর। বিষয়—কাগজের ব্যাগ বা থলি তৈরী। সময়—৩ দিন (প্রত্যহ ৩০ মিনিট)।

উদ্দেশ্য।—(এই বয়সের শিশুদের পক্ষে সত্যিকার চামড়ার কাজ সম্ভব হবে না—কাগজ দিয়েই জিনিষ তৈরী ক'রতে পারে এবং তাতে চামড়ার কাজের জন্য শিশুকে প্রস্তুত করান যেতে পারে।)

এই কাজ ক'রতে গিয়ে শিশু বিভিন্ন বিষয়ের সঙেগ পরিচিত হবে এবং কোন কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ (যেমন পঠন, লিখন ও গণিত) করবার সুযোগ পাবে। এছাড়া সৃজনাত্মক কাজ ক'রে শিশু আনন্দ পাবে এবং হাতের কাজের প্রতি তার আগ্রহও বাড়বে।

উপকরণ।—মোটা কাগজ, কাঁচি, আঠা, ফুট রুল, রঙ, তুলি ও কাগজের ব্যাগ বা থলির নমুনা।

উপস্থাপন ও অনুশীলন।—শিক্ষক শিশুদের বলতে পারেন, "তোমরা নানারকম জিনিষ (ছোট শ্লেট পেন্‌সিল, খড়ির টুকরো, ছবি, ব্যবহার করা ডাক টিকিট ইত্যাদি) যোগাড় ক'রে পকেটে বা অন্য কোন জায়গায় রেখে থাক—এতে অনেক সময় ওগুলো হারিয়ে যেতে পারে। যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করতে পারি? আমরা এমন

ব্যবস্থা করতে পারি যাতে জিনিষগুলো সঙ্গে রাখা সম্ভব হয়।" এই জাতীয় কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শিশুদের কাছ থেকে ব্যাগ বা থলির প্রস্তাব আসতে পারে। যদি শিশুদের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব না আসে তা হ'লে শিক্ষক কাগজের ব্যাগ বা থলির কথা উত্থাপন করতে পারেন এবং কাগজের ব্যাগের নমুনাটা শিশুদের দেখাতে পারেন। এই সময় শিশুরা নমুনাটা নিয়ে দেখতে পারে কিভাবে এটা তৈরী হয়েছে। নমুনা দেখবার পর শিশুদের এরকম একটা ব্যাগ তৈরী করবার আগ্রহ হতে পারে। এখন শিক্ষক শিশুদের ব্যাগ তৈরী করতে বলতে পারেন। শিশুরা ব্যাগ তৈরী করবে। (ব্যাগ তৈরী করবার নিয়ম পূর্বে বলা হয়েছে—শিক্ষক সেই অনুযায়ী সাহায্য করবেন।)

শিশু যখন কাজ করছে শিক্ষক তখন লক্ষ্য রাখবেন ব্যাগের আকার, আয়তন ও পরিমাপের সঙ্গে শিশু যেন হাতে-কলমে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এইভাবে শিশু গণিত সম্বন্ধে খানিকটা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবে। শিশু কতক্ষণ বা কতদিন কাজ ক'রে ব্যাগ তৈরী ক'রল তা থেকে সে গণিতের জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

কাজ করতে করতে শিশু যেসব অসুবিধা বোধ ক'রল সেগুলোর সমাধানের দ্বারাও শিশুর অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তার কাজের হিসেব রাখবার জন্যে পঠন ও লিখনের প্রয়োজন হবে। শিশু কিভাবে কাজ ক'রল তা বলতে গিয়ে সে তার প্রকাশ করবার ক্ষমতার পরিচয় দেবে এবং কতকগুলো নতুন শব্দ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিখবে। শিশু যা বলবে তা লিখবে; এতে তার পঠন ও লিখন অভ্যাস হবে।

ব্যাগটি সাজাতে গেলে শিশু তার ওপর ছবি আঁকবে ও রঙ করবে। এই কাজ করতে গিয়ে শিশুর সৌন্দর্যজ্ঞান বাড়বে ও কাজটি যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় সেদিকেও সে লক্ষ্য রাখবে।

(ঘ) হাতে তৈরী কাগজ-শিল্প

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতে তৈরী কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা রাখতে পারলে ভাল হয়। কাগজ শিল্প শিশুদের পক্ষে খুব জটিলও নয় আর শিশুরা কাগজের ব্যবহার অনবরতই দেখছে ও করছে ব'লে এতে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহও আছে। আমাদের দেশে আগে অনেক গ্রাম্য কারীগর এই শিল্পে বেশ পটু ছিল। এখনও হুগলী, হাবড়া, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা জেলায় কাগজী সম্প্রদায় আছে। তবে তারা ক্রমেই ধ্বংস হ'চ্ছে। অথচ ইউরোপের মত যন্ত্র-সভ্যতার দেশে আজও হাতে কাগজ প্রস্তুত শিল্প টিঁকে রয়েছে। গ্রাম্য সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে গেলে এইসব লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্পগুলির পুনঃপ্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। এগুলির দ্বারা গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতিই শুধু হ'বে না, তারা শিক্ষার সুযোগও যথেষ্ট পাবে; কারণ গণশিক্ষা শুধু পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়া শিক্ষার প্রচলন সহায়ে ঘটে না—শিল্প প্রচেষ্টা দ্বারাই সর্বাঙ্গীণ গণশিক্ষা ঘটতে পারে। মিলে প্রস্তুত কাগজের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও হাতে প্রস্তুত কাগজ টিঁক্‌তে পারে, কারণ কতকগুলি বিশেষ কাগজ হাতেই ভাল প্রস্তুত হয়—যেমন আর্ট কাগজ। ব্লটিং কাগজও হাতে বেশ সস্তাতে প্রস্তুত করা যায়—সাইজিং দরকার হয় না ব'লে এর উৎপাদন ব্যয়ও কম পড়ে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে কাগজ প্রস্তুত হ'বে তা বিক্রি করবার জন্য চিন্তা করতে হ'বে না, কারণ বিদ্যালয়ের কাজেই যথেষ্ট কাগজের প্রয়োজন ঘটবে।

বিদ্যালয়ের জন্য এই শিল্প-ব্যবস্থার যতদূর সম্ভব সাধারণ আসবাব ও গ্রাম্য উপকরণ ব্যবস্থা করাই ভালো। নিম্নলিখিত উপকরণগুলি হ'লে মোটামুটি কাজ চলতে পারে :—

(১) উপকরণগুলি সাফ করা ও ভিজানো—মণ্ড গোলা (বিটার) ও পাম্প হ'তে কাগজ তুলবার জন্য চারটা মাঝারি চৌবাচ্ছা বা লোহার পিপে।

(২) উপকরণগুলি কোটার জন্য ঢেঁকি বা হামানদিস্তা।

(৩) মণ্ড প্রস্তুতের জন্য ড্রাম অভাবে ঢাক্‌নাযুক্ত কড়াই ও চুল্লী।

(৪) মণ্ড ঘুঁটবার জন্য মন্থনী।

(৫) কাগজ তুলবার জন্য জালিযুক্ত ফ্রেম।

(৬) কাগজ ছাঁকার জন্য পাতলা অথচ সমান বোনা বস্ত্রখণ্ড—অনেকগুলি।

(৭) চাপ দিয়ে জল ঝরাবার জন্য প্রেসার, অভাবে ওজন ও দুটী শক্ত লোহার প্লেট।

(৮) পালিশ করার জন্য রোলার, অভাবে পাথরের শ্লেট ও শামুক বা শাঁখ।

(৯) শুকাবার জন্য নিচু দেওয়াল বা টিনের পাত।

উপকরণ।—(ক) ছেঁড়া কাগজ, তুলা, সুতা, উলো জাতীয় শুকনা ঘাস, পাট, সরু ক'রে চেরা, বাঁশের (ব্যবহৃত) খাদি ইত্যাদি।

(খ) কাপড় কাচা সোডা, ক্ষার, রোজিন, সাবান, কষ্টিক সোডা, অভাবে চূণ ও সোডা, রঞ্জক দ্রব্য প্রভৃতি রসায়নিক দ্রব্য—সাইজিং করার জন্য (ছিদ্রহীন করার জন্য) গ্লু, অভাবে আতপ চালের গুঁড়ি বা এরারুট।

(গ) কাটবার জন্য ছুরি, কাঁচি।

বিভিন্ন বয়সের শিশুরা একত্রে এই শিল্পটী সম্পন্ন করবে। তাদের বয়স ও যোগ্যতা-ভেদে কাজ বেছে দিতে হ'বে। নিচে তার কিছু ইঙ্গিত দেওয়া গেল। এ ব্যাপারে শিশুদের ক্ষমতা, মানসিক আগ্রহ ও শিক্ষার সুবিধা দেখা হ'য়েছে ঃ—

(১) **উপাদান সংগ্রহ।**—এই কাজটী ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুদের উপযোগী। সাফাই কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে এই কাজটি করানো যায়। এ হ'তে তারা নানা জিনিষের নাম শিখবে—সংখ্যা গণনা ও ওজন করা শিখবে ও হিসাব রাখার প্রয়োজনের সম্মুখীন হ'বে—এই কাজ করার সময় পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যাপারে সাবধান হ'তে শিখবে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে অকেজো জিনিষকে প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে শিখবে।

(২) **ভিজে কাগজ শুকানো।**—নিচু দেওয়ালে বা করোগেট টিনের পাতে কাপড়ের ন্যাকড়া সমেত (অথবা ছাড়ানো) কাগজগুলি শুকানো ও শুকানোর পর সংগ্রহ ক'রে সাইজিং জন্য দেওয়ার কাজ ১ম হ'তে ৩য় শ্রেণীর শিশুরা ভালই পারবে। এর মধ্যে তারা গুণতে শিখবে, গুছাতে শিখবে—শ্রেণীবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখবে। একটা দেওয়ালে কটা কাগজ ধরবে তার হিসাব করাও শিখবে—দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি সম্বন্ধে ধারণা হ'বে। কখন সূর্য আকাশের কোন দিকে থাকে, গ্রীষ্ম ও শীতকালে তার গতিপথের কিরূপ পার্থক্য হয় ইত্যাদি তারা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে—বিভিন্ন ঋতুতে বাতাসের ভিজা ও শুকনা ভাব (বায়ুর আর্দ্রতা) প্রভৃতি লক্ষ্য করবে—ঋতু পরিবর্তনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ হ'য়ে যাবে।

(৩) **কাগজ সাইজিং ও পালিশ করা।**—একাজও ২য়, ৩য় শ্রেণীর উপযোগী। তারা প্রস্তর শ্লেটে রেখে আতপ চালের গুঁড়ি ছড়িয়ে শাঁকের সাহায্যে ঘসে একাজ করতে পারবে। শাঁক বা শামুক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগবে—সামুদ্রিক জীবের কথা জানবে; মসৃণ ও অমসৃণ এর পার্থক্য বুঝতে পারবে। তাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রখরতা ঘটবে।

(৪) **খাতা, খাম, চিঠির প্যাড, ঘুড়ি প্রভৃতি তৈরী।**—একাজগুলিও ২য়, তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে বেশ উপযোগী। অবশ্য আরও বড়দের সহায়তায় করলে নষ্ট হবার ভয় কম থাকে। কাজগুলি আনন্দদায়কও বটে—হিসাব করার সুযোগও যথেষ্ট হয় আর রঙিন কাগজের ব্যবহার দ্বারা রঙ চিনতে শেখে—শিল্পবোধ হয়। গণনা ও হিসাব করতেও শেখে। রঙিন কাগজ করার জন্য রঙ নির্বাচন, মিশ্র রঙ প্রস্তুত প্রভৃতি কাজে এইরূপ ছোট শিশুদের সহায়তা নেওয়া ভালো—তাতে তারা আনন্দ পায় আর রঙ চিনতে ও মিশ্র রঙ করতে শেখে।

এছাড়া অন্য কাজগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা করবে—অবশ্য ছোটরাও অংশ নিতে পারে তাদের কাজে।

কাগজ শিল্প মাধ্যমে কাগজের গল্প, কি ক'রে মানুষ প্রথমে লিখতে শেখে, কেমন ক'রে অক্ষর ও ভাষার জন্ম হয় প্রভৃতি বিষয়ে কৌতুহল জাগিয়ে প্রাচীন মানুষের ইতিহাস এবং কাগজ শিল্পের বর্তমান অবস্থার সঙেগ পরিচিত করতে গিয়ে ভূগোল শেখানো যায়।

(ঙ) মাটির কাজ

সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে বোধ হয় শিশুদের সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করে মাটির কাজ। সকলেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে শিশু কাদা ও বালি নিয়ে খেলা করতে কি রকম আনন্দ পায়। মাটি, কাদা বা বালি হাতে ক'রে চট্‌কিয়ে তারা সর্বদাই কিছু একটা গড়তে চেষ্টা করে। তারা শুধু রূপ দিতেই যে আনন্দ পায় তা নয়, পরন্তু তার মধ্যে যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের(haptic feeling)আনন্দ আছে তাও তাদের বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট করে। কেননা শিশুরা জন্মাবধি সবগুলি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পৃথিবীতে বুঝতে ও জানতে চায় এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বদাই সক্রিয় রাখতে চায়। বস্তু হিসাবে শিশুদের কাছে ইহার আকর্ষণের আর একটা দিক আছে। তা হচ্ছে শিশুরা ভাঙগা-গড়ার পক্ষপাতী। সুতরাং সেদিক দিয়ে মাটির তুল্য বস্তু বোধ করি সংসারে আর নেই। শিশুরা যখন মাটি নিয়ে খেলা করে তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তারা বারবার গড়ছে আর তা ভেঙেগ ফেলছে।

যেমন ছবি আঁকার বেলায় খুব কম বয়সের শিশুরা (২ অথবা ২½ বৎসর বয়সের) প্রথমে কোন একটা নির্দিষ্ট জিনিষ আঁকে না, শুধু হিজি-বিজি এঁকেই তৃপ্ত হয়, তেমনি মাটির কাজের বেলায়ও প্রথম প্রথম শুধু চটকিয়ে বা এবড়ো থেবড়োভাবে মাটিকে রূপ দিয়েই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু বয়সের সঙেগ সঙেগ তা একটা বিশেষ রূপ নেয়। তখন তারা একটা জিনিষের অনুকরণে গড়ার চেষ্টা করে, যেমন কোন জন্তু, পাখী বা মানুষ। ঘটি, থালা, গ্লাস ইত্যাদিও করতে তারা ভালবাসে।

পদ্ধতি।—অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজের বেলায় শিশুকে যেভাবে পরিচালিত করতে হবে মাটির কাজেও শিশুকে সেভাবেই পরিচালিত করতে হবে। যতদূর সম্ভব শিশুরা নিজেরাই নিজেদের কাজ পরিচালনা করবে, তবে সত্যই যেখানে শিশুরা নিজেদের সকল চেষ্টা প্রয়োগ করেও পারছে না সেখানে শিক্ষক সাহায্য করবেন।

সরঞ্জাম।—সরঞ্জাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নাই, কারণ মাটি প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়; তবে এ কাজের জন্য সবচেয়ে ভাল মাটি হল এঁটেল মাটি অথবা নদীর তলের বা পুকুরের তলের মাটি। মাটিগুলোকে বেশ ভাল ক'রে মেখে ভিজে চট বা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিলে ভাল হয়। এতে তা সব সময়ে ভিজে থাকে এবং কাজের উপযোগী থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(ক) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি গৃহসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান; সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থালি করতে হলে যে সকল বিষয়ে জানা এবং যে সকল কর্তব্য পালন করা উচিত সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা ও যুক্তিদ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাতে নবম ও দশম শ্রেণীতে কেবল মেয়েরা গণিতের পরিবর্তে অন্যতম বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের এই সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নাই।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধটি অতি নিকট। শিশুকাল থেকেই বালকবালিকাদের অতি প্রয়োজনীয় এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে তাদের বুদ্ধির বিকাশলাভের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় না বলেই তারা বয়সকালে জীবনের পরীক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারে না। তবে, এ সম্বন্ধে একটি কথা প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন। কথাটি এই যে, বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে যে পদ্ধতিতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য ঠিক সেই প্রণালী প্রয়োগ করা যেতে পারে না। ছোট শিশুদের জীবন এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বাস্তব এবং "সক্রিয়" পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাদের এই শিক্ষা দিতে হবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে সুস্থ ও সবল শিশুরা চঞ্চল হয় এবং খেলা করতে ভালবাসে —বিশেষতঃ সেইসব খেলা যার মধ্যে যথেষ্ট অঙ্গচালনার প্রয়োজন হয়। প্রথম শ্রেণীর শিশুদের এই "খেলা পদ্ধতির" দ্বারাই অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শিশুদের কাছে খেলা এবং কাজের মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না। সুতরাং খেলাচ্ছলে কাজ ও কাজের ছলে খেলা করে' তারাও আনন্দ লাভ করে এবং সেই সুযোগে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণও তাদের শিক্ষা দিতে পারেন। অবশ্য, সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে যে সকল কাজ শিশুরা করবে, সেগুলি যেন তাদের বয়সের পক্ষে অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য না হয়, অথবা তাদের শারীরিক কি মানসিক কোনও রকম ক্ষতি যেন না হয়।

শারীরিক ক্ষতি কেমনভাবে হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একটি ছোট শিশুকে যদি একটি সূক্ষ্ম ছুঁচে সুতো পরাতে দেওয়া হয়, তাহলে তার চোখের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে কারণ তখনও তার চোখের পেশীগুলির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নি। তেমনি, যে কাজ শিশুর সাধ্যের অতীত, সে কাজ করতে বারবার চেষ্টা করলে এবং ক্রমাগত বিফল হলে শিশুর মানসিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। বারম্বার ভগ্নোৎসাহ হয়ে শিশুরা ক্রমে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং পরে কোনও কাজ করতে অগ্রসর হ'তে দ্বিধা বোধ করে।

এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে বালকদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার কোনও সার্থকতা আছে কিনা। অনেকে মনে করেন যে বালিকারাই যখন উত্তরকালে বধূরূপে ও গৃহিণীরূপে নিজ নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠালাভ করবে, তখন কত সুন্দরভাবে ও কত অল্প আয়াসে ও অর্থে

সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যায় সে বিষয়ে পারদর্শিতালাভ করবার জন্য এই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কেবলমাত্র বালিকাদেরই শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু, গৃহসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ থাকলে নরনারী নির্বিশেষে কোনও মানুষেরই শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা যায় না।

তাছাড়া, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র গৃহস্থালির কাজে সুনিপুণ করে তোলে তাই নয়—এর আর একটি দিক আছে—সেটি হল সৌন্দর্যবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান এবং সুরুচির বিকাশ। সুতরাং বর্তমান বালক, উত্তরকালে যে গৃহকর্তার আসন গ্রহণ ক'রবে, ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে যে সমাজদেহকে সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে' তুলবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তার পক্ষেও এই বিষয়টি অবশ্য শিক্ষণীয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, যে, প্রথম শ্রেণীতে প্রধানতঃ সৃজনাত্মক খেলা এবং কল্পিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ভাল। এই সময়ে তাদের কোনও পাঠ্যপুস্তক দেবার প্রয়োজন নাই। হাতের কাজ এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়েই শিশুরা ক্রমে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকবে। শিশুরা যতই বড় হতে থাকবে, এই সকল আলোচনার মধ্য দিয়েই ক্রমে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি শিক্ষা দেওয়া যাবে।

শিশুচিত্তাকর্ষক এমন কয়েকটি খেলা ও কাজ, যার মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শেখানো যেতে পারে, তার তালিকা দেওয়া হলঃ—

১। **খেলা।**—(ক) পুতুলের বাড়ীঃ এই গৃহটি এতখানি বড় হওয়া প্রয়োজন, যাতে এর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ পুতুল পরিবার স্বচ্ছন্দে এবং অনায়াসে বাস করতে পারে, এমন কি ছোট শিশুরাও তার মধ্যে ঢুকে খেলা করতে পারে। পুতুলের বাড়ীর পরিকল্পনা থেকে সুরু করে' তার সাজানো, গোছানো আসবাবপত্র সংগ্রহ করা ও তৈরী করা এবং সেটিকে সর্বদা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে শিশুদের উৎসাহিত করা উচিত। কৌশলী শিক্ষক পুতুলের বাড়ীর আলোচনার মধ্য দিয়েই ক্রমে শিশুদের মনে সৌন্দর্যবোধ ও পরিচ্ছন্নতাবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

(খ) শিশুরা বিদ্যালয়ে নিজেদের শ্রেণীকক্ষগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। আসবাবপত্রের ধুলো ঝেড়ে ও ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে শ্রেণীর সৌন্দর্য বর্ধন করবে। বই, স্লেট ইত্যাদি প্রয়োজনমত ব্যবহার করে আবার যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে শিখবে।

(গ) শিশুরা যাতে গৃহে তাদের মায়ের কাজে সহায়তা করে, নিজেদের পোষাক, পরিচ্ছদ, বই, খেলনা ইত্যাদি নিজেরাই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে শেখে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এইসব কারণে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে বন্ধুত্বের আদানপ্রদান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; উভয়ের সহযোগিতায় শিশুর জীবন সুন্দরভাবে গড়ে' তোলা সহজ হবে।

২। **রন্ধন কার্য।**—(ক) একেবারেই প্রথমে শিশুদের প্রকৃত রান্নার কাজ করতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু পুতুলের গৃহস্থালির মধ্য দিয়ে যাতে তাদের রান্না খাওয়া, পরিবেশন করা, খাবারের জায়গা করা এবং বাসন মাজা প্রভৃতি কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা জন্মায় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(খ) বিদ্যালয়ে যদি ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে শিক্ষক এবং বড় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব কনিষ্ঠ শিশুরাও সাধ্যমত কিছু কিছু কাজ করতে পেলে সুখী হবে।

সাধারণভাবে যদি এই ব্যবস্থা রাখা সম্ভব নাও হয়, তবু উদ্যানজাত তরিতরকারী সহযোগে মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে সকলের একসঙ্গে রন্ধন এবং ভোজনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এই সকল রন্ধন কার্যের মধ্য দিয়ে শিশুদের সঙ্গে চিত্তাকর্ষক ও সহজভাবে বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ, খাদ্য সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায়, খাদ্যপ্রাণ তথ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

৩। বাগান করাও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৪। **কাপড় কাচা এবং কাপড় রং করা।**—(ক) সুন্দরভাবে পুতুল খেলতে গিয়ে শিশুরা পুতুলের কাপড় কেচে রাখার প্রয়োজন অনুভব করবে। সাবান, সোডা বা ক্ষার দিয়ে কেমন-ভাবে কাপড় পরিষ্কার করা যেতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষা দিলে তারা তা আনন্দের সঙ্গে অনুধাবন করবে। সাধারণ গুঁড়ো রঙ দিয়ে কাপড় রঙাতে দিলে তারা আরো আনন্দিত হবে। সুতোর, রেশমের ও পশমের কাপড় কোনটি কেমনভাবে কাচতে, শুকাতে, রঙ করতে এবং ইস্তিরি করতে হয় এই সবই শিশুরা কাজের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই শিখে নেবে।

(খ) উৎসবাদি উপলক্ষে নিজেদের কাপড় ধুতে বা রঙ করতে হলে শিক্ষকের সাহায্যে শিশুরা সহজেই তা করতে পারবে।

(গ) ক্রমে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিশুদের একটা স্বাভাবিক প্রীতি জন্মাবে এবং নিজেরাই সচেষ্ট হয়ে তারা নিজেদের বেশভূষা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে শিখবে।

৫। **সেলাই করা।**—খেলা ঘরের মধ্যে দিয়ে পুতুলের জামা কাপড় তৈরী করা উপলক্ষ্যে অতি সহজেই শিশুদের সেলাই শিক্ষা অগ্রসর হয়। বড় বড় ছুঁচ এবং রঙীন সুতো বা পশমের সাহায্যে তারা মোটামুটি ফোঁড় দিয়ে সেলাই সুরু করতে পারে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা সহজ পদ্ধতিতে চটের আসন অথবা থলি সেলাই করতে পারবে। তালপাতার চাটাই বুনতে পারবে, পশম ও কাঁটার সাহায্যে বুনতে শিখবে, পুতুলের জামা-কাপড় তৈরীর মধ্য দিয়ে ক্রমে তারা ছাঁটকাট ও সেলাই সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে এবং নিজেদের জামা সেলাই করবার জন্য প্রস্তুত হবে।

৬। শ্রেণীর সাধারণ খেলা ও কাজের মধ্য দিয়েই প্রধানতঃ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের বিবিধ উৎসব এবং অনুষ্ঠানের সময়ে ব্যাপকতরভাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে। মধ্যে মধ্যে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলি আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেবার জন্য শ্রেণীর কাজের মধ্যে কতগুলি প্রক্ষেপ অথবা (project) এর অবতারণা করা যেতে পারে যথা :—

(১) পুতুলের বিয়ে,

(২) বনভোজন,

(৩) পুতুল নাচ, ইত্যাদি।

(খ) উদ্যান রচনা

বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনকেন্দ্রিক। জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত কোনও কাজ শিশুরা করবে ও তার সঙ্গে সঙ্গে সে যাতে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা পেয়ে আদর্শ সমাজের উপযোগী মানুষ হতে পারে এমনভাবে শিক্ষক তাকে ও তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করবেন এই হল বুনিয়াদী শিক্ষার মূল সূত্র। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু "অন্ন" উৎপাদনের কাজের কিছুটা অন্ততঃ শিশুকে করতে না দিলে জীবনকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। আবার শিশু মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও এই কাজ খুবই উপযোগী হ'বে। শিশুর মধ্যে দু'টী প্রবল বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি কাজ করে—একটী লালন প্রবৃত্তি আর একটী ধ্বংস প্রবৃত্তি। আমরা জানি এই সব প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ লোপ করা যায় না—অবদমন করা যায় মাত্র, কিন্তু তার ফল ভাল হয় না। অবদমিত প্রবৃত্তি গোপন পথে নানা অবাঞ্ছিত আকারে প্রকট হয়। কাজেই কুশলী শিক্ষকের কাজ হ'বে শিশুদের সৎপ্রবৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটানো ও অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলি যাতে পথ পরিবর্তন ক'রে কোন শুভকর পথে বিকশিত হয় তার ব্যবস্থা করা। কৃষিকাজে একদিকে যেমন লালন করার প্রয়োজন আছে আর একদিকে আছে ধ্বংস করার। শিশু গাছের চারাগুলিকে লালন করবে আর আগাছা, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকে ধ্বংস করবে—এই দু' কাজে তার দুরকম প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হ'বে। আর একদিক থেকেও এর সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। শিশুর কাছে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক রহস্য হ'চ্ছে জীবনরহস্য। একেবারে শিশু যারা তারা জীবিত ও নির্জীব বস্তুর পার্থক্য ধরতে পরে না। তারপর যখন সে দুটীর পার্থক্য বুঝতে শেখে তখন জীবনরহস্য তাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। জীব জগতে এই রহস্যজাল সহজে ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু উদ্ভিদ জগতে এর রহস্য অনেকাংশে স্বচ্ছ। উদ্যান রচনার মাধ্যমে শিশু এই রহস্য ভেদ করার সহজ সুযোগ পাবে।

শিশুকে দিয়ে উদ্যান রচনা করানোর সময় শিক্ষককে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হ'বে (১) উদ্যানের পরিবেশ যেন শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপযুক্ত হয়। রোদ, বাতাস খেলে এমন ক্ষেতে শিশু কাজ করলে তার শরীর, মন দুইই ভাল থাকবে—ভিজে ক্ষেতে কাজ করানো ঠিক হ'বে না। (২) শিশুর কাজের সময় তার আনন্দ ও স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া চাই—সকালে ও সন্ধ্যায় কাজ করতে তারা স্ফূর্তি পাবে—সকালের সূর্যরশ্মি তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হ'বে—শীতকালে দুপুরে কাজ করতে পারে, কিন্তু অন্য ঋতুতে তারা দুপুরে কাজ করতে পারবে না। (৩) একত্রে বেশীক্ষণ কাজ করলে তারা বিরক্তি বোধ করবে—এজন্য কাজের সময় অধিক দীর্ঘ হওয়া উচিত হ'বে না। (৪) সরঞ্জামগুলি হাল্কা ও নিরাপদ হওয়া দরকার। (৫) কাজগুলির পর্যায় এমন হওয়া দরকার যেন সর্বাঙ্গের ব্যায়াম হ'তে পারে। (৬) বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ ক'রে দিতে হ'বে। উপরের লেখার মূল কথা হ'চ্ছে শিক্ষক শিশুর শরীর, মনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদের পরিচালন করবেন। যে কোনও কুশলী শিক্ষক ঐ মূল সূত্র হ'তেই কাজ নির্বাচনাদি ক'রে নিতে পারবেন, তবে সুবিধার জন্য এখানে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুদের উপযোগী কাজগুলির উল্লেখ থাকবে।

উদ্যানে কিরকম ফসল বসানো হ'বে সেই সিদ্ধান্তে আসার জন্য শিক্ষক শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই অধিক দৃষ্টি দেবেন। যেসব সব্জী দিয়ে তাদের খাদ্যকে সুষম করা যায় সেগুলিই অধিক উপযোগী ব'লে গণ্য হ'বে—বাজারের চলতি দাম বিচার্য হ'বে না। শিশুর সৌন্দর্যস্পৃহা জাগ্রত ও তৃপ্ত করার জন্য ফুলবাগানের দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে হ'বে। যদি মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখা যায় তবে তাও রাখতে হবে। মৌমাছি পালন শিশুদের আয়ত্তসাধ্য ব্যাপার এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে খুব সহায়ক। এবং মধু শিশুস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী।

শিশুরা শুধু বিদ্যালয়েই উদ্যান রচনা করবে না—নিজ নিজ ঘরেও যাতে উদ্যান রচনায় উৎসাহী হয় সেদিকেও শিক্ষক মহাশয় সচেষ্ট হ'বেন। তারা একাজে তাদের অভিভাবকগণের সহযোগিতা করবে বা নেবে এবং উদ্যান রচনার ভেতর দিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকের যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারবে।

শিশুরা উদ্যান রচনার সঙ্গে কিছু কিছু হাঁস, মুর্গী, ছাগল প্রভৃতি পালনের কাজও যদি করে তবে তাতে অনেক সুবিধা হয়। মৌমাছি পালনের কথা আগেই বলা হয়েছে। ছাগল, হাঁস, মুর্গী পালন করলে শিশুদের সুসমঞ্জস খাদ্য প্রদান সহজ হ'বে। সার তৈরীর সুবিধাও হ'তে পারবে। উৎপাদিত ফসল যথাসম্ভব শিশুদের নিজেদের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যবহার করা উচিত। অতিরিক্ত ফসল বিক্রয় বা বীজ খরিদ উপলক্ষে শিশুরা মাঝে মাঝে স্থানীয় হাট বা মেলায় গেলে ভাল হয়। সেখানে আমদানী বিভিন্ন ফসল সম্বন্ধে তারা কৌতূহলী হ'তে পারবে এবং তুলনা করতে পারবে; তাদের শিক্ষার সুযোগও বেড়ে যাবে। কোনও উৎকৃষ্ট ফসল দেখলে নিজেদের ফসলকে তার সম পর্য্যায়ে তুলবার প্রেরণা পাবে—দরদস্তুর করতে শিখবে। নিকটে কোনও কৃষি প্রদর্শনী হ'লে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুরা সেখানে অবশ্যই প্রদর্শনী নিয়ে যাবে—এমন কি বুনিয়াদী বিদ্যালয়েই মাঝে মাঝে স্থানীয় কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার।

মাটি প্রস্তুতের প্রথম কাজ মাটি কোপানো। এটা ছোটদের উপযোগী নয়। শিক্ষক মহাশয়, অন্য সহায়ক ও বয়স্ক শিশুরা একাজ করে দেবে। শিশুদের উপযোগী ছোট এবং হালকা কয়েকটি কোদাল রাখতে পারলে তারাও একটু মাটি কোপাবে এবং সেই কাজে অসীম আনন্দ লাভ করবে। তবে প্রধানতঃ ছোটরা ঘাস বাছবে, খুরপীতে ক'রে চষা মাটিকে চাষের উপযোগী করবে, পোকা মাকড় বাছবে, মাটিকে সমান করবে। ঘাস, আগাছা ঝরা পাতাগুলি কুড়িয়ে সারকুড়ে নিয়ে যাবে—সেখানে কম্পোষ্ট সার করার সহায়তা করবে। চারা রোপণ করার জায়গা তৈরী করা, বীজ ছড়ানো, চারার যত্ন নেওয়া, চারা তুলে বসানো, ছোট চারার যত্ন নেওয়া, পোকা মাকড় বাছা, পোকা তাড়াবার জন্য ছাই ছড়ানো, পোকায় খাওয়া গাছের ডাল কেটে ফেলা, ছোট ঝারিতে ক'রে জল দেওয়া, তলার মাটি আল্গা ক'রে দেওয়া—এইগুলি ছোট শিশুদের উপযুক্ত কাজ। এর মধ্যেও বাছ-বিচারের প্রয়োজন হ'বে। চারা তোলা ও বসানোর কাজ আনাড়ি শিশু দিয়ে হ'বে না—আগে অভিজ্ঞ শিশু বা শিক্ষকের সঙ্গে থেকে তাদের একাজ শিখে নিতে হ'বে। পোকা খাওয়া ডাল বাছা ও মাটি খোঁড়া ব্যাপারেও তাই। কারণ ঠিকমত করতে না পারলে গাছ মরে যাবে। উৎপন্ন ফসল তোলার কাজে ছোট শিশুরা আনন্দও পাবে, শিক্ষাও পাবে; তবে একাজও অভিজ্ঞ শিশু বা শিক্ষকের নিকট ভালভাবে শিখে নেওয়া দরকার। কিছু বেশী বয়স্ক শিশু (৩য়, ৪র্থ শ্রেণী) উৎপন্ন ফসলের ওজন, তা হ'তে কত আয় হ'ল ইত্যাদির হিসাব ভালভাবে রাখতে পারবে। তারা সময়মত বীজ সংগ্রহ ক'রে যথোচিত সাবধানতা সহকারে সংরক্ষণ করবে। শিক্ষককে সাবধান হতে হবে যেন শিশুদের উদ্যান রচনা কেবলমাত্র ফসল উৎপাদনে না রূপান্তরিত হয়। উদ্যানের স্বাভাবিক পরিবেশে গাছপালা পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে শিশু প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে যা জানতে পারবে, কোন প্রকৃতিপাঠ মুখস্থ ক'রে সে জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হতে পারে না। কৃষিকাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন প্রসঙ্গে কেন সেগুলি করা হ'চ্ছে এই প্রশ্ন শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলতে হ'বে। এর সাহায্যে শিশুরা মৃত্তিকা, সার ও উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করবে। তাছাড়া আবহাওয়া, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর জানবে ও শিখবে। এক ক্ষেতে এক জাতীয় ফসল বারবার না বসিয়ে পর্যায়ক্রম দ্বারা সুফল পাওয়া যায়, ঠিকমত সার না দিলে ফসল বাড়ে না, উপাদান বিশেষের অভাবে উদ্ভিদের বিশেষ বিকৃতি ঘটে, পাতার অধিক বৃদ্ধি হ'লে ফলের উৎপাদন কমে—এই সব তথ্য তারা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাতে শিখতে পারে তার প্রতি অবহিত হ'তে হ'বে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কাজ ফুল হ'তে ফল ও বীজ হওয়ার রহস্য, পুং ও স্ত্রী ফুল, কলম বাঁধা ইত্যাদি উদ্ভিদ জীবনের রহস্য তারা জানবে। সূর্যের অয়ন গতি ও আবহাওয়া তত্ত্ব তারা অবশ্যই জানবে। উদ্ভিদ ও জীব জগতের পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং উদ্ভিদের বংশবিস্তার কৌশল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক

শিশুরা অনুধাবন করতে পারবে। কাজের মধ্যেই শিক্ষক নূতন নূতন শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান পাবেন। এ বিষয়ে শিক্ষককে একটা কথা মনে রাখতে হ'বে—কোনও বিষয়ে শিশুর দৃষ্টি ভালভাবে আকৃষ্ট হ'বার আগে সে বিষয়ের জ্ঞাতব্য তথ্য শিশুদের সামনে আনা ঠিক নয়। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যেন পাশাপাশি যেতে পারে। এজন্য বাগান ছাড়াও শ্রেণীর ভিতরে কিছু কিছু পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা চাই। গাছের বিভিন্ন অংশের আকৃতি প্রকৃতি বুঝাবার জন্য সাধারণ ব্যবচ্ছেদ ও আতস কাঁচ দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন হ'বে। অঙ্কুরোদ্গম প্রভৃতি অনুধাবন করার জন্য কাঁচপাত্রে অঙ্কুরোদ্গম, আলোর কাজ বোঝাবার জন্য অন্ধকারে ফসল বসানো বা গাছকে চাপা দেওয়া প্রস্বেদন বুঝবার জন্য গাছকে কাঁচপাত্র চাপা দেওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও অঙ্গার আত্মকরণ বুঝবার জন্য এবং গাছের রস শোষণ বুঝবার জন্য শ্রেণী-কক্ষে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা বিধেয়। উদ্ভিদের ও তার বন্ধু ও শত্রু জীবের সম্বন্ধ নিয়ে ছোট ছোট নাটক লিখে শিশুদের দিয়ে অভিনয় করানো যায়। কৃষি-কাজে নিযুক্ত লোক ও উদ্ভিদ নিয়েও ঐরকম নাটক করা যায়। জল, হাওয়া, রোদ, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ—এদের নিয়ে মনোজ্ঞ শিশু সাহিত্য হয়—নাটক আকারে সেগুলি অভিনয় করলে শিশুদের লব্ধ অভিজ্ঞতা মনে রাখার সহায়ক হয়—তারা সাহিত্য শেখে এবং সৌন্দর্যানুভূতি ও আনন্দ পায় প্রচুর। এরূপ শিশু সাহিত্য অনেক রয়েছে—শিক্ষকগণ বয়স্ক ছাত্রদের দ্বারা তৈরীও করিয়ে নিতে পারেন। ঐরূপ একটি নাটিকার আখ্যান ভাগ এখানে দেওয়া গেল—

বাগানে আছে হরেক রকমের সব্জী। চাষী সব প্রথমে একটী ফসলের ফল তুলে নিয়ে গেছে। তাতে সব সব্জীদের মনে বিক্ষোভ জাগলো। যার ফল তোলা হয়েছে তার প্রতি জাগলো সমবেদনা আর নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জাগলো ভয়। বুড়ো আমগাছ ছিল পাশে; তার কাছ হ'তে তারা জানতে পারলো সবারই ভাগ্যে ঐরকম বিপদ অপেক্ষা করছে। সব্জীরা মানুষের উপর চটে গেল। বিছুটী আর বাবলা তাদের বিদ্রোহ করার যুক্তি দিল —বললো তোমরা ফুল ফল না ফলিয়ে কাঁটা আর বিষ রাখ তোমাদের দেহে—তা হ'লে তোমাদের কেউ ছুঁতে সাহস পাবে না। তারা বিদ্রোহের বিষে মাতাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু আমগাছ তাদের বোঝাল বাবলা আর বিছুটীর জীবনের বিফলতার কথা আর উদ্ভিদ ও জীব জগতের পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা। তারা শান্ত হ'লো, তাদের ক্ষোভ দূর হ'ল—তারা বিধাতার গুণগান করলো।

কৃষিকাজে যাতে শিশুরা আনন্দ পায় তার জন্য এরকম নাটক অভিনয় করা খুবই বিধেয়। এছাড়া বিভিন্ন ঋতুর কৃষি নিয়ে ছড়া কবিতা রচনা ক'রে শিশুদের শেখালে ভাষা জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও কর্মে আনন্দ ও প্রেরণা সৃষ্টি করা হ'বে। এ বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও আমাদের ভাষায় আছে।

এছাড়া বিদ্যালয়ের উৎপন্ন ফসল নিয়ে মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা উচিত। এতে শিশুরা প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ পাবে—সামাজিক শিক্ষার সুযোগও পাবে।

যদি ঠিকমত সব্জী নির্বাচন করা যায় তবে প্রত্যেক দিনই শিশুদের নিজের হাতের উৎপন্ন ফসল দিয়ে তাদের জলযোগের ব্যবস্থা করা যায়। তার সবটাই যে বিদ্যালয়ে উৎপন্ন হ'বে তা নয়—কিছু অংশ অবশ্যই কিনতে হ'বে। কিন্তু সেজন্য গ্রামবাসীদের সহযোগিতা অবশ্যই পাওয়া যেতে পারবে। এরকম করতে পারলে শিশুদের অভিভাবকগণের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ মধুর হবে সন্দেহ নেই।

কৃষিকাজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিজেকে এই কার্যে অভিজ্ঞ ক'রে তুলবেন। ক্ষেত ও চারা তৈরী, ফসল বসানো, ফসলের জন্য জমি নির্বাচন, উপযুক্ত সেচব্যবস্থা ইত্যাদি তো জানতেই হ'বে, তাছাড়া প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণও বুঝতে হ'বে। তবেই তিনি এই কাজকে শিশুদের আনন্দ ও শিক্ষার আধার করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে শুধু পুঁথিগত জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

মাটি প্রস্তুতকালে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখবেন ঃ—

(১) মাটি ভালভাবে চূর্ণিত হয়েছে কিনা?

(২) জমিতে সার ঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া হয়েছে কিনা?

(৩) জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে কিনা?

(৪) আগাছা, খোলামকুচি প্রভৃতি ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা?

(৫) বাইরের উৎপাত থেকে 'হাপর' রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?

(৬) বীজ বপন বা চারা রোপন করার পূর্বে চারা বসাবার বা বীজবপন করবার জমির চারপাশে আল বাঁধা, নালী কাটা, জমি চৌরশ করা প্রভৃতি প্রাথমিক কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে কিনা?

চারা প্রস্তুতকালেও কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখা প্রয়োজন—

(১) বীজগুলি টাট্‌কা ও ভাল জাতীয় হওয়া চাই।

(২) 'হাপরটি' ঠিকমত তৈরী করে পিঁপড়েশূন্য করার ব্যবস্থা করা বা, অসুবিধা হলে, টবে বীজ বপন করা উচিত।

(৩) বীজবপনের পর উপযুক্ত সময়ে জলসেচন করা, আচ্ছাদন দেওয়া ও সময়মত আচ্ছাদন উন্মুক্ত করে দেওয়া বিষয়ে বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজন। হাপরের মাটি সারযুক্ত ও ঠিকমত তৈরী না হলে ভাল চারা উৎপন্ন হবে না। চারা দুর্বল হলে ফসল ভাল হবে না। সতেজ চারাগুলি রক্ষা ক'রে দুর্বল চারাগুলি উঠিয়ে ফেলাই বিধেয়।

(৪) ঋতু অনুযায়ী ও সূর্যের অয়নগতি অনুসারে বিভিন্ন জাতীয় শাক সব্জীর গাছ বিভিন্নদিকে লাগান উচিত। শীতকালে লতান গাছের গোড়া উত্তরদিকে থাকবে, কারণ ঐ সময়ে গাছগুলি সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী হয়। যে সমস্ত গাছ উপরের দিকে বাড়তে থাকে সেগুলি জমির উত্তরে ও পশ্চিমে লাগান উচিত।

চারা রোপণ ও তার তদ্বিরপ্রণালী সম্বন্ধেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। চারাগাছগুলি হাপর থেকে তুলবার পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ জল দিয়ে হাপরের মাটি ভিজিয়ে নেওয়া উচিত। তা হ'লে চারা তুলবার সময়ে চারাগাছের শিকড় ছিঁড়বার বা পাশের চারা নষ্ট হবার ভয় থাকে না। লঙ্কা, বেগুন প্রভৃতি কোন কোন চারার মূল শিকড়ের খানিকটা অংশ কেটে বসালে গাছের ফলন ভাল হয়। সতেজ ও পুষ্ট চারাই ক্ষেতে বসান উচিত। চারা বসাবার পর ৩।৪ দিন রোদের সময় ঢেকে রেখে ঠাণ্ডার সময়ে ঢাকনি খুলে দিয়ে জল দিতে হবে। মাটির গরম অবস্থায় জল দিলে অনেক সময় অপকার হয়। কাজেই বিবেচনাপূর্বক চারা-গাছে জল দেওয়া উচিত। খুব সকালে ও সন্ধ্যার পূর্বে জল দিলে এই আশঙ্কা থাকে না। চারা বসাবার কয়েকদিন পর আবশ্যকমত সার প্রয়োগ চলতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্ষে বা রেড়ীর খোলই প্রশস্ত। চারাগাছের গায়ে যাতে খোলের গুঁড়ো না লাগে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। খোল পচিয়ে ২।৩ সপ্তাহ পর জলের সঙ্গে গুলে তরল আকারে চারাগাছের গোড়ায় দেওয়া চলে। কাঁচা গোবর দেওয়া ঠিক নয়। গোবর না পচিয়ে সাররূপে ব্যবহার করলে জমিতে পোকার উপদ্রব বাড়বে। জমিতে সার মিশাতে হাড়ের গুঁড়ো, কম্পোষ্ট সার, গোবর, খোল, চূণ ব্যবহার করা বিধেয়। রাসায়নিক সার পরিমাণমত উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জমিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন জমিতে কি সার দিতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিশুদের পক্ষে শাক জাতীয় ও লতানে গাছ লাগান সহজ হবে। কপি জাতীয় ফসল, বরবটী, শাঁক আলু, রাঙা আলু, টোমাটো, লেটুশ, পালম, মূলা, বীট্‌, গাজর, পেঁয়াজ চাষে আরও বেশী তদ্বিরের প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে চীনাবাদাম, সয়াবিন,

লাগান যেতে পারে। এইগুলি কাঁচা অবস্থায় 'স্যালাড' তৈরী ক'রে খাওয়া যায়; এবং তা সুস্বাদু ও অত্যন্ত পুষ্টিকর।

শিক্ষকগণ যদি নিজেদের বাড়ীতে এক একটি কৃষিক্ষেত্র ও ফুলের বাগান সৃষ্টি করেন তবে শিশুদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়বে।

পরিশিষ্টে একটি বিদ্যালয়সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রের নক্সা দেওয়া হল। বিদ্যালয়ের সংগঠন ঐভাবে হলে কতকগুলি স্থায়ী ফলগাছের দ্বারা এবং শাক সব্জীর চাষের দ্বারা বিদ্যালয়ের অনেকখানি আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা হবে।

বিদ্যালয়সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রের নক্সার বিবরণ।

এখানে ৬/ বিঘা জমির উপর অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও তৎসংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রের নক্সা দেখান হয়েছে। হয়ত অনেক স্থলে ঐ পরিমাণ আয়তনবিশিষ্ট জমি পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এখানে যে নক্সা দেওয়া হল তাকে অবলম্বন করে ক্ষুদ্রাকারেও কৃষিক্ষেত্র রচনা করা যেতে পারে। এখানে যে যে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে তা যে কোন কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে উপযোগী হবে ব'লে আশা করা যায়। বিদ্যালয়ের আশেপাশে যে জমি থাকবে তা যদি ঠিকমত রচনা করা যায় তা হ'লে যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে তেমনই কিছুটা উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

নক্সায় জমির পরিমাণ ৬/ বিঘা অর্থাৎ দৈর্ঘে প্রস্থে ২৪০ হাত × ১৬০ হাত = ৩৬০ ফুট × ২৪০ ফুট।

জমির চতুর্দিকে ৮ হাত ব্যবধানে দুই পাশে ২ হাত চওড়া ২ হাত গভীর ঢালু করে ২টী নয়নজুলি কাটা হয়েছে। নয়নজুলির মাটি ঐ ৮ হাত জমির উপর ফেলে জমিটাকে উঁচু করা হয়েছে। ঐ জমির প্রথম সারিতে বেড়াগাছ লাগিয়ে বেড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় সারিতে আনারসের গাছ ৪ হাত অন্তর বসাতে হবে। তৃতীয় সারিতে ৮ হাত অন্তর নারকেলগাছ এবং মাঝে কলাগাছ লাগান যেতে পারে। যে সমস্ত অঞ্চলে নারকেলগাছ হয় না সেখানে আরও দূরে দূরে ফলের গাছ লাগান যেতে পারে। চতুর্থ সারিতে মাঝে মাঝে কাগজী প্রভৃতি নানা জাতীয় লেবুগাছ দেওয়া যেতে পারে। পঞ্চম সারিতে পেঁপের গাছ ও কার্পাসের গাছ (যা দীর্ঘ বছর স্থায়ী) বসান যেতে পারে। সূর্যের গতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্নদিকে ছোট বড় গাছের সারি পরিবর্তন করে বসাতে হবে। যে সমস্ত গাছের রোদের বেশী প্রয়োজন, যারা ছায়ায় হয় না, সেগুলিকে রৌদ্রমুখী ক'রে বসাতে হবে। তারপর চতুর্দিকে ৪ হাত চওড়া একটি রাস্তা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের আবাসস্থান, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, পুষ্করিণী ও ফুলের বাগান প্রভৃতির জন্য জমি বাদ দিলে ছাত্রদের চাষের জমি ৩০ কাঠা দাঁড়ায়। প্রতি কাঠায় ৫ জন ক'রে গড়ে কাজ করতে পারে। ১ কাঠাকে ৫ ভাগে ভাগ করলে প্রতি খণ্ড ৬৫ বর্গহাত হবে। নক্সাতে ছক কেটে দেখান হয়েছে। চলা ফেরার সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে পথ থাকবে। কাজেই কিছুটা চাষের জমি বাদ পড়বে।

একটি ১০ কাঠার ছোট পুকুর খুঁড়বার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে মাটি উঠিয়ে নিচু জমি উঁচু করা সম্ভব হবে। চাষের জমির উর্বরতা বাড়বে। আবাসস্থলের জন্য প্রয়োজনীয় মাটিও পাওয়া যাবে। এবং হাঁস ও মাছের চাষ করতে পারলে শিশুদের আরো পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারবে।

বিদ্যালয় সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রের নক্সা
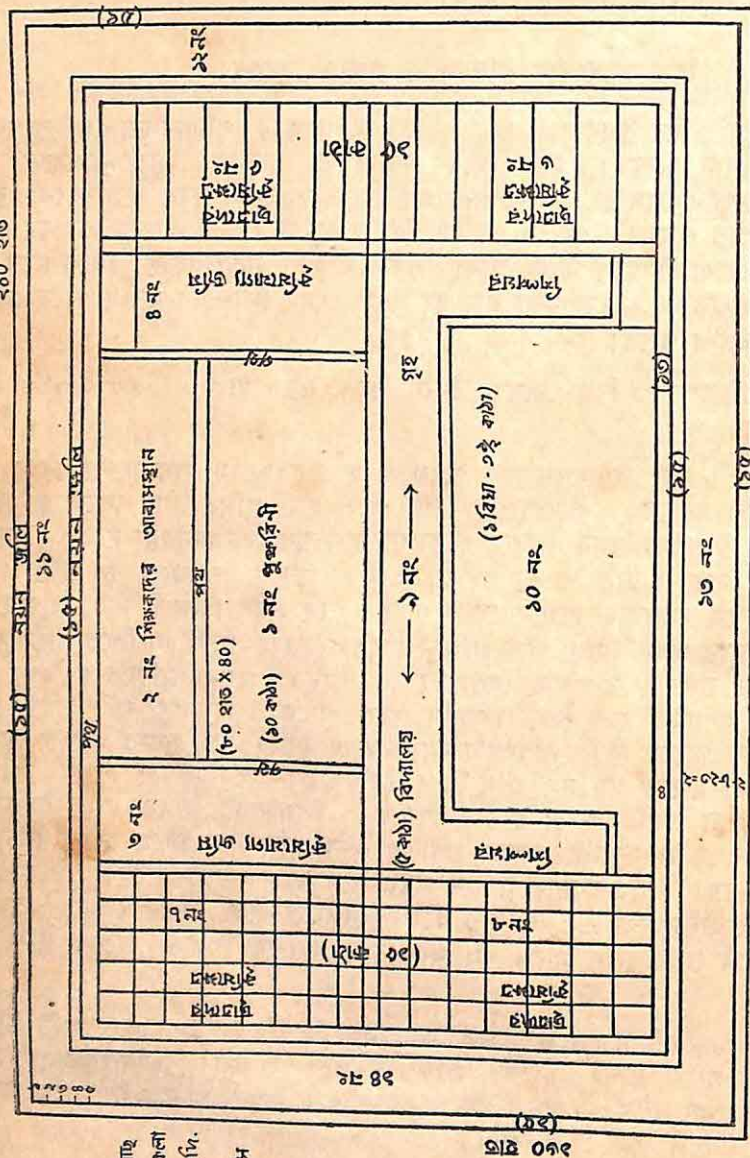
কৃষিকার্যের জন্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম তালিকা

(১) ছোট বড় কোদাল—২০ খানা। (২) নিড়ানী ও খুরপী—৩০ খানা। (৩) জলের ঝারি ও বালতি—১০টী। (৪) ঝুড়ি—১০টী। (৫) দা, কাস্তে, শাবল, বিদে, মই ছোট আকারের কয়েকখানা। (৬) ফুলের টব, কাঠের বাক্‌স (হাপরের জন্য), চালুনী (মাটি চালিবার জন্য) কয়েকটী। জলের টব ২।১টী। (৭) ওজনের জন্য দাঁড়িপাল্লা ও ওজন। ইহা ব্যতীত আবশ্যকমত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

ভাষা শিক্ষা

ভূমিকা

বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীই জানেন যে শিশুকে ভাষা শেখাতে কত অসুবিধায় পড়তে হয়। বহুদিন ব্যয়িত হয়ে যায় শিশুকে বর্ণমালা শেখাতে। তারপর শেখানো হয় শব্দ এবং তারপরে বাক্য। পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা বলতে কেবল লিখতে এবং পড়তে শেখা বোঝায়। কথিত ভাষাকে কোনও স্থানই দেওয়া হয় নি। শিশুরা কতকটা যান্ত্রিকভাবে লিখতে ও পড়তে শেখে। কিন্তু নিজের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে শেখে না। যে প্রণালী অবলম্বন ক'রে এতদিন পর্য্যন্ত শিশুদের শেখান হয়েছে, সেই প্রণালীতে আনন্দের কোনও স্থান নাই এবং সেইজন্য শিশুরা ভাষা শিখতে বিশেষ কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে নি। কিন্তু নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী বদলিয়েছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বদলিয়েছে এবং শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নীত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এখন আর নিপীড়ন নাই—পরন্তু, আনন্দ আছে প্রচুর পরিমাণে। আনন্দের মধ্য দিয়ে ভাষা শেখানো সহজ হবে সন্দেহ নাই।

কি ক'রে ভাষা শেখাতে হবে তাই বিবেচ্য। কি প্রণালী অবলম্বন করতে হবে, কি কি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে ভাষা শেখাতে হবে, কি কি সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে ভাষা শেখবার ব্যবস্থা করতে হবে, সে সব কিছুই বর্তমান নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর উপরেই নির্ভর করবে। ঠিক কিভাবে কখন কোনটি শিক্ষা দিতে হবে তা আগে থেকে ব'লে দেওয়া সম্ভব নয় এবং কোন শিশু কিসের উপর আগ্রহ প্রকাশ ক'রবে তাও পূর্বাহ্ণে জানা সম্ভব নয়। অতএব পূর্ব হতেই একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা পালন করবার নির্দেশ দেওয়া চলতে পারে না। তবে, মোটামুটি সাধারণভাবে কোন্ ধারা অবলম্বন ক'রে শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া চলে তার একটা খসড়া এখানে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এই ধারাকে যদি কলের মতন চালিয়ে যান, তা হ'লে ভুল করবেন, কারণ, সকল ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ এক নয় এবং শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, তা' না হ'লে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষায় যেসব জটিলতা দেখা গিয়েছিল, সেই সব জটিলতা ধীরে ধীরে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও দেখা দেবে।

এই স্তরে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। শিশুদের সহজ ও সরল ভাষায় কথা বলতে উৎসাহিত করতে হবে। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে, গল্প বলবে, নিজেদের কাজের বিষয়ে আলোচনা করবে, স্তোত্র পাঠ করবে, জাতীয় সঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীত গাইবে এবং কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি করবে। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষালয়ে ভাষা শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র একটি বিশেষ ঘণ্টার পাঠ্যভ্যাস বোঝায় না। শিশুর বাস্তব জীবনের সমস্ত কর্মকে কেন্দ্র ক'রে, এবং তার বাস্তব ও কল্পনা জগতের সমস্ত আগ্রহ ও অনুরাগের মধ্য দিয়ে শিক্ষক তাকে বলতে, লিখতে ও পড়তে শেখাবেন।

(১)

ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলা যেতে পারে। ইউরোপে এবং আমেরিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করবার পূর্বে শিশুরা "নার্সারি" অথবা শিশু-বিদ্যালয়ে কিছুদিন কাটায় এবং সেইখানে নানা খেলা এবং কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করান হয়। এই ভিত্তির উপর নির্ভর ক'রে শিশুরা পড়াশুনা আরম্ভ করে। কিন্তু, এতদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশে,

শিশুরা পাঠশালায় এসেই অ-আ-ক-খ পড়তে আরম্ভ করেছে। এখন, নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনায় নার্সারি বা শিশু-বিদ্যালয়ের স্থান থাকলেও সব শিশুর জন্য ঐ রকম ব্যবস্থা করা যাবে না। সুতরাং বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে কিছুদিন পর্যন্ত নার্সারি বা শিশু-বিদ্যালয়ের কতগুলি কাজ ও খেলা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে শিশু-মন ভাষা ও অন্যান্য জিনিষকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারে। মনের এই প্রস্তুতীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ এবং শিশুর মনকে যদি নূতন কিছু গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ক'রে নেওয়া যায়, তবেই সে আনন্দের সঙ্গে নূতন জ্ঞান আহরণ করবে সন্দেহ নাই।

প্রথমেই শিশুদের কথার জড়তা কাটিয়ে দিতে হবে। শিশুরা কথা বলবে এবং যথাসম্ভব, পূর্ণ বাক্য দ্বারা তারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করবে। শব্দের উচ্চারণ যাতে শুদ্ধ হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। যে শিশু মুখের ভাষায় নিজের মনের ভাব ব্যক্ত ক'রে বলতে শেখেনি, সে যে কোনও দিনই লিখিত ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে শিখতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য। যখন সে লিখতে শেখে, তখন তার লেখা একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র হয়।

শিশুরা নিজেদের গৃহের কথা, জীবনধারণ ব্যবস্থা, স্কুলের কথা, গ্রামের কথা বলবে। ৬+ বৎসরের শিশুর পক্ষে কথার যোগাযোগ রক্ষা ক'রে কোনও ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা প্রথমে সম্ভবপর হবে না। এমন কি শিশু হয় তো প্রথমে কোনও কথাই বলতে চাইবে না। এই সময়ে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিশুদের সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচয় ক'রে নেবেন। শিশুদের নিয়ে একটু বেড়ালে এবং খেললে শিশুদের জড়তা কেটে যাবে, এবং তখন তারা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে চাইবে। কিন্তু, বলতে চাইলেই যে তারা সুষ্ঠুভাবে বলতে পারবে তা নয়। সুন্দরভাবে নিজের বক্তব্য বিষয়টিকে উপস্থিত করতে হলে যেভাবে কথা বলার অভ্যাসের প্রয়োজন, সেই অভ্যাস তারা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে গঠন করবে। শিশুরা ত নিজেদের মধ্যেও কথা বলে। কিন্তু, তাতে কি তাদের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়? সামান্য বৃদ্ধি পেলেও, ওতে যথেষ্ট পরিমাণে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায় না। এই নিয়মিত বৃদ্ধির জন্যই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন।

প্রথমে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিশুর পরিবার, গৃহ, আবেষ্টনী, বিদ্যালয় ও গ্রাম সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে এক বাক্যের উত্তর সংগ্রহ করবেন। যথা—

(১) বীণা, কাল রাতে তুমি কখন খেয়েছিলে?

(২) রাম, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই তুমি কি করেছ?
ইত্যাদি।

এইরূপ প্রশ্নোত্তর কিছুদিন বলার পর শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এমন প্রশ্ন করবেন যাতে সুসংবদ্ধ দুই তিনটি পূর্ণ বাক্যের উত্তর প্রয়োজন হয়। যথা—

(১) নরেন, তুমি কাল বিকেলে কি কি খেলা খেলেছিলে বল দেখি?

(২) সাধনা, তুমি কাল বিকেলে খেলার পর বাড়ি ফিরে কি কি কাজ করেছিলে?
ইত্যাদি।

এই সকল প্রশ্নকে অনুসরণ ক'রে কোনও একটি নির্দিষ্ট শিশুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা চালাতে পারা যায়। শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যকে কেন্দ্র ক'রে কথোপকথন চালালে তাদের নিকট অধিক সহযোগিতা পাওয়া যায়। গ্রামে যখন কোনও পূজো, মেলা, যাত্রা অথবা অন্য কোনও আনন্দানুষ্ঠান হয় তখন শিশুরা সেই বিষয়ে আলোচনা করতে ভালবাসে। কোনও একটি বিশেষ শিশু যদি গ্রামান্তরে গিয়ে নূতন কোনও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আসে, তখন তাকে কেন্দ্র ক'রে অন্য শিশুদের কৌতূহল জাগ্রত করা যায়।

(২)

শিশুদের পরিচিত শব্দসমষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ অবস্থা থেকে কেমন ক'রে শিশুদের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, প্রথম অধ্যায়ে সে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নূতন শব্দ শেখানর উপায়সমূহের আলোচনা হয়নি। এখন শিশুদের পরিচিত অনেকগুলি শব্দের মধ্যে দুই একটি ক'রে নূতন শব্দ কেমন ক'রে শিখিয়ে দিতে হবে, এই অধ্যায়ে তারই উপায় নিবদ্ধ হল।

অনেকগুলি পরিচিত শব্দের মধ্যে যদি দুই একটি নূতন শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে শিশুদের পক্ষে সেই শব্দগুলি আয়ত্ত করা খুব বেশী কষ্টসাধ্য হবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে বিভাগ ক'রে শিক্ষা দেওয়া চলে না। একটির সঙ্গে আর একটি বিষয় প্রায় সকল সময়েই যুক্ত হয়ে যায়। কারণ শিশুর আগ্রহ কোথায় কিভাবে জাগ্রত হবে তা পূর্বাহ্ণে জানা যায় না। এবং শিশুর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা এবং ঔৎসুক্যকে অনুসরণ ক'রে শিক্ষাদান করতে হবে।

ধরা যাক, শিশুরা মাটি দিয়ে নানারকম খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরী করছে। মহা-উৎসাহের সঙ্গে হয়তো তারা কাজ করছে এবং এটা ওটা জিজ্ঞাসা করছে। কোনও জিনিষই হয়তো ঠিকমতন গড়া হচ্ছে না, তবুও তারা আগ্রহের সঙ্গে কাজ করছে এবং শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এই অবস্থায় একজনকে প্রশ্ন করবেন—"হরি, তুমি কি তৈরী করছ?"—হরি হয়তো মাটি দিয়ে একটা মাছ তৈরী করেছে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী মাছ সম্বন্ধে আলোচনাচ্ছলে মাছের দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। হয়তো এমন দুই একটি মাছের নাম তিনি বলবেন যা শিশুরা জানে না। এইভাবে শিশুরা মাছের দেহের বিভিন্ন অংশের নাম এবং কয়েকটি মাছের নাম শিখল। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ঐ সকল মাছের জ্ঞানকে আরো দৃঢ় করবার জন্য ছবির সাহায্য নিতে পারেন। এইভাবে শিশুরা তাদের নিজেদের তৈরী নানা জিনিষের মধ্য দিয়ে নূতন শব্দ শিখতে পারে।

এই রকম আলোচনার মধ্য দিয়ে ভাষা শেখা যে কেবল একটি ভাষা শেখার ঘণ্টাতেই আবদ্ধ থাকবে তা নয়। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে মনে রাখতে হবে যে, শিশু বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রকার কর্মের মধ্যেই মাতৃভাষা ব্যবহার করছে। শিশুর সমস্ত দিনের খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক তাকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেবেন।

(৩)

শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এই স্তরে, গল্পচ্ছলে নানা বিষয়ে কথোপকথন করবেন এবং শিশুদের কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলবেন। গল্পগুলি শিশুদের নিকট খুব আকর্ষণীয় হওয়া চাই এবং সেগুলি এমনভাবে উপস্থিত করা চাই যেন শিশুদের মনোযোগ গল্পের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। এক কথায়, গল্পগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হওয়া উচিত।

গল্প বলার পরে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিশুদের নিজের ভাষায় গল্পের পুনরুক্তি করতে বলবেন। গল্পের পুনরুক্তির মধ্যে শিশু কথার সঙ্গে কথার সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে এবং তাদের কথা বলার মধ্যে অর্থবোধের ধারা অব্যাহত থাকবে।

গল্পগুলি নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বন করে হবে:—

(১) রূপকথার গল্প।
(২) পৌরাণিক গল্প।
(৩) পরীর গল্প।
(৪) গাছপালা ও জন্তুর গল্প।
(৫) মজার (হাস্যোদ্দীপক) গল্প।
(৬) অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের বিচিত্র গল্প।

এই সমস্ত গল্প বলবার সময়ে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে নানারূপ নূতন শব্দের সাহায্য নিতে হবে, কারণ শিশুর নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে যে সকল পরিচিত শব্দ আছে তাই দিয়ে এই সকল গল্প বলা যাবে না। কিন্তু গল্পগুলি শিশুর কাছে এতই কৌতূহলোদ্দীপক হবে যে অপরিচিত শব্দগুলি পরিচিত অন্যান্য শব্দের মধ্যে পড়ে পরিচিতের মতই বোধ হবে এবং শিশুরা অতি সহজেই ঐ নূতন শব্দগুলি আয়ত্ত করতে পারবে। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র, দৈত্য, রাক্ষস ইত্যাদি শব্দ শিশুর কাছে অপরিচিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু, শিশুদের মনোরাজ্যে কল্পনায় এই সকল শব্দের জন্য একটা আকর্ষণ সর্বদাই বর্তমান থাকে। সুতরাং এদের অর্থবোধের জন্য শিশুদের মোটেই বেগ পেতে হয় না।

(৪)

শিশুদের কয়েকটি কবিতা ও ছড়া মুখস্থ করাতে হবে। মুখেমুখে কবিতা বা ছড়া ব'লে গেলে শিশুদের পক্ষে ঐ সকল কবিতা বা ছড়া মুখস্থ করা মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না। যদি ছড়া বা কবিতা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী অঙ্গভঙ্গী সহকারে শিক্ষা দেন তা হ'লে শিশুরা প্রথমে অতিশয় আনন্দ অনুভব করবে এবং পরে অঙ্গভঙ্গী সহকারে নিজেরা আবৃত্তি করতে কোনওরূপ কুন্ঠা বোধ করবে না। নিম্নলিখিত কবিতা বা ছড়ার ন্যায় শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যে কোনও কবিতা বা ছড়া বেছে নিয়ে শিশুদের শেখাতে পারেন, যথা ঃ—

১। ছড়া।—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, ন'দেয় এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
আর এক কন্যে গোঁসা ক'রে বাপের বাড়ি যান।

২। কবিতা।—

দিনের আলো নিভে এলো.
সূয্যি ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে,
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে
রঙের উপর রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঢং ঢং,
ওপারেতে বিষ্টি এলো
ঝাপসা গাছপালা,
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মাণিক জ্বালা,
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান,
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ন'দেয় এলো বান।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করবার সময়ে শিশুদের ছন্দের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মাবে এবং লোকের সম্মুখে কথা বলার ও আবৃত্তি করবার জন্য যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের প্রয়োজন হয়, তা সে লাভ করবে। শিশুর উচ্চারণের জড়তা ধীরে ধীরে কেটে যাবে।

(৫)

নাটক অভিনয় শিশুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। শিশুরা অতি ছোট বেলা থেকেই পিতামাতাকে অনুকরণ করতে শেখে—"আমি বাবা হয়েছি", "আমি মা হয়েছি" ইত্যাদি খেলা করে। এখন এই ৬ বৎসরের শিশুরা আর বাবা-মা সাজতে চায় না, কিন্তু অন্য কোনও চরিত্রের বক্তব্য নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে ভালবাসে। শিশুদের যদি নাটক অভিনয়ের কথা বলা যায়, তা হ'লে দেখা যায়, যে, তারা অতি সহজেই অভিনয় করতে স্বীকৃত হয়, এবং কে রাজার অংশ গ্রহণ করবে, কে রাজপুত্র হবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, শিশুরা রাজা, রাণী, সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, দৈত্য ইত্যাদি সেজে ঢাল তলোয়ার হাতে নাটক করতে যত ভালবাসে, অন্য কোনও নাটক তাদের ততটা পছন্দ হয় না।

জন্তু জানোয়ারের সম্বন্ধে নাটকাভিনয় করতেও তারা একেবারে গররাজি নয়। কিন্তু, এই দুই জাতীয় নাটকেরই পোষাক পরিচ্ছদ, মুখোস ইত্যাদি তাদের মনোমত হওয়া চাই। এই বয়সের শিশুরা অভিনয়ের উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ, ঢাল-তলোয়ার, মুখোস নিজেরা তৈরী করতে পারবে না, কিন্তু কি ধরণে তৈরী করতে হবে তারা নির্দেশ দিতে পারবে এবং শিশুদের এই নির্দেশের একটা মূল্য আছে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিশুদের নির্দেশ অনুসারে এবং তাদেরই সহায়তায় তাদের পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি তৈরী করে দেবেন। তা ছাড়া গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতেও শিশুদের সহযোগিতা ছাড়া চলবে না। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিশুরা নাটক তৈরী করতে যেসব কার্য্যকর ইঙ্গিত (Practical suggestions) দেয় তা বয়স্ক ব্যক্তির মাথা হ'তেও সহজে বার হয় না। যা হোক, নিম্নে একটি গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত ক'রে দেওয়া হল। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এইভাবে ছোট গল্পকে, শিশুদের সাহায্য নিয়ে, নাটকে রূপান্তরিত করিয়ে শিশুদের দিয়ে অভিনয় করাতে পারেন।

রাক্ষস-জয়

প্রথম দৃশ্য

রাজপুত্র—ভাই সেনাপতির ছেলে, চল আমরা দূর দেশে বেড়াতে যাই।

সেনাপতিপুত্র—আমার তো খুব ইচ্ছে আছে, কিন্তু, তুমি যাবে কি ক'রে?

রাজপুত্র—কেন?

সেনাপতিপুত্র—তোমার বাবা কি মত দেবেন?

রাজপুত্র—তাঁর মত আমি নিয়েছি। এখন তুমি যদি যাও তবেই হয়। তুমি তোমার বাবার মত নিয়ে নাও।

সেনাপতিপুত্র—আমিও বাবার মত নিয়েছি। তবে এখন চল—অনেক দূরদেশে বেড়াতে যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপুত্র—এ কোন দেশে এলাম? এখানে যে একজনও লোক দেখছি না!

সেনাপতিপুত্র—তাই তো—রাস্তায় দেখি লোকজন নাই!

রাজপুত্র—কি হল ? এ কোথায় এলাম ?

সেনাপতিপুত্র—ঐ দেখ রাজবাড়ী—চল ভিতরে যাই।

রাজপুত্র—চল।

(তারা ভিতরে যাবার আগেই একটি মেয়ে এসে প্রবেশ করল)

রাজকন্যা—তোমরা কে? এখানে এসেছ কেন?

রাজপুত্র—তুমি কে ? আর এ দেশে লোকজন নাই কেন?

রাজকন্যা—আমি এ দেশের রাজকন্যা—একটা ভীষণ রাক্ষস আমাদের দেশের সব লোককে খেয়ে ফেলেছে, শুধু আমায় রেখেছে। তোমরা শিগ্‌গির পালাও, নইলে রাক্ষস তোমাদেরও খাবে।

রাজপুত্র—আমি ভিন্ন দেশের রাজপুত্র, আর এই আমার বন্ধু—সেনাপতির ছেলে। কোনও ভয় নাই, আমরা রাক্ষসকে যুদ্ধে হারিয়ে দেব !

(প্রচণ্ড আস্ফালন করতে করতে রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস—কেরে—আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে ! এসো দেখি !

রাজপুত্র—এসো দেখি !

(রাজপুত্র ও রাক্ষসের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল—কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্র মাটিতে পড়ে গেল)

রাক্ষস—দেখলে তো আমাকে হারানো সহজ নয়।

সেনাপতিপুত্র—আমি এখনও বাকি আছি।

রাক্ষস—এসো দেখি—তোমাকে শেষ করছি।

(সেনাপতিপুত্রের সঙ্গে রাক্ষসের যুদ্ধ হ'তে লাগল। এবার রাক্ষস হেরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ততক্ষণে রাজপুত্রও উঠে পড়েছে। দুই বন্ধুতে মিলে রাক্ষসের অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নিল)

রাক্ষস (মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে)—আমাকে মেরো না—আমাকে ক্ষমা কর—দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা কর।

রাজপুত্র—আচ্ছা, এবারকার মতন তোমাকে ক্ষমা করা হল, কিন্তু, তুমি আর কোনও দিন মানুষ মেরো না।

রাক্ষস—না না না—আমি আর কোনও দিন মানুষ মারব না !

(দুই হাতে নাক কান মলতে মলতে রাক্ষসের প্রস্থান)

রাজপুত্র—চল আমরা এবার দেশে ফিরে যাই।

রাজকন্যা—আমি তা হ'লে কি করব ? আমি কি একলা এখানে থাকব?

রাজপুত্র—চল, তুমিও আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে যাবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

পড়ার জন্য প্রস্তুতীকরণ হিসাবেই যে শুধু নাটক অভিনয়ের মূল্য আছে তাই নয়, নাটক অভিনয় করলে শিশুদের কথা বলার জড়তা ক্রমে কেটে যাবে এবং শিশুরা স্বাভাবিক ও সাবলীল ভঙ্গীতে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করতে শিখবে। এই জন্য, প্রতি শ্রেণীতে, যখনই সুবিধা তখনই নাটক অভিনয় করান উচিত। তবে, প্রথম শ্রেণীর নাটকে অভিনেতার বক্তব্য অতিশয় সামান্য থাকবে এবং নাটক মোটেই বড় হবে না। তা হলে নাটকের ধারা রক্ষা করাটা শিশুদের পক্ষে সহজ হবে না। যতই শিশুদের বয়স বাড়বে ততই নাটক বড় করা যাবে এবং অভিনেতার বক্তব্যও বড় হতে পারবে।

যারা নাটক অভিনয় করবে তাদের সম্বন্ধে একটা কথা এইখানে বলা প্রয়োজন : শিশুরা সকলেই নাটক অভিনয় করবার জন্য উৎসাহিত বোধ করবে, সেইজন্য, নাটকের মধ্যে যতগুলি

চরিত্র বেশী দেওয়া যায় ততই ভাল। পূর্বোক্ত নাটকের শেষে একটি নূতন দৃশ্য যোগ ক'রে দেওয়া যেতে পারে যে রাজকন্যাকে সঙেগ নিয়ে রাজপুত্র এবং সেনাপতিপুত্র স্বদেশে ফিরে এসেছেন, এবং তাঁদের দেশের লোকেরা শঙ্খ ও হুলুধ্বনি এবং গীতবাদ্য সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা করছে। এইভাবে শ্রেণীর সব কয়টি শিশুকেই নাটক অভিনয় করবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া প্রতি একপক্ষকালে একটি ক'রে নাটক অভিনয় করালে, শীঘ্রই সব কয়টি শিশুই অভিনয় করবার সুযোগ পাবে। কারো মনঃক্ষুন্ন হলে চলবে না। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন।

(৬)

ইতিপূর্বে যে কয়েকটি অধ্যায় লিখিত হয়েছে, সমস্ত অধ্যায়গুলিতে প্রাক্-পঠন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বিষয় ও শিক্ষাব্যবস্থাকে জোর ক'রে ভাগ করা চলে না। প্রাক্-পঠন বলতে এই কথাই বলতে চাই যে এই সময়ে নানা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুর মনকে পড়াশুনার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু প্রথমেই যদি কোন শিশু কোন সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে পড়ার কিম্বা লেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তা হ'লে তাকে সমগ্র প্রাক্-পঠন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। ধরা যাক এমন একটি শিশুর কথা, যে শিশু কতকগুলি ছবি দেখে তার মধ্যে কি আছে জানতে চাইল। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিশুর সাহায্য নিয়েই ছবিগুলি ব্যাখ্যা করলেন, কিন্তু তাতেও শিশুর আগ্রহ প্রশমিত হল না। সেই ছবির উপর যে লেখাগুলি আছে সে তা পড়তে চাইল;—তখন তার পড়ার ব্যবস্থা করতেই হবে।

শিশুরা বিদ্যালয়ে আসবার পরই নিজেদের নাম লেখা কার্ড থেকে নাম পড়তে শিখবে এবং লিখতে শিখবে। দরজা, জানলা, টেবিল, চেয়ার, বোর্ড, কাগজ, খড়ি, বই ইত্যাদিও লিখিত কার্ড থেকে পড়তে ও লিখতে শিখবে—এইগুলি অবশ্য প্রাক্-পঠন ও লিখন ব্যবস্থা। কিন্তু কোনও শিশু যদি এই অবস্থাতেই আরো বেশী পড়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তা হ'লে তার পড়া বন্ধ রাখা চলবে না।

এখন কি প্রণালীতে পড়া ও লেখা আরম্ভ করতে হবে তাই বিবেচ্য। আমরা "সিলেবাসে" দেখতে পাচ্ছি যে এই শ্রেণীতে ৪৫০ শব্দ শিশুকে আয়ত্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য ৪৫০ শব্দ শিশুকে পড়তে ও লিখতে শিক্ষা দিতে হবে বলেই "সিলেবাস" কমিটি এখানে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ, নিয়মিত কথোপকথন শিক্ষা দেবার আগেই এই বয়সের শিশু ৪৫০টি শব্দের চাইতে অনেক বেশী শব্দ ব্যবহার করতে শিখেছে বলেই আমরা ধরে নিতে পারি, যদিও এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয় নি। [এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে—আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ ৬+ বৎসর বয়সের শিশুদের পরিচিত শব্দের একটি তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারবে] সে যা হোক, এখন, এই ৪৫০টি শব্দ শিশুকে শিক্ষক কিংবা শিক্ষয়িত্রী কিভাবে পড়তে ও লিখতে শেখাবেন তাই হচ্ছে আসল সমস্যা। প্রত্যেকটি শিশুকে একই ভাবে পড়ান চলবে না। যে শিশু যেভাবে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে সেইভাবে তার পড়া ও লেখার ধারাকে চালিত করতে হবে। যেদিকেই শিশুর আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হোক না কেন, শিশুকে বাক্যক্রমিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বাক্যক্রমিক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং এখানে আনন্দের স্থানও প্রচুর। জোর ক'রে অজানা অপরিচিত ও দুর্বোধ্য শব্দকে প্রথমেই ব্যবহার করতে শেখান হয় না। বরঞ্চ পরিচিত এবং সহজবোধ্য শব্দ দিয়েই এই প্রণালীতে শেখাতে হয়। বাক্যক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথাগুলি এই ঃ—

(১) বাক্য দ্বারা পড়া আরম্ভ করতে হবে।
(২) পাঠে বিচ্ছিন্ন বাক্য থাকবে না।
(৩) শব্দগুলি সবই পরিচিত হবে।
(৪) শব্দগুলির পুনরুক্তি থাকবে।

এই প্রয়োজনীয় কথাগুলি মনে রেখে এবং শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি কয়েকটি পাঠ তৈরী ক'রে নেন, তা হ'লে শিশুকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পড়ান যেতে পারবে।

শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে, কয়েকটি পাঠ রচনা ক'রে, নমুনাস্বরূপ এখানে দেখান হচ্ছে। সকল শিশুর আগ্রহই যে একই বস্তুতে কিংবা সৃজনাত্মক কাজে কেন্দ্রীভূত হবে তা বলা যায় না। বিভিন্ন শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বিভিন্ন বস্তুতে সন্নিবেশিত হবে সন্দেহ নাই। এতএব এইখানে যে কয়েকটি পাঠ দেওয়া হল তা কেবল নমুনামাত্র। শিক্ষক এই ধারাকে অনুসরণ করতে পারেন বটে, কিন্তু এই পাঠগুলিকেই একান্তভাবে আঁকড়ে বসে থাকলে ভুল করবেন। প্রত্যেকটি আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে ৩।৪টি পাঠের নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক দেখবেন যে কোনও একটি আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে অগ্রসর হ'লে কিছুদিন পরে সেই বস্তুতে শিশুর আগ্রহ কমে যায়, এবং অন্য বস্তুতে আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়। এই অবস্থায় শিক্ষককে দেখতে হবে তিনি পূর্ব আগ্রহকে অনুসরণ ক'রে কতগুলি বর্ণ শেখাতে পেরেছেন। এখন তিনি নূতন আগ্রহকে অনুসরণ ক'রে বাকি বর্ণমালা ও স্বরবর্ণ সংযোগ শেখাতে অগ্রসর হবেন। শিশুর এই আগ্রহ পরিবর্তনকে শিক্ষকের মেনে নিতে হবে। জোর ক'রে পূর্ব আগ্রহকে ধরে বসে থাকলে চলবে না। কতগুলি বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হ'ল সে বিষয়ে শিক্ষক সর্বদা অবহিত থাকবেন, যদিও প্রথম অবস্থায় শিশুকে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা সম্বন্ধে ধারণা দেবার কোনও প্রয়োজন নাই।

নিম্নে কয়েকটি আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে পাঠ দেওয়া হলঃ—

ক

ধরা যাক শিশু মাটি দিয়ে একটি আম তৈরী করেছে। এক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ মাটির আমে কেন্দ্রীভূত। অবশ্য পূর্বতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু কাঁচা আমের অম্লরস ও পাকা আমের মিষ্টরসের সঙেগ সুপরিচিত। হয়তো বা বিদ্যালয়-প্রাঙগণে একটি আমের গাছও আছে। এরূপ ক্ষেত্রে এই ধরণের পাঠ হ'তে পারেঃ—

১ম পাঠ

এটা কি ? এটা আম।	এটা, কি, আম। এ, ট, ক, আ, ম। া—আ-কার, ি—ই-কার।

২য় পাঠ

আম গাছ কই ? ঐ আম গাছ।	গাছ, কই, ঐ গ, ছ, ই, ঐ।

৩য় পাঠ

গাছে আম আছে? হাঁ, গাছে আম আছে।	আছে, হ, ঁ, ে—এ-কার।

৪র্থ পাঠ

কি রকম আম? কাঁচা আম। পাকা আম নাই।	রকম, কাঁচা, পাকা নাই। র, প, চ, ন।

৫ম পাঠ

কাঁচা আম টক। কাঁচা আম ভাল নয়। পাকা আম টক নয়। পাকা আম ভাল।	টক, নয়, ভাল। ট, ভ, ল।

খ

ধরা যাক, অন্য একটি ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ বাগানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেখানে পাঠটি নিম্নলিখিতভাবে হতে পারে:—

১ম পাঠ

বাগানে চল। বাগান কই? ঐ বাগান।	বাগান, চল, কই, ঐ ব, গ, ন, চ, ল, ক, ই, ঐ। া—আ-কার, ে—এ-কার।

২য় পাঠ

বাগানে ফুল আছে। কি ফুল আছে? গোলাপ ফুল আছে।	ফুল, আছে, গোলাপ, কি। ফ, ল, আ, ছ। ু—উ-কার, ি—ই-কার।

৩য় পাঠ

আর কি ফুল আছে? বেল ফুল আছে।	বেল, আর র।

৪র্থ পাঠ

গোলাপ ফুলের রঙ কি? গোলাপ ফুলের রঙ লাল। বেল ফুলের রঙ কি? বেল ফুলের রঙ সাদা।	রঙ, লাল, সাদা। ঙ, স, দ

৫ম পাঠ

আমরা বাগান করব। আমরা গাছ পুঁতব। কি গাছ পুঁতবে? ফুল গাছ পুঁতব।	আমরা, গাছ, পুঁতব, করব। ম, প, ত, ँ।

৬ষ্ঠ পাঠ

আমরা মাটি খুঁড়ব। কি দিয়ে মাটি খুঁড়বে? কোদাল দিয়ে আর খুরপী দিয়ে মাটি খুঁড়ব।	মাটি, খুঁড়ব, কোদাল, খুরপী দিয়ে ট, খ, ড়, য় ী—ঈ-কার।

৭ম পাঠ

আমরা খুরপী দিয়ে মাটি খুঁড়েছি। আমরা ফুল গাছ পুঁতেছি।	খুঁড়েছি, পুঁতেছি।

গ

ধরা যাক শিশুর আগ্রহ ছবি আঁকায় কেন্দ্রীভূত। সেখানে পাঠ নিম্নলিখিত ধরণের হতে পারে:—

১ম পাঠ

ছবি আঁকব। রঙ দাও।	ছবি, আঁকব, রঙ, দাও া—আ-কার, ি—ই-কার ছ, ব, আ, ক, ব, র, ঙ, দ, ও ँ

২য় পাঠ

কি রঙ চাও? লাল রঙ চাই।	কি, চাও, লাল, চাই চ, ই, ল

৩য় পাঠ

আর কি রঙ চাও? নীল রঙ চাই। সবুজ রঙ চাই।	আর, নীল, সবুজ ন, স, জ ী—ঈকার, ু—উকার

৪র্থ পাঠ

আর কি চাও? তুলি চাই। কাগজ চাই। ছবি আঁকব।	তুলি, কাগজ ত, গ

৫ম পাঠ

কি আঁকবে? গরু আঁকব, ঘোড়া আঁকব আর মানুষ আঁকব।	গরু, ঘোড়া, মানুষ। ঘ ড় ম ষ

তিনটি আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে এখানে কতগুলি পাঠের নমুনা দেওয়া হল—প্রথমে মাটির আম, পরে বাগান এবং তারপরে ছবি আঁকা। এই তিনটি আগ্রহ থেকে পাঠ আরম্ভ ক'রে কিপ্রকারে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত বর্ণমালা ও স্বরবর্ণ যোগ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তারই কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল। কোন পাঠের ধারা থেকে আবার শিশুর আগ্রহ অন্যত্র কেন্দ্রীভূত হতে পারে তা আগেই বলা হয়েছে। অতএব পাঠ তৈরী যে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের উপর নির্ভর করবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাক্যক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে পাঠগুলি রচিত হয়েছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, বর্ণমালা থেকে প্রয়োজন অনুসারে বর্ণগুলি নেওয়া হয়েছে এবং স্বরবর্ণ সংযোগও যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে তখনই সেটা করা হয়েছে। তাছাড়া পাঠগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দের যথেষ্ট পুনরুক্তি আছে।

এই প্রণালী অনুসারে শেখাতে হলে প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা ক'রে কার্ডে বড় বড় ক'রে লিখে আনতে হবে। একটি বাক্যের অন্ততপক্ষে ৪।৫টি কার্ড থাকবে। তাছাড়া ঐ বাক্যটিরই বিভিন্ন শব্দগুলি আলাদা ক'রে কেটে রাখতে হবে। প্রথম সাত আটটি পাঠে যথাসম্ভব প্রতি বাক্যের একটি কার্ডে একটি ক'রে ছবি থাকলে ভাল হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি বাক্যের ছবিবিহীন কার্ডও থাকবে। বাক্যগুলি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিশুদের দেখাবেন, বাক্যের অর্থবোধক ছবি (সম্ভব পক্ষে) দেখাবেন এবং বাক্যটিকে পূর্ণভাবে উচ্চারণ করবেন। শিশুরা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে অনুকরণ ক'রে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটিকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবে। কিছুক্ষণ এই রকম করবার পরে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বাক্যগুলিকে দিয়ে নানারূপ খেলা দেবেন, যেমন অনেকগুলি বাক্যের কার্ড ও শব্দের কার্ডের মধ্য থেকে একটি বিশেষ বাক্যের কার্ড চিনে বার করা, ছবির সঙ্গে বাক্য মেলান, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরী করা, ইত্যাদি নানারকম খেলা হতে পারে। শব্দ বিশ্লেষণ ও শব্দগঠন খেলা কয়েকটি পাঠ হয়ে গেলে পরে আরম্ভ করলে ভাল হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বর্ণমালা শিক্ষা না দিয়ে কিভাবে বাক্যগুলিকে শেখান যাবে? কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বাক্যটিকে যদি সমগ্রভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করান যায়, তবে, শিশুরা তা অবিলম্বে আয়ত্ত করতে পারবে। অবশ্য বাক্যটি তাদের পরিচিত আবেষ্টনী থেকে নিতে হবে। বিভিন্ন বর্ণগুলির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে শিশুর যে ক্লেশ বোধ হয় তার প্রধান কারণ এই যে অ-আ-ক-খর মধ্যে কোনও অর্থ অথবা আনন্দের সন্ধান সে পায় না। কিন্তু আম্রফলের মিষ্টরসের সঙ্গে যে পরিচিত সমগ্র আম শব্দটির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতেও তার কোনও কষ্ট হয় না। এই রকমভাবে,

শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য অনুসারে শিক্ষা দিলে ক্রমে ক্রমে, তাদের প্রিয় এবং পরিচিত বাক্যের সাহায্যে বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণ এবং আ-কার, ই-কার ইত্যাদি যোগ তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শিখে ফেলবে।

বাক্য ও শব্দ পরিচয় খেলা সম্পর্কে শিক্ষক নিজেই ক্ষেত্র অনুসারে ব্যবস্থা করতে পারবেন। উদ্দেশ্য হবে বাক্য ও শব্দ পরিচয়। এখন যেখানে ইচ্ছা খেলাকে তিনি পরিচালিত করতে পারবেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম দুটি পাঠের চারটি বাক্য ধরা যাক। 'এটা কি?' 'এটা আম', 'আমগাছ কই?' 'ঐ আমগাছ।'—এই চারটি বাক্য বেশ বড় বড় ক'রে লিখতে হবে। অন্ততঃ পক্ষে ১½ ইঞ্চি বড় অক্ষর। ৯।১০ সেট কার্ডে ৩।৪টি শিশু খেলতে পারবে, কোনও কোনও খেলা ৬।৭ জনও পারবে। ৪টি সেট পূর্ণ বাক্য হিসাবে থাকবে। অন্যগুলি শব্দ ভেঙে একত্রে রেখে দিতে হবে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এখন যেভাবে হোক খেলা দিতে পারেন।

অন্ততঃপক্ষে ২৫ হাত দূরে বাক্য ও শব্দগুলি রেখে তিনি ৬।৭টি শিশুকে প্রত্যেককে এক একটি বিভিন্ন বাক্য আনতে বলতে পারেন। —"কে আগে আনতে পারে"—এই খেলায় শিশুরা কত আনন্দ পাবে তা সহজেই অনুমেয়।

আরো অন্যান্য খেলা দেওয়া যেতে পারে। ছবি দিয়ে বাক্য মেলান, বাক্য দেখে, শব্দ থেকে বাক্য গঠন ইত্যাদি। এই সমস্ত খেলাতেই "কে আগে করতে পারে"—এইরকম ব'লে দিলে শিশুরা খেলতে অত্যন্ত আনন্দ এবং উৎসাহ লাভ করবে।]

(৭)

লেখা-শিক্ষা

এ পর্যন্ত কেবল পড়ার কথাই বলা হয়েছে। লেখা কোন্ সময় থেকে এবং কিভাবে শেখাতে হবে, তাও শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্রীর জানতে হবে।

শিশুকে লিখতে শেখাবার পূর্বে দুইটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—

(১) প্রথমতঃ, যে শব্দ শিশুরা শিখবে তার দৃশ্যরূপের সঙ্গে তাদের পরিচয় গভীর হওয়া প্রয়োজন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, শিশুদের নিজেদের হাত এবং আঙুলের ক্ষুদ্র পেশীগুলি তাদের আয়ত্তাধীন হওয়া চাই যাতে পরিচিত রূপটি তারা সহজেই রেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারে। সাধারণতঃ ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই এই ক্ষমতার প্রথম উন্মেষ হয় বটে, কিন্তু, তবুও ডান হাতের আঙুলগুলিকে নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে বহু অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই বয়সে শিশুদের ইচ্ছামত ছবি আঁকতে এবং হিজিবিজি কাটতে দিলে তাদের লিখন-ক্ষমতার দ্রুত বিকাশ হয়। মাটি বা বালির উপর কাঠি দিয়ে আঁচড় কাটতে তারা ভালবাসে। স্কুলঘরের মাটির দেওয়ালে, নির্দিষ্ট স্থানে ফুল, লতা, পাতা, মানুষ, বাড়ি, পাখী ইত্যাদি আঁকতে দিলে শিশুদের উৎসাহ বাড়ে। এতে কোনও রকম অসুবিধা অথবা ব্যয়বৃদ্ধি হয় না, কারণ, কিছুদিন পরপরই দেওয়ালটি নতুন ক'রে নিকিয়ে দিয়ে নতুন চিত্রাঙ্কন চলতে পারে। "কুমোরের রঙ" এবং মোটা তুলি পেলে শিশুরা হাতে যেন স্বর্গলাভ করে। রঙীন চক দিলেও তাদের আনন্দের সীমা থাকে না, নিতান্ত অভাবপক্ষে সাদা খড়ি অথবা কাঠকয়লা পেলেও তারা মনের আনন্দে ছবি আঁকে; এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ভবিষ্যতের হস্তলিপির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রাক্-পঠন অবস্থায় শিশুদের কার্ড থেকে নিজের নাম বার করতে দেওয়া হয়েছিল। ছবি হিসাবে নিজেদের নাম তারা তখন চিনেছে। দরজা, জানালা, বই, খড়ি ইত্যাদি শব্দও তারা কার্ডে লেখা ও জিনিষে আঁটা অবস্থায় দেখেছে, এবং সেইভাবে, ছবি হিসাবে চিনেছে। এখন নিজেদের নাম এবং এই সকল জিনিষগুলির নাম তারা ছবি হিসাবে এঁকে বা লিখে

ফেলবে। এই রকম লেখা বা আঁকা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা যথেষ্টভাবে হিজি-বিজি কাটবে এবং ছবি আঁকবে। হিজিবিজি থেকে অক্ষরের মূলগত আকৃতি বার ক'রে পরে অক্ষরে পরিণত করবার কৌশল শিশুকে দেখিয়ে দিতে হবে, যথা ঃ—

হিজিবিজি—
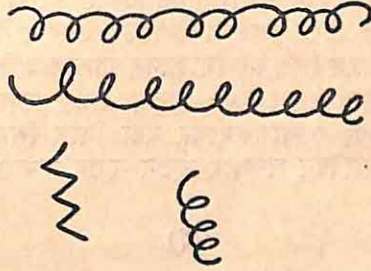
থেকে < √ ইত্যাদি আকৃতিগুলি প্রথমে বের ক'রে পরে শিশুদের ব র ক ও ত অ ইত্যাদি অক্ষর তাড়াতাড়িই শেখান যেতে পারবে। এদিকে ছবি আঁকা হিসাবে "বাবা", "'মামা", "কাকা", "বই আন", "দরজা খোল", এই শব্দ ও বাক্যগুলি শিশুরা আয়ত্ত ক'রে ফেলবে। একদিকে পড়ার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অক্ষর পরিচয় হচ্ছে, অন্য দিকে লেখার মধ্য দিয়ে অক্ষর পরিচয় হচ্ছে, এবং পরিশেষে আঁকার মধ্য দিয়ে অক্ষর, শব্দ ও বাক্যের ছবির সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। এই ত্রিমুখী অভিযান থেকে শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি লিখতে শিখে ফেলবে। মূলগত আকৃতি, অক্ষর, অক্ষরের প্যাটার্ণ ইত্যাদি শিক্ষা দেবার সময়ে শিশুদের রঙ এবং তুলির ব্যবহার করতে দিতে হবে। তা হ'লে আশা করা যায় যে তাদের লিখতে শেখাতে আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না। পরে শিশুরা যা নিজেরা ব্যক্ত করতে চায় তাই লিখবে। এই সময়ে চিঠি লিখতে উৎসাহিত করা খুব ভাল। শিশুরা হয়তো সম্পূর্ণ চিঠি লিখতে পারবে না। কিন্তু আগ্রহ থাকার দরুণ তাদের শিক্ষা অগ্রসর হবে খুব তাড়াতাড়ি।

এই রকমভাবে শিশুদের পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে আনন্দের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করলে শিশুরা এক বৎসর কালের মধ্যে ছোট ছোট গল্পসম্বলিত ছবির বই নিজেরাই পড়ে ফেলতে পারবে। এই বয়সে যুক্তাক্ষর বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যদিও শেষ দিকে অতি সাধারণ এবং অতি প্রচলিত কয়েকটি যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ শেখান যেতে পারে এবং এমন সব যুক্তাক্ষর দেওয়া যেতে পারে যাতে সংযুক্ত বর্ণগুলির আকৃতি বিশেষ বিকৃত হয় নি, যথা বৃহস্পতি-বার অথবা মঞ্জুরাণী। এই সকল অতি পরিচিত শব্দকে ভেঙ্গে বৃহসপতি, মনজুরাণী ইত্যাদি লিখলেই বরঞ্চ পরে শিশুর গোলযোগ লেগে যেতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর উপযোগী বই হয়তো বেশী পাওয়া যাবে না। এদের পরিচিত আবেষ্টনী থেকে শব্দ এবং ঘটনা নিয়ে শিক্ষক মহাশয় নিজেই যদি এদেরই মুখের ভাষায় এদের জন্য দুই একটি হাতে লেখা বই রচনা করেন তা হ'লে ভাল হয়। এই পুস্তক রচনার কাজে শিশুদের সাহায্য করতে দিলে তাদের কাছে বইয়ের মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি পায়। তারা মলাটে রঙ দিতে পারে। গল্প ও ছড়াগুলি নিজেদের সাধ্যানুসারে বিচিত্রিত করতে পারে। দুই একটি বুদ্ধিমান্ শিশু যদি লিখতে শিখে থাকে, তাদের এই বইয়ের ২।১টি পাতা লিখতে দিলেই সব শিশুর লিখতে শেখার আগ্রহ বাড়বে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু বলবার নাই, কারণ, প্রথম শ্রেণীতে যে সকল শিক্ষার সূত্রপাত এবং ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল, প্রধানতঃ সেইগুলিকেই দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনুধাবন করতে হবে।

(ক)

প্রথম শ্রেণীতে যে সকল উপায় অবলম্বন ক'রে শিশুদের মৌখিক ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে শেখান হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতেও সেইগুলি চালিয়ে যেতে হবে। গল্প এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে, স্বাভাবিক-ভাবে কথা বলতে শেখাতে হবে। নানা ধরণের গান, গল্প ও ছড়া শুনিয়ে, পড়িয়ে এবং মুখস্থ করিয়ে তাদের প্রকাশভঙ্গীর উন্নতিসাধন করতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের অভিনীত নাটক প্রথম শ্রেণীর চেয়ে কিছুটা উন্নততর এবং জটিলতর হবে। এই বৎসরের শেষে আশা করা যেতে পারে যে শিশুরা নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে কোনও বস্তু বা ঘটনা অথবা তাদের জানা যে কোনও গল্প, সহজ ভাষায় বর্ণনা করতে পারবে। নানাবিধ গল্প, আলোচনা এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক মহাশয় শিশুদের গৃহ, পরিবার, বিদ্যালয় এবং গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে নূতন নূতন কথাও শেখাবেন।

(খ)

প্রথম শ্রেণীতে বাক্যক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রথমেই বর্ণমালা না শিখিয়ে শিশুদের পরিচিত এবং সুবোধ্য শব্দ দ্বারা রচিত বাক্যের সাহায্যে কেমনভাবে পড়তে শেখান যায় তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতেই এই সকল বাক্যের মধ্য দিয়ে সব কয়টি বর্ণের সঙ্গেই শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর শেষার্ধে শব্দ বিশ্লেষণ ও শব্দ গঠন ক'রে শিশুরা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বর্ণমালার সঙ্গে গভীর-ভাবে পরিচিত হয়েছে। তাদের পরিচিত শব্দ দিয়ে লেখা দুই একটি সহজ বইও তারা পড়তে পেরেছে।

কোনও বিশেষ শিশুর পক্ষে প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম ভাগেও এই শব্দ গঠন ও শব্দ বিশ্লেষণ চালাতে হবে। নানারকম খেলার মধ্য দিয়ে পাঠ অভ্যাস করালে তারা আনন্দের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেবে। দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম ভাগ থেকেই শিশুদের পঠন ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে, এবং দ্বিতীয় বৎসরের শেষে এরা যে কোনও সহজ বই অনায়াসে পড়তে পারবে।

এই সময়ে যে সকল বই তারা পাবে সেগুলি যদি সরল পাঠ্য, সহজবোধ্য এবং হৃদয়-গ্রাহী না হয়, তা হ'লে নিতান্ত বাধ্য হয়ে তারা কিছুটা পড়তে শিখবে, কিন্তু সেই পাঠাভ্যাসের মধ্যে তারা কোনও রকম রসাস্বাদন পাবে না। ক্রমে লেখা পড়ার প্রতি তাদের একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মাবে। পাঠশালায় নিতান্ত বাধ্য হয়ে তারা কিছুটা লিখবে, পড়বে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তার আর কোনও চর্চাই তারা রাখবে না এবং ক্রমে তারা তা একেবারে ভুলে যাবে।

শিশুরা যখন প্রথম স্বাধীনভাবে পড়তে শেখে সেই সময়ে তাদের হাতে উপযুক্ত বই দিতে পারলে তারা পড়বার আনন্দে এবং জানবার আগ্রহে অনেক পড়ে ফেলবে। এইরূপে কেবল যে তারা পড়তে শিখবে তাই নয়, উপরন্তু লেখাপড়ার প্রতি এমন একটি গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ তাদের মনে জন্মাবে, পরবর্তী জীবনে যা চিরস্থায়ী হবে, এইজন্য প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোট শিশুদের উপযুক্ত অনেক হৃদয়গ্রাহী বই থাকা প্রয়োজন। শিশুদের উপযোগী বই সংগ্রহ করবার সময়ে তিনটি কথা মনে রাখতে হবে—

(১) প্রথমতঃ এই বইগুলির ভাষা সহজপাঠ্য হওয়া উচিত। একেবারে প্রথমে যথা-সম্ভব যুক্তাক্ষরবর্জিত বই শিশুদের দিতে হবে। ক্রমে ক্রমে যুক্তাক্ষরযুক্ত বই দিলে তারা পড়তে পারবে।

(২) কেবলমাত্র ভাষাই নয়, এই সকল বইয়ের বর্ণিত বিষয়গুলিও সহজবোধ্য এবং শিশুচিত্তাকর্ষক হওয়া প্রয়োজন।

(৩) ছোট শিশুদের জন্য রচিত বইয়ের পাতায় পাতায় সুন্দর ছবি থাকা উচিত, এবং ছাপার অক্ষরগুলি পরিষ্কার ও বড় বড় হওয়া উচিত।

(গ)

যে সকল খেলা ও হাতের কাজে শিশুরা উৎসাহ প্রকাশ করে, তার মধ্য দিয়ে, গল্পচ্ছলে কেমন করে তাদের পড়তে শেখানো যায় তার বর্ণনা পূর্বেই কিছুটা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা খেলাচ্ছলে কিছু শিল্পকাজও আরম্ভ করতে পারবে। এই সকল শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা এবং দিনলিপির মধ্য দিয়ে একাধারে তাদের কথিত ভাষা, লেখা এবং পড়ার উন্নতিসাধন করা যেতে পারে।

(ঘ)

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম ভাগ থেকেই শিশুদের নবোন্মেষিত লিখন ক্ষমতার যথেষ্ট চর্চার প্রয়োজন। কিন্তু, কেবলমাত্র হস্তলিপি ও শ্রুতলিপির দ্বারা লেখা অভ্যাস করালে শিশুরা কেবল যান্ত্রিকভাবেই লিখতে শেখে, সহজ মনের ভাবকে স্বাভাবিক ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাদের জন্মায় না।

প্রথম থেকেই শিশুদের এমন বিষয়ে লিখতে দিতে হবে, যা তাদের কাছে বাস্তব এবং অর্থপূর্ণ; তাদের দৈনিক জীবনের কাজকর্ম, গান, গল্প, খেলা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রথম থেকেই শিশুদের এমনভাবে লিখতে শেখাতে হবে, যাতে তারা লেখাকে নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করবার একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রণালী ব'লেই বোঝে—কেবলমাত্র একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব'লে মনে না করে।

যতদিন না শিশুরা অনায়াসে লিখতে শেখে, ততদিন হাতের লেখার সৌষ্ঠবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া চলবে না। কোনওমতে দুই একটি সহজ বাক্যকে রেখায় ফুটিয়ে তোলাই যে শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাকে আবার সুন্দরভাবে লিখবার জন্য তাগিদ দিলে বেচারী বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। বরঞ্চ, সে যে লিখতে শিখেছে সেইজন্য তাকে প্রশংসা করলে ও উৎসাহ দিলে সে আরো বেশী ক'রে লিখবে এবং ক্রমে তার হস্তলিপির উন্নতি হবে। শিক্ষকের নিজের হস্তলিপি সুষ্ঠু হওয়া অবশ্য প্রয়োজন, কারণ, অনবরত সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখলে শিশুরা সহজেই সুন্দরভাবে লিখতে শেখে। যে শিশুরা সুন্দর লিখতে পারে তাদের বিশেষভাবে প্রশংসা করলেও বাকি সব কয়টি শিশুর মনে সুন্দরভাবে লিখবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা জন্মায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা শিক্ষকের সাহায্যে নিজেরাই নিজেদের শ্রেণীপুস্তক তৈরী করতে পারবে। শিক্ষকের সংগৃহীত যে সকল গান, ছড়া ও কবিতা শিশুরা শিখবে, সেইগুলি তারা স্বহস্তে পুস্তকে লিখবে এবং নিজেরাই সেইগুলিকে চিত্রিত করবে। যে সকল নাটক তারা অভিনয় করবে, তাও তারা লিখে রাখবে। বিদ্যালয়ের বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠানাদি এবং কাজকর্ম সংক্রান্ত সমস্ত খবর ও আলোচনা এবং শিশুদের নিজেদের গ্রাম্যজীবনের সকল স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনাও এই পুস্তকেই লিপিবদ্ধ হবে। শিক্ষকের কাছ থেকে যে সকল গল্প শিশুরা শুনবে সেগুলিও তারা তাদের নিজস্ব সরল ভাষায় এই পুস্তকে লিখে রাখতে পারে। এতে তারা প্রচুর আনন্দ লাভ করবে। এই বইয়ে লিখতে পাওয়া শিশুদের একটি মস্ত বড় গৌরবের সামগ্রী ব'লে প্রতিপন্ন হবে। তা হ'লে শ্রেণীপুস্তকে লিখবার আগ্রহে ক্রমে তাদের হাতের লেখা আরো সুন্দর হবে। অবশ্য যে সকল শিশু সুন্দরভাবে লিখতে পারবে না, তাদেরও শ্রেণীপুস্তক তৈরীর কাজ থেকে একেবারে বাদ দিলে চলবে না; তা হ'লে বেচারীরা বড় দুঃখ পাবে। শ্রেণীপুস্তকে ও তার মলাটে রঙ দেওয়া ও ছবি আঁকার কাজে তারা সাহায্য করতে পারবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষ ভাগে আমরা আশা করতে পারি যে, শিশুরা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে কোনও ঘটনা অথবা তাদের প্রিয় যে কোনও গল্প বা রূপকথা, শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই, মোটামুটিভাবে, নিজেদের স্বাভাবিক ভাষায় লিখতে পারবে।

অষ্টম অধ্যায়

সহজ গণিত

শিশু কেন, কখন, কেমন করে, কি গণিত শিখবে

সূচনা

এতদিন শিশুদের যেভাবে অঙ্ক শেখান হয়েছে তাতে তাদের গ্রহণ ও ধারণক্ষমতার ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নি ; কারণ শিক্ষক মহাশয়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ ও সম্পন্ন করতে হ'ত—পাঠ্যক্রমের বিষয়ের সঙ্গে শিশুর দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতার কোন যোগাযোগ ছিল না—বিচ্ছিন্নভাবে তাদের বিভিন্ন বিষয় শেখান হ'ত। ফলে শিশুর অঙ্কের জ্ঞান হ'ত অবাস্তব—শিশু শিখত কতগুলো নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়া—যন্ত্রচালিতের ন্যায় শিশু অঙ্ক কষতো, কিন্তু তার প্রয়োজন বাস্তব জীবনে অনুভব ক'রতে পারত না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্কের প্রতি শিশুর অহেতুক ভীতির সঞ্চার হ'ত এবং অঙ্কে শিশুর অনুরাগ বা আগ্রহের অভাব দেখা যেত। এপর্যন্ত বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ ক'রে বিভিন্ন বিষয় পৃথকভাবে শিশুকে শেখান হ'ত ; ফলে শিশু বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানলাভ ক'রত এবং এই জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা কঠিন হ'ত। বিচ্ছিন্ন জ্ঞান বাস্তব জীবনে আমাদের কোন কাজে লাগে না। আমরা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান বিভিন্ন উপায়ে লাভ করি, কিন্তু এই জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ ক'রতে হলে অখণ্ডরূপে গ্রহণ ও ধারণ করা প্রয়োজন।

নবপরিকল্পিত প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও পাঠ্যক্রম নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশুর প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি ক'রে প্রবর্তন করা হয়েছে। শিশু তার নিজ পরিবারে বাস করে—তার পরিবার একটি সমাজভুক্ত—শিশু বিদ্যালয়ে আসে—তার বিদ্যালয়ও একটি ক্ষুদ্র সমাজবিশেষ। গৃহে বা বিদ্যালয়ে শিশু যেখানেই থাকুক না কেন সে নানাপ্রকার কর্মের সম্মুখীন হবে। এইসব কর্মের ভেতর দিয়ে শিশু নানাপ্রকার জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ পাবে। কর্মই শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তি—তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয় হবে কর্মকেন্দ্রিক, যেখানে শিশু পাবে কর্ম করবার অফুরন্ত সুযোগ। বিদ্যালয়ে খেলাধুলাও নাচ, গান, হাতের কাজ, বাগানের কাজ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর কর্ম করবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে। আর এই সব কাজ ক'রতে গিয়ে শিশু নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে—নিজেই তার সমাধান ক'রতে চেষ্টা ক'রবে—প্রয়োজনবোধে শিক্ষক সাহায্য করবেন—শিশু নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ক'রবে এবং এই জ্ঞান শিশুর অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের তারতম্য লক্ষ্য ক'রে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারেন। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় পৃথক ক'রে শিক্ষাদানের প্রয়োজন নাই। শিশুর বিভিন্ন কাজকে ভিত্তি ক'রে একই শিক্ষক একই শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় অবিভিন্নভাবে শিক্ষাদান করবেন।

শিশু কেন অঙ্ক শিখবে

গৃহের বা বিদ্যালয়ের কাজকর্ম করতে হলে হিসেব নিকেশের প্রয়োজন শিশু অনুভব ক'রবে। হিসেব নিকেশ করতে হলে শিশু অঙ্ক শিখবার প্রয়োজন বোধ করবে। তাছাড়া অঙ্ক শেখার মধ্য দিয়ে শিশুর সময়জ্ঞান ও গতি, শুদ্ধতা, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা শৃঙ্খলাবোধ, আত্মবিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রকাশ পাবে।

শিশু অঙ্কের কোন বিষয় কখন শিখবে

শিশুর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, যেমন বাগানে ক'টা গাছ বা বীজ পোঁতা হল, কতজন কাজ ক'রল, কতক্ষণ কাজ ক'রল, কত তার সুতা কাটল ইত্যাদির অবলম্বনে স্বাভাবিক উপায়ে শিশু অঙ্ক শিখবে। যখনই অঙ্কের কোন বিষয় শিশু শিখবে তার বারবার আলোচনার প্রয়োজন হবে।

শিশু কেমন ক'রে অঙ্ক শিখবে

প্রত্যেক শিক্ষকই ইচ্ছে করেন যে তাঁর পাঠদান শিশুর কাছে আকর্ষণের বস্তু হোক। কিন্তু অঙ্কের বিষয়বস্তু বিশেষতঃ সংখ্যার দ্বারা গঠিত হওয়াতে এবং কোন কোন স্থলে উপস্থাপনের ত্রুটি থাকায় অনেকের কাছে এই বিষয় নীরস ব'লে মনে হয়। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে অঙ্কের প্রতি অনুরাগ থাকে না। যে কোন বিষয় শিক্ষাদান ক'রতে গেলে অনুরাগের প্রয়োজন। যেখানে অনুরাগ থাকে না সেখানে অনুরাগ সৃষ্টি ক'রতে হবে। শিশুর দৈনন্দিন কার্যকলাপ, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, হাতের কাজ ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে অঙ্কের বিষয়বস্তু উপস্থাপন ক'রলে অঙ্কের প্রতি শিশুর অনুরাগ জাগ্রত হ'তে পারে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম

১। আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, সময়, পরিমাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবার জন্য সুযোগদান।

২। স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলার সাহায্যে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা।

৩। দলগতভাবে দুই দুই, তিন তিন, অথবা দশ দশ ক'রে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা।

৪। ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও লেখা।

৫। যোগ, বিয়োগ ও সমান চিহ্নের সহিত পরিচয়।

৬। ১—১০, ১১—২০ পর্যন্ত সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণ।

৭। স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলার সাহায্যে ওজনের সঙ্গে পরিচয়, যেমন দোকান দোকান খেলা, বিদ্যালয়সংলগ্ন বাগান থেকে তরিতরকারী উৎপাদন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—সের, আধ সের, পোয়া ইত্যাদির ধারণা—কাতাই করার সময় সুতার ওজন, যথা তোলা।

৮। রৈখিক পরিমাপ—হাত, বিঘত, আঙুল ও এক গজ বা এক ফুট কাঠির সাহায্যে শ্রেণীকক্ষ, শিশুগণের উচ্চতা ইত্যাদির পরিমাপ।

৯। সময়ের পরিমাণ—সময়, দিন, সপ্তাহ ও মাসের সঙ্গে পরিচয়।

১০। মুদ্রা—টাকা, আনা, পয়সা—বাজার করা বা খেলার দোকানের সাহায্যে গণনা শিক্ষা—মুদ্রা কথায় প্রকাশ ক'রতে হবে, সংখ্যায় নয়।

১১। হাতে না রেখে ২ ঘর সম্বলিত ৫০এর মধ্যে সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ—দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সমস্যামূলক প্রশ্নের সমাধান।

১২। সংখ্যা গণনা—যোগ ও বিয়োগ সম্পর্কে বল ফ্রেম বা Abacus এর ব্যবহার।

১। **আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, সময়, পরিমাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণালাভ করবার জন্য সুযোগদান।**—বিদ্যালয়ে আসবার আগে এই সব বিষয় সম্বন্ধে শিশুর খানিকটা ধারণা থাকে। অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যাবে যে বাড়ীতে নানারকম জিনিষের সঙ্গে শিশুর পরিচয় হ'য়েছে এবং ঐ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সে কতকটা জ্ঞান লাভ করেছে। বিদ্যালয়ে আসার পর শিশুকে খবরাখবর বলতে বললে সে হয়ত তার বাড়ীর বাগানের "অনেক" ফুল বা "বেগুন" বা "ঢেঁড়সের" কথা বলতে পারে কিংবা "মস্ত" বড় মাছ বা কোন জীবজন্তুর,

কথাও বলতে পারে। আবার এর উল্টো কথাও সে অনেক সময় ব'লে থাকে। যেমন—বাড়ীতে সে খুব "কম" ভাত খেয়েছে—তার বাড়ীতে "কম" লোক আছে ইত্যাদি। তার বাড়ী থেকে বিদ্যালয় "দূরে" বা "কাছে" এরকম ধারণাও বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিশুর থাকতে পারে। সুতরাং এগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে বিদ্যালয়ে অঙ্কের কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। সেখানে এমন কাজ কর্মের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যার দ্বারা শিশুর ঐসব বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় আরও বেশী হয়। শিশু যত জ্ঞান লাভ ক'রতে থাকবে এমন কতকগুলি বিষয় আসবে যাদের বারবার আবৃত্তি দরকার হবে।

একটা কাগজের বাক্সে খড়ি, কলমের নিব, কাগজ আটকাবার ক্লিপ প্রভৃতি রাখা যেতে পারে। শিশুকে ঐ জিনিষগুলো মেজেতে সাজাতে বললে যে উৎসাহের সঙ্গে একাজ করবার চেষ্টা ক'রবে। জিনিষগুলো যোগাড় করবার সময় মনে রাখতে হবে যে একরকমের জিনিষ যেন একই আকারের হয় যাতে শিশু সহজে একইরকমের জিনিষ সাজাতে পারে। এভাবে বিভিন্ন জিনিষ ও বিভিন্ন আকারের সঙ্গে তার পরিচয় হবে।

একটা বাক্সের মধ্যে কতকগুলো ছোট বড় নানা আকারের খেলনা বা কাঠের টুকরো দিয়ে শিশুকে বড় ও ছোট জিনিষগুলো আলাদা আলাদা ক'রে রাখতে বলা যেতে পারে। এভাবেও আকার সম্বন্ধে তার ধারণা হবে।

দুটো সমান আকারের বাক্সে একটার মধ্যে ভারী এবং আর একটার মধ্যে হালকা জিনিষ দিয়ে শিশুকে কোনটা ভারী কোনটা হালকা যদি বেছে দিতে বলা যায় তা হ'লে শিশু দুটো বাক্সই হাতে তুলে অনুভব ক'রে হাল্কা ও ভারী সম্বন্ধে ধারণা লাভ ক'রতে পারে।

এমন দুটো কাগজ নেওয়া যেতে পারে যার একটায় অনেকগুলো ফুল বা মানুষের ছবি আর অন্যটায় তার তুলনায় খুব কম ছবি আছে। দুটো কাগজই শিশুর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কোন কাগজে বেশী বা কম ছবি আছে। এতে শিশুর কম ও বেশী সম্বন্ধে জ্ঞান হতে পারে।

বিভিন্ন মাপের কাঠি, খড়ি, পেনসিল প্রভৃতি দিয়ে শিশুকে লম্বা ও ছোট সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যায়। এছাড়া শিশুদের একটা সারিতে দাঁড় করিয়ে কে কার চেয়ে লম্বা বা ছোট জিজ্ঞাসা করলে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা এবিষয়ে জ্ঞান লাভ ক'রতে পারে।

শিক্ষক এরকমের নানাপ্রকার খেলার ব্যবস্থা করতে পারেন।

২। **স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলার সাহায্যে ৫0 পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শিক্ষা।**—(ক) সংখ্যা বলা।—শিক্ষক শিশুকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন—(১) তোমার হাত কয়টি, চোখ কয়টি, ইত্যাদি; (২) তোমরা কয় ভাই বোন, তোমাদের বাড়ীতে কতজন লোক ইত্যাদি; (৩) তোমাদের বাড়ীতে কয়টি ঘর, কয়টি দরজা, জানালা ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে শিশুর সংখ্যা বলার অভ্যাস হবে।

প্রথমদিকে বাস্তব জিনিষ, ছবি, বা কাজের ভেতর দিয়ে সংখ্যার পরিচয় দেওয়া উচিত। এগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিশুর যে অভিজ্ঞতা হবে তাতে সে বুঝবে সংখ্যাগুলো অর্থশূন্য নয়—সংখ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ আছে। "দুই" বললে সে যেন বুঝতে পারে দুটি জিনিষ, যেমন—দুটি বল, দুটি লাট্টু, দুটি মার্বেল, দুটি আম, দুটি ভাই ইত্যাদি। "দুই" শিখলে সে যেন "দু" পয়সার মুড়ি বা মুড়কি কিনতে পারে—দুটো ফুল বা ফল আনতে পারে।

মাটির কাজ বা অন্যান্য হাতের কাজের ভেতর দিয়ে শিশু সংখ্যা শিখতে পারে। মাটি দিয়ে খেলনা বা ফল তৈরী করবার সময় ওগুলোর সংখ্যা ব'লতে পারে।

সংখ্যাসম্বলিত ছড়া আবৃত্তি করার সাহায্যে সংখ্যা বলা অভ্যাস করান যেতে পারে। শিশু কোন কাজ ক'রছে—ঐ সময় সে যদি ছড়া আবৃত্তি করে তা হ'লে কাজটা আনন্দদায়ক

হবে, পরিশ্রম কম বোধ হবে এবং সংখ্যা বলারও অভ্যাস হবে। নিম্নে দুই একটি ছড়ার উদাহরণ দেওয়া গেল—এ জাতীয় ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে—

(১)

এক দুই শুই শুই
চুপ কর্ খুকী তুই।
তিন চার খাবে মার
দুষ্টুমি নয় আর।
পাঁচ ছয় আর নয়
শুয়ে পড়ো রাত হয়।
সাত আট পেতে খাট
খোকা শোয় বড় লাট।
ন' দশ বস্ বস্
নাক ডাকে ভঁস্ ভঁস্।

(২)

বাংলা দেশের একটি ছেলে
নামটি সুভাষ তার,
লুকিয়ে গেল বিদেশ চ'লে
সাত সাগরের পার।

গড়ল সেনা করতে আজাদ
মোদের ভারত ভুঁই
রাসবিহারী জুটল সাথে
একে একে দুই।

আজাদী দল গুছিয়ে গড়ে
বীর সে মোহন সিং,
সাদা সেনা মারতে এ'গোয়,
দুয়ে একে তিন।

রাঘবনে নিয়ে গড়ে
আজাদী সরকার
সুভাষ বোসের বীর সাথীরা
তিনে একে চার।

চাটুজ্জ্যে বীর এগিয়ে এসে
চালান শাসন কাজ ;
এই বীরেরা মিলে হ'ল
চারে একে পাঁচ।

ভোঁসলে এলো ভীষণ জোর
ভীষণ কথা কয়,
ছুটিয়ে ঘোড়া আনবে বিজয়
পাঁচে একে ছয়।

শাহনওয়াজ জোরসে এলো
সুভাষ বোসের সাথ।
আরকে তাদের রুখবে বলো,
ছয়ে একে সাত।

সৈগল এসে সেনা চালায়
চৌদিকে মার কাট,
বোস নেতাজীর সেনা-দলে
সাতে একে আট।

ধীলন আসে ধীরে ধীরে
মুখে বলে জয়।
সকল বীরে ঘুঁসি পাকায়
আটে একে নয়।

লখখী এল তেজী মেয়ে,
বাড়িয়ে দিল যশ।
গড়ল কত মেয়ে সেনা,
নয়ে একে দশ।

(৩)

মামাদের দরজায়
বাঘা থাকে এক ;
তেড়ে নাহি আসে, নাহি
করে ভেক্ ভেক্।

মামাদের পুকুরেতে
আছে বড় রুই ;
পশু আর মাছে মিলে
একে একে দুই।

মামাদের বাগানেতে
চরিছে হরিণ ;
দুই পশু, এক মাছ—
দু'য়ে একে তিন।

মামাদের রাঙা গরু
কিবা রূপ তার ;
তিন পশু, এক মাছ—
তিনে একে চার।

মামাদের বানরের
কি মজার নাচ !
চারি পশু, এক মাছ—
চারে একে পাঁচ।

মামাদের সাদা ভেড়া
উঠানেতে রয় ;
পাঁচ পশু, এক মাছ—
পাঁচে একে ছয়।

মামাদের খরগোস
চাটে এসে হাত ;
ছয় পশু, এক মাছ—
ছয়ে একে সাত।

মামাদের পোষা মেনি
যেন বড় লাট !
সাত পশু, এক মাছ—
সাতে একে আট।

মামাদের রাজহাঁস
পুকুরেতে রয়,
পশু, পাখী, মাছে মিলে—
আটে একে নয়।

মামাদের চাকরের
হয়েছে বয়স,
সবে তারে ভালবাসে,
নয়ে একে দশ।

(৪)

হারাধনের দশটী ছেলে
ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল
রইল বাকি নয়।

হারাধনের নয়টি ছেলে
কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দু'খান হল,
রইল বাকি আট।

হারাধনের আটটি ছেলে
ব'স্‌লো খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল,
রইল বাকি সাত।

হারাধনের সাতটি ছেলে
গেল জলাশয়,
একটি সেথা ডুবে ম'ল
রইল বাকি ছয়।

হারাধনের ছয়টি ছেলে
চ'ড়তে গেল গাছ,
একটি ম'ল পিছলে প'ড়ে,
রইল বাকি পাঁচ।

হারাধনের পাঁচটি ছেলে
গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে,
রইল বাকি চার।

হারাধনের চারটি ছেলে
নাচে ধিন্ ধিন্,
একটি ম'ল আছাড় খেয়ে,
রইল বাকি তিন।

হারাধনের তিনটি ছেলে
ধ'রতে গেল রুই,
একটি খেল বোয়াল মাছে,
রইল বাকি দুই।

হারাধনের দুইটি ছেলে
মারতে গেল ভেক,
একটি ম'ল সাপের বিষে,
রইল বাকি এক।

হারাধনের একটি ছেলে
কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল,
রইল না আর কেউ !

(খ) **সংখ্যা পড়া ও লেখা।**—সংখ্যা বলার অভ্যাস কতকটা অগ্রসর হলে সংখ্যা-পড়া শেখান যেতে পারে। ছড়াগুলো যদি পর পর বোর্ডে লিখে দেওয়া যায় তাহলে শিশু শিক্ষকের সাহায্যে পড়তে শিখবে। ছবি বা অন্য জিনিষের সাহায্যে শিশুর সম্মুখে সংখ্যাগুলো উপস্থিত করলে সে ছবির সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যা মিলিয়ে সংখ্যা-পড়া শিখতে পারবে। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন সংখ্যা পড়বার সময় শিশুরা যেন ক্রমিকভাবে ঐগুলি পড়ে।

দিনপঞ্জী (ক্যালেণ্ডার) দেখে মাসের তারিখ জানবার সময় শিশু এক থেকে একত্রিশ (৩১) পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পড়তে পারে। বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখে আরও বেশী সংখ্যা পড়তে পারে।

সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশু বুঝতে পারলে সংখ্যার দলগত অর্থ তার বোঝা দরকার। কোন জিনিষ একা থাকলে তাকে একটি বলে, পাঁচটি থাকলে পাঁচ বলে। এই জ্ঞান শিশু তার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েও লাভ করবে। এই অর্থ যাতে শিশুর মনে বদ্ধমূল হয় সেজন্য সংখ্যা ছক ব্যবহার করতে পারে—উদাহরণস্বরূপ ডমিনো পদ্ধতি।

ডমিনো পদ্ধতি
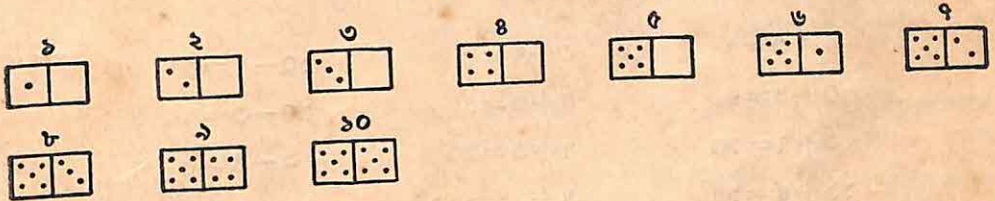
এখন অঙ্ক—কথা—সংখ্যা ছক ও সংখ্যার দলগত অর্থ খেলার ছলে শিশুর মনে বদ্ধমূল করা যায়। একটা কাঠের টুকরোর ওপর সুন্দর ক'রে আঁকা পাখী বা ফল ইত্যাদির ছবি বোর্ডে হুক থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এই ছবিগুলোর পরিচায়ক সংখ্যা বিভিন্ন কাঠের টুকরোর ওপর লেখা থাকবে। শিশুকে বলা যেতে পারে নির্দিষ্ট ছবির নীচে উপযুক্ত সংখ্যা-লেখা কাঠের টুকরা ঝুলিয়ে দিতে—সংখ্যা-লেখা কাঠের টুকরাগুলো খুলে নিয়ে আবার উপযুক্তস্থানে ঝুলিয়ে দিতে বলা যেতে পারে—এতে পুনরালোচনার দ্বারা সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ হয়।

শিশু কোন দিন কি কাজ করেছে, কি কি জিনিষ তৈরী ক'রেছে তার হিসেব রাখবার জন্য সংখ্যা লিখবার দরকার হবে। সংখ্যা-বলা ও পড়ার সময় শিশু যে সংখ্যাগুলো শিখেছে সেগুলি সে অঙ্কে ও ভাষায় লিখবে। প্রথমে শিক্ষক বোর্ডে বা মেজেতে সংখ্যাগুলো

পর পর লিখে দেবেন—শিক্ষকের লেখার ওপর দিয়ে শিশু লিখবে। তারপর শিক্ষক কার্ড-বোর্ড দিয়ে সংখ্যাগুলো তৈরী করে শিশুদের দেবেন শিশুরা ওগুলোর ওপর হাত বোলাবে। সংখ্যা লিখবার জন্য সংখ্যা-লেখা ষ্টেনসিল (Stencil) ব্যবহার ক'রলে ভাল হয়।

(গ) **হাতের কাজ ও অঙ্কশিক্ষা।**—হাতের কাজের ভেতর দিয়ে সংখ্যা গণনা শেখান যেতে পারে। যেমন কয় তার সুতা কাটল, কতগুলি পুতুল গড়ল, কয়জন বাগানে কাজ করল, কটা গাছ বসাল প্রভৃতির হিসেবের মধ্য দিয়ে শিশু সংখ্যা গুণতে শিখবে।

৩। **দলগতভাবে দুই দুই, তিন তিন, অথবা দশ দশ ক'রে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা।**—প্রথমাবস্থায় এভাবে গণনা না করলেও চলতে পারে।

৪। **৫০ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও লেখা।**—এর আগে বলা হয়েছে শিশু পরিচিত জিনিষ, খেলাধূলা ও হাতের কাজের মধ্য দিয়ে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা কেমন করে বলা, পড়া ও লেখা যায় তা শিখবে। শিশু তার কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে যত বেশী বিভিন্ন সংখ্যার সংস্পর্শে আসবে ও ব্যবহার করবে ততই তার সংখ্যা চেনবার ও লেখবার সুযোগ হবে।

৫। **যোগ, বিয়োগ, ও সমান চিহ্নের সঙ্গে পরিচয়।**—অঙ্কের ব্যবহার শিখতে হ'লে যোগ, বিয়োগ ও সমান প্রভৃতি কতগুলি চিহ্নের প্রয়োজন হয়। ঐ চিহ্নগুলি স্থান, সময় সংক্ষেপ করবার জন্য ব্যবহার করা হয়। যোগের বেলায় একের বেশী জিনিষ বা সংখ্যা একসঙ্গে করলে মোট কত হয় তা মুখে বলতে গেলে চিহ্নের প্রয়োজন হয় না কিন্তু ঐ বিষয়-গুলো লিখে সংখ্যায় প্রকাশ করতে গেলে যোগচিহ্নের দরকার হ'য়ে পড়ে। সেরকম অঙ্ক কষার ভেতর দিয়ে বিয়োগ ও সমান প্রভৃতি চিহ্নগুলোর সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করান যেতে পারে।

৬। **১—১০, ১১—২০ পর্যন্ত সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণ।**—শিশু হাতের কাজ করবার সময় তার কাজের পরিমাণ সংখ্যায় প্রকাশ করবে। দিনের পর দিন তার কাজের হিসেব রাখবার জন্য সংখ্যার প্রয়োজনবোধ এবং যোগ বিয়োগ ও সমান চিহ্নের ব্যবহার করা দরকার হবে। এই কাজের ভেতর দিয়ে সে সংখ্যা-গঠন ও বিশ্লেষণ শিখবে। শিক্ষক দেখবেন শিশু যেন ১—১০, ১১—২০ পর্যন্ত সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারে। যেমন—

২+৩=৫	৩+২=৫	১০−৭=৩
০+৪=৪	৪+০=৪	১০−৩=৭
৩+৭=১০	৭+৩=১০	৯−৪=৫
১১+৪=১৫	৪+১১=১৫	১১−৪=৭
১২+৭=১৯	৭+১২=১৯	১৯−৭=১২
১৪+৬=২০	৬+১৪=২০	১৮−১২=৬

ইত্যাদি

শিশু তার পরিচিত জিনিষের দশটিকে একসঙ্গে করে শিক্ষকের সাহায্যে এক দশ এক ১১, এক দশ দুই ১২ ইত্যাদি ক'রে সংখ্যা গুণতে শিখবে। এইভাবে শিশু ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা বিশ্লেষণ ক'রতেও শিখবে। প্রথম দিকে শিশু দশ (১০) করা পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারে। যেমন ১১ ও ৯ এর যোগ ফল যে ৯ ও ১এ ১০, ১০ আর ১০=২০ (দুদশ) এমনিভাবে বার করতে পারবে। দশটি ক'রে কাঠির গোছার সাহায্যেও এরকম গণনা শিশুকে শেখান যেতে পারে।

৭। **স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলার সাহায্যে ওজনের সঙ্গে পরিচয় যেমন দোকান দোকান খেলা, বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বাগান হ'তে তরিতরকারী উৎপাদন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—সের, আধ সের, পোয়া সম্বন্ধে ধারণা—কাতাই করার সময় সুতার ওজন যথা, তোলার সঙ্গে পরিচয়—বাজার** করা এ বয়সের শিশুর কাছে খুব আনন্দের কাজ। এটাকে অঙ্ক শেখার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে বলা হোল—

(১) এর দ্বারা শিশু দোকান থেকে জিনিষপত্র কিনে আনার অভিজ্ঞতা পেতে পারে।

(২) যে সব জিনিষ দোকানে থাকবে শিশু খেলার ছলে বেচা কেনা ক'রে দোকান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ ক'রতে পারে। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ জীবনে সে কাজে লাগাতে পারবে।

ওজন করবার দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা শিশুর কাছে খুব আকর্ষণের জিনিষ। দাঁড়িপাল্লার দু দিক কেমন করে সমান হয় শিশু তা জানতে চাইবে এবং দাঁড়িপাল্লা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে—নানারকম জিনিষ ওজন করবে।

পল্লী অঞ্চলের শিশুর দোকান সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকে, কেননা তাদের অনেক সময়, দোকান থেকে জিনিষপত্র কিনে আনতে হয়। এই অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে শিক্ষক শিশুদের বিদ্যালয়ে দোকান করতে উৎসাহ দিতে পারেন। দোকান করার আগে শিশুদের নিয়ে শিক্ষক কাছের কোন দোকান দেখাতে পারেন। এতে তারা দোকানে কি কি জিনিষ থাকে, কিভাবে দোকান সাজান হয়, কিভাবে জিনিষ বিক্রী করা হয়—এসব বিষয় তারা দেখতে পারে। দোকানের জিনিষপত্রের তালিকা তৈরী করান যেতে পারে। সেই অনুসারে তারা দোকানের ব্যবস্থা করতে পারে।

শিশুদের দিয়ে কার্ডবোর্ড, সুতা, ও কাঠির সাহায্যে দাঁড়িপাল্লা তৈরী করান যেতে পারে এবং ইটের টুকরা বা মাটির ডেলা দিয়ে শিশুরা বাটখারা তৈরী করতে পারে। তাদের তৈরী করা দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা খেলার দোকানে ব্যবহার করতে পারে। শিশু দোকানে গিয়ে দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারার ব্যবহার দেখেছে কিন্তু এ বয়সে বিভিন্ন বাটখারার সম্পর্ক তাদের না শেখালেও চলতে পারে।

বিদ্যালয়ের বাগানে উৎপন্ন তরিতরকারীর পরিমাণ জানতে গিয়ে শিশু ওজনের ব্যবহার শিখতে পারে। কাতাই করার সময় কতটা তূলা নিয়ে কতটা সূতা কাটল সে বিষয়েও শিশু ওজনের ব্যবহার শিখতে পারে।

৮। **রৈখিক পরিমাপ।—হাত, বিঘত, আঙুল ও এক গজ বা এক ফুট কাঠির সাহায্যে শ্রেণীকক্ষ, শিশুদের বিভিন্ন উচ্চতা ইত্যাদির পরিমাপ।**—(ক) বিভিন্ন মাপের কাঠি ও কার্ড-বোর্ড এক জায়গায় রেখে ওগুলো থেকে সমান মাপের কাঠি বা কার্ডবোর্ড শিশুকে বেছে বার ক'রতে দেওয়া যেতে পারে।

(খ) একটি বাক্সে একাধিক সমান মাপের কাঠি অন্য একটা বাক্সে ঐরকম কার্ডবোর্ড রেখে এক একটা বাক্স থেকে এক একজন শিশুকে সমান মাপের কাঠি বা কার্ডবোর্ড বেছে বার করতে ও সমান মাপের কাঠি বা কার্ডবোর্ড সাজাতে বলা যেতে পারে।

(গ) নির্দিষ্ট মাপের কাঠি বা কার্ডবোর্ডের সমান করে কাঁচি দিয়ে শিশুকে পাতলা কাগজ বা সূতা বা ফিতা কাটতে দেওয়া যেতে পারে।

এই জাতীয় কাজকর্মের ভেতর দিয়ে রৈখিক পরিমাপ সম্বন্ধে শিশুর প্রথম ধারণা হবে। এই ধারণাকে আরও সঠিক করবার জন্য হাত, বিঘত, আঙুল দিয়ে বিভিন্ন জিনিষ যেমন টেবিল, বেঞ্চ, ঘরের মেঝে প্রভৃতি মাপতে পারে।

শিশুদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে কে বেশী উঁচু, কে কম উঁচু দেখান যেতে পারে। তারপর একে অন্যের উচ্চতা মাপতে পারে। কোন শিশুর উচ্চতা মাপতে হলে তাকে দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে সে যতটা উঁচু সেখানে দেয়ালে দাগ দিতে হবে। তারপর নীচ থেকে দেয়ালের সেই দাগ পর্যন্ত হাত, **বিঘত বা** আঙুলের সাহায্যে মাপতে পারে।

৯। **সময়ের পরিমাণ—সময়, দিন, সপ্তাহ ও মাসের সহিত পরিচয়।**—শিশু কখন ঘুম থেকে ওঠে, কখন স্কুলে যায়, কখন ছুটী হয়, কখন বাড়ী আসে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সময় সম্বন্ধে শিশুর প্রাথমিক ধারণা জন্মাতে পারে। এগুলোর উত্তরে শিশু হয়ত বলবে ভোরবেলায় সে ঘুম থেকে ওঠে, সকালে স্কুলে যায়, দুপুরে স্কুল ছুটী হয় ইত্যাদি। এই সময়গুলোর সঙ্গে যদি ঘড়ির সম্বন্ধ দেখান যায় তাহলে শিশুর সময় সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

দিন সম্বন্ধে শিশুর প্রাথমিক ধারণা হয় বারের নাম থেকে। আজ কি বার, কোন বারে হাট হয় বা কি বারে স্কুল ছুটি থাকে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে শিশু বিভিন্ন বারের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়। এভাবে শিশু সাতটি বারের নাম শেখে। এই সম্পর্কে শিশুকে ক্যালেণ্ডার দেখান যেতে পারে এবং শিশু ক্যালেণ্ডারে বারের নাম পড়তে পারে ও কয়টি বারের নাম আছে তা গুণতে পারে। বারের নাম গুণতে গিয়ে শিশু দেখবে ক্যালেণ্ডারে সাতটি বার আছে ; তখন শিক্ষক শিশুকে বলবেন এই সাতটি বার নিয়ে হয় এক সপ্তাহ।

শিশুকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে এটা কি মাস—শিশু এর উত্তর দিতে পারলে ভালই না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। তারপর শিক্ষক সেই মাসের ক্যালেণ্ডার শ্রেণীতে উপস্থিত করবেন। শিশুরা ক্যালেণ্ডারে দেখতে পারে—সেই মাসে কয়টি দিন বা কয়টি সপ্তাহ আছে। এইভাবে শিশু দিন, সপ্তাহ ও মাসের সঙ্গে পরিচিত হবে।

১০। **মুদ্রা—টাকা আনা পয়সা—বাজার করা বা খেলার দোকানের সাহায্যে গণনা শিক্ষা—মুদ্রা কথায় প্রকাশ করতে হবে, মুদ্রার প্রতীকে (symbol) নয়।**—প্রথমে প্রচলিত স্থানীয় মুদ্রার সঙ্গে শিশুর পরিচয় হওয়া দরকার—অধিকাংশ শিশুর মুদ্রার সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকে। শিক্ষক শিশুদের কাছে প্রকৃত মুদ্রা উপস্থিত ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারেন কোন মুদ্রার কি নাম যেমন—টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, পয়সা ইত্যাদি। এ সময় শিক্ষক শিশুকে কটা আধুলিতে, কটা সিকিতে, কটা দুয়ানিতে, কটা আনিতে টাকা হয় তা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

বিভিন্ন রকমের মুদ্রার আকৃতি ও রঙ ইত্যাদির সঙ্গে শিশু পরিচিত হ'লে শিক্ষক শিশুদের সহযোগিতায় ঐরূপ মুদ্রা কার্ডবোর্ড দিয়ে প্রস্তুত করবেন—তাঁর দেখাদেখি শিশুরা তৈরী করতে চেষ্টা করবে এবং দোকান দোকান খেলায় এগুলি ব্যবহার ক'রে মুদ্রা গুণতে শিখবে ও মুদ্রার সঙ্গে পরিচয় আরও বাড়বে।

ডাক টিকিট, রেলের টিকিট বা বাসের টিকিট প্রভৃতি কাগজ বা কার্ডবোর্ড দ্বারা তৈরী করান যেতে পারে—এগুলোর দ্বারা মুদ্রার ব্যাবহারিক পরিচয় হতে পারে—বিভিন্ন দামের টিকিট বেচা কেনার পর হিসেব মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

১১। **হাতে না রেখে দুঅর সম্বলিত সংখ্যার সরল যোগ ও বিয়োগ—দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে সমস্যামূলক প্রশ্নের সমাধান।**—প্রত্যেক কাজেই শিশু দেখবে যে একের বেশী সংখ্যা এক সঙ্গে করবার দরকার হয়। সে প্রথমে দুটো আম আঁকশী দিয়ে পাড়ল, পরে আরও তিনটে পাড়ল—মোট কটা হল—আগের দিন সে চারটে গাছ লাগিয়েছে—পরের দিন পাঁচটা, মোট কটা হল—এরকম ঘটনার ভেতর দিয়ে তার দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতা হবে। মোট কত হল এরদ্বারা শিশু বুঝবে জিনিষগুলো একসঙ্গে করা হল। এই এক সঙ্গে করাকে যোগ বলে। তবে একই জাতীয় বিষয় বা বস্তু যোগ করা যেতে পারে। ভিন্ন জাতীয় বিষয়ের মধ্যে যোগ করা চলে না—যেমন দুটো গরু আর তিনটে ছাগল এক সঙ্গে করা বা যোগ করা চলে না।

এভাবে শিশুর যোগ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হবার পর ছোট ছোট সমস্যার দ্বারা বিয়োগের নিয়ম সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে—যেমন রামের ৭টি মার্বেল আছে সে হরিকে ৪টি দিল তাহলে তার কাছে আর কটা রইল ; একটা ফুলগাছে ৮টা ফুল আছে তার থেকে ৩টা তুলে নিলে কটা ফুল গাছে থাকবে ইত্যাদি প্রশ্নের সাহায্যে ব্যবহারিকভাবে বিয়োগের জ্ঞান লাভ করবে।

এভাবে বিষয় বা বস্তুর সাহায্যে যোগ বিয়োগ সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান হলে তারপর তাকে ২ ঘর বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ বিয়োগ শেখাতে হবে, হাতে কিছু থাকবে না এবং কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলো ২০এর বেশী হবে না।

১২। সংখ্যাগণনা, যোগ বিয়োগ সম্পর্কে বল ফ্রেম বা Abacus এর ব্যবহার ঃ—

Abacus এর ছবি
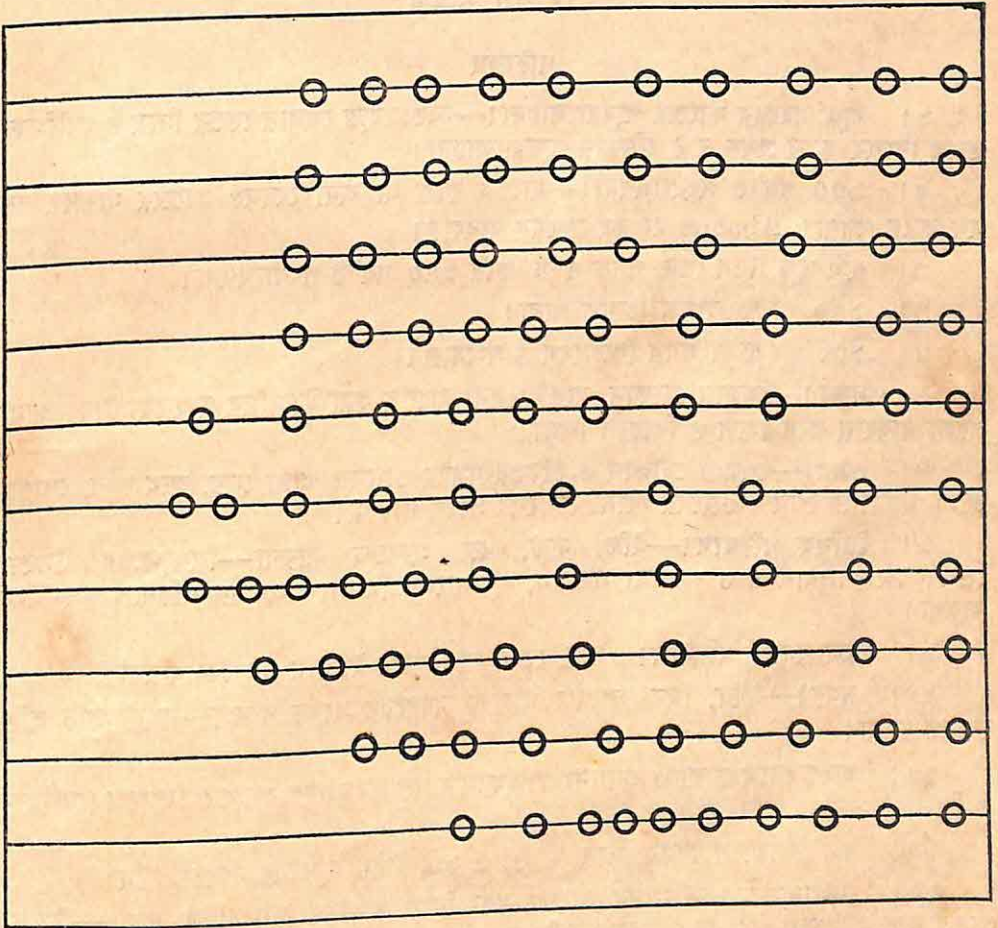
শ্লেটের মত আকারের একটি কাঠের ফ্রেমে সমান্তরালভাবে, দশটি তার লাগান থাকে। প্রত্যেকটি তারে দশটি করে কাঠের, কাঁচের, লোহার বা পেতলের ছিদ্রযুক্ত বল লাগান থাকে। বলগুলো এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করা যায়। প্রত্যেক সারির বলের বিভিন্ন রঙ থাকে। রঙগীন বল ও নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থা থাকায় এ জিনিষটি শিশুদের কাজে আকর্ষণের বস্তু।

Abacus বা বল ফ্রেমের ব্যবহার।

সংখ্যা গণনা শিখতে শিশুরা একটি একটি করে বল গুণে একধার হতে আর এক ধারে নিতে পারে। এক এক সারিতে বা দুই সারিতে কতগুলো বল আছে তা জানতে পারে। এই অভিজ্ঞতা থেকে তারা যোগ শিখবার সুযোগ পাবে। এক সারিতে যে কয়টি বল আছে তা থেকে কতকগুলি যেমন চারটি কি পাঁচটি বল অন্যধারে সরিয়ে নিলে কয়টি বাকী থাকে, এভাবে হিসেব করার ভেতর দিয়ে শিশু বিয়োগ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারে। Abacus এর দ্বারা সংখ্যাগণনা, যোগ ও বিয়োগ শেখার পর শিশু বস্তুনিরপেক্ষ সংখ্যা দ্বারা যোগ ও বিয়োগ শিখতে পারে।

শিক্ষক ছিদ্রযুক্ত মাটির গুলি পুড়িয়ে নিয়ে বিভিন্ন রঙ ক'রে বাঁশের ফ্রেমে তার দিয়ে Abacus বা বল ফ্রেম তৈরী ক'রে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী

পাঠ্যক্রম

১। **পূর্ব বছরের কাজের পুনরালোচনা।**—স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলার ভেতর দিয়ে ও মৌখিকভাবে বিশেষ ক'রে প্রথম দুই প্রক্রিয়ার পুনরালোচনা।

২। **১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা।**—হাতের কাজ বা অন্য কোনও কাজের মাধ্যমে দশ দশ ক'রে গণনা। Abacus বা বল ফ্রেমের ব্যবহার।

৩। দুই দুই, তিন তিন, পাঁচ পাঁচ করে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা।

৪। ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারা।

৫। ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যার বিশ্লেষণ ও সংযোজন।

৬। **মুদ্রা।**—খেলার দোকান, বাড়ীর জন্য বাজার করা ইত্যাদির সাহায্যে টাকা আনা পয়সা ব্যবহার করে যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা।

৭। **ওজন।**—খেলার দোকান ও তরিতরকারীর ওজনের দ্বারা সের, আধ সের, পোয়া, ছটাক ইত্যাদির জ্ঞান—ওজনের স্থানীয় মানের সঙ্গে পরিচয়।

৮। **রৈখিক পরিমাপ।**—ইঞ্চি, ফুট, গজ সম্বন্ধে ধারণা—শিশুগণের উচ্চতা, শ্রেণীকক্ষে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম, বাগানের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা।

৯। **তরল পদার্থ পরিমাপ।**—দুধ, তেল, পানীয়জল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা।

১০। **সময়।**—ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসরের সঙ্গে পরিচয়—মোটামুটি ঘড়ি দেখতে জানা।

১১। হাতে রেখে খেলা ও অন্যান্য কাজকর্মের সাহায্যে সরল যোগ ও বিয়োগ (মৌখিক ও লিখিত) সম্বন্ধে জ্ঞান।

১২। কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়ে ২, ৫, ও ১০ ঘরের গুণনের নামতা গঠন।

১৩। **খেলাধূলা ও বাগানের কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ জ্যামিতির জ্ঞান।**—ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র এবং বৃত্তের সঙ্গে পরিচয়।

১। **পূর্ব বৎসরের কাজের পুনরালোচনা—স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলার ভেতর দিয়ে ও মৌখিকভাবে বিশেষ ক'রে প্রথম দুই প্রক্রিয়ার—যোগ বিয়োগের পুনরালোচনা।**—প্রথম শ্রেণীতে যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধে শিশুর যে ধারণা হয়েছে তাকে কার্যকরী করার জন্য কয়েকটি খেলার সাহায্যে পুনরালোচনা করা যেতে পারে। যেমন "হাঁস শিকার"—কার্ডবোর্ডের

দ্বারা কয়েকটি হাঁস তৈরী করা যেতে পারে এবং ওগুলি যাতে দাঁড়িয়ে থাকে তার জন্য কার্ড-বোর্ডের "ঠেকা" (stand) দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেকটা হাঁসের গায়ে বিভিন্ন সংখ্যা লেখা থাকবে। কয়েকটা কাঠের বা রবারের বল থাকবে। শিক্ষক মেঝেতে দাগ কেটে বলতে পারেন—ধরা যাক, এটা একটা পুকুর। ঐ পুকুরের মধ্যে হাঁসগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। শিশুরা একে একে বল দিয়ে পুকুরের হাঁস মারবার চেষ্টা করবে। প্রত্যেকে ২ বার করে মারার সুযোগ পাবে। যটা হাঁস মারতে পারবে তাদের গায়ে লেখা সংখ্যাগুলি যোগ ক'রে মৌখিক ও লিখিতভাবে যোগফল প্রকাশ করতে পারে। যার যোগফল যত বেশী হবে সে তত ভাল শিকারী হবে।

এই খেলার ভেতর দিয়ে বিয়োগের ও পুনরালোচনা করা যেতে পারে। কয়টা হাঁস শিকার করতে পারল, কয়টা বাকী রইল প্রত্যেক শিশু যদি হিসেব করে তাহলে বিয়োগের ধারণা বদ্ধমূল হতে পারে।

প্রত্যেক শিশুর জন্য সংখ্যা লিখিত কার্ড (sum card) ব্যবহার করা যেতে পারে—

৮+৫=	৯+৯=	১+?=১০	?+৯=১৫
৫+৭=	৭+৯=	২+?=৭	১০+?=১৩
৯+০=	৮+৭=	?+৪=১৪	?+৫=৯
১০+৮=	৫+৬=	৬+?=১৩	৮+?=১০

শিক্ষক এ জাতীয় কার্ড প্রস্তুত করে শিশুদের দিতে পারেন এবং শিশুদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য ছবিসম্বলিত (পাখী, ফুল, ইত্যাদি) অঙ্ক কার্ডে দিতে পারেন।

২। **১৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা—হাতের কাজ বা অন্য কাজের মাধ্যমে দশ দশ করে গণনা। Abacus বা বল ফ্রেমের ব্যবহার।**—প্রথম শ্রেণীতে শিশু যেভাবে সংখ্যা বলা, পড়া ও লেখা শিখেছে সেইভাবেই অগ্রসর হয়ে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা শিশু শিখবে। এই বয়সে শিশুর সংখ্যাগণনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বাড়াবার প্রয়োজন আছে—নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে—বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা গণনা—বাগানের কাজে বীজ বা গাছের সংখ্যাগণনা—সুতা কাটার কাজে সুতার তার—বিদ্যালয়ের আসনের সংখ্যা ইত্যাদির গণনা সম্পর্কে শিশু ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা ক'রতে শিখবে।

বাস্তব জিনিষের সাহায্যে সংখ্যাগণনা শেখার পর বস্তুনিরপেক্ষ সংখ্যার সাহায্যে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা ক'রতে শিখবে।

দশ দশ ক'রে ছাত্রসংখ্যা গণনা, সুতার তার গণনা, গাছের সংখ্যা বা সারি গণনা, বল ফ্রেমের বলগুলি গণনা ইত্যাদির সাহায্যে শিশু ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা ক'রতে শিখবে। প্রথম শ্রেণীতে ১০টি ক'রে কাঠির গোছা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার ব্যবহার এখানেও করা যেতে পারে।

Abacus বা বল ফ্রেমের সাহায্যেও ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগণনা শেখান যায়। এক একটা তারের মধ্যে ১০টা ক'রে এক এক রংয়ের বল থাকে—নীচে বা ওপরে প্রথম সারিতে (একক) এক একটি বলের মূল্য এক—দ্বিতীয় সারিতে (দশক) এক একটি বলের মূল্য দশ—তৃতীয় সারিতে (শতক) এক একটি বলের মূল্য একশ। যদি ১১২ সংখ্যা প্রকাশ ক'রতে হয় তাহলে দেখতে হবে ১১২ এর মধ্যে কত একক, কত দশক, কত শতক আছে। ১০০+১০+২=১১২ অর্থাৎ শতকের সারির একটি বল বাম দিক থেকে ডান দিকে রাখলে ১০০ হবে—দশকের সারির একটি বল ডান দিকে রাখলে ১০ হবে—এককের সারির দুটি বল ডান দিকে আনলে ২ হবে—তাহলে মোট ১১২ সংখ্যা হবে। সুতরাং এর সাহায্যে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

নিম্নোক্ত অঙ্ক লেখা কার্ড (sum card) প্রত্যেক শিশুর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে :—

২৩=?	দশ	ও	?	এক
৩৫=?	,,	,,	?	,,
৪৬=?	,,	,,	?	,,
৫৩=?	,,	,,	?	,,
৭৮=?	,,	,,	?	,,
৯৯=?	,,	,,	?	,,
১১৫=?	,,	,,	?	,,
১৩৫=?	,,	,,	?	,,
১৫০=?	,,	,,	?	,,

ইত্যাদি

৩। **দুই দুই, তিন তিন, পাঁচ পাঁচ করে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা।**—এই শ্রেণীতে এভাবে গণনা না ক'রলেও চলতে পারে।

৪। **১৫০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারা।**—প্রথম শ্রেণীতে শিশু যখন ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনেছে তখন সে দেখেছে ১ থেকে ৯ ও ০ এ কয়টা অঙ্ক দিয়েই সব সংখ্যা লেখা হয়। সে এ ধারণার ভিত্তিতে এবং দশ দশ করে গণনার অভ্যাস থেকে সহজেই ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে চিনতে পারবে। যে যে জায়গায় অসুবিধা হবে যেমন ৫৯, ৬৯, ৭৯ প্রভৃতি সেখানে শিক্ষক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। ১০০ চেনবার সময় শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হ'তে পারে কেননা এই প্রথম সে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা দেখছে। পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা এ বিষয়ে সাহায্য ক'রবে। হাতের কাজ বা অন্যান্য কাজের ভিতর দিয়েও শিশু এ জ্ঞান লাভ ক'রতে পারবে। প্রত্যেক শিশুর জন্য সংখ্যালেখা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫। **১৫০ পর্যন্ত সংখ্যার বিশ্লেষণ ও সংযোজন।**—১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার বিশ্লেষণ ও সংযোজন শিশু প্রথম শ্রেণীতে শিখেছে এবং এখানে পুনরালোচনার দ্বারা ঐ জ্ঞান কতকটা প্রসারলাভ করেছে। ঐ পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যার সংযোজন ও বিশ্লেষণ শিশুকে শেখান যেতে পারে।

এ জাতীয় অঙ্ক করবার জন্য প্রত্যেক শিশুকে সংখ্যা লেখা কার্ড (sum card) দেওয়া যেতে পারে।

৬। **মুদ্রা।—খেলার দোকান, বাড়ীর জন্য বাজার করা ইত্যাদির সাহায্যে টাকা আনা পয়সা ব্যবহার ক'রে যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা।**—প্রথম শ্রেণীতে দোকান দোকান খেলার অভিজ্ঞতা থেকে মুদ্রা ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা শিশুর হয়েছে। দোকান সাজাবার ব্যবস্থা আরও একটু বাড়ালে যত বেশী জিনিষপত্র শিশু খেলার ভেতর দিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে পারবে সেগুলোর ওজন ও দাম সম্বন্ধে তার জ্ঞান আরও বাড়বে। শিশুর এই অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে শিক্ষক শিশুকে টাকা আনা ও পয়সার যোগ বিয়োগ ব্যবহারিকভাবে শিখিয়ে দিতে পারেন। খেলার দোকান থেকে খরিদ্দার যখন একের বেশী জিনিষ চাইবে তার দাম ঠিক ক'রতে হলে মুদ্রার যোগের দরকার আপনা থেকে এসে পড়বে। প্রথমাবস্থায় শিশু শিক্ষকের সাহায্যে একের বেশী জিনিষের দাম একসঙ্গে কত হয় তা ঠিক ক'রবে। পরে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলে শিশু নিজেই ঐ সমস্যার সমাধান ক'রবে এবং ব্যবহারিকভাবে মুদ্রার যোগের সঙ্গে পরিচিত হবে। দোকান চালাবার ব্যবস্থা এমন ক'রতে হবে যাতে প্রত্যেক শিশু বিক্রেতা হবার সুযোগ পাবে এবং এর ভেতর দিয়ে প্রত্যেকেই নানারকম প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ পাবে। প্রথমাবস্থায় জিনিষগুলোর মূল্য পয়সাতে আবদ্ধ

থাকলে যোগ করার সুবিধা হ'তে পারে, কেননা প্রথমেই যদি টাকা, আনা, ও পয়সা হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয় তবে শিশুর পক্ষে বিষয়টা আয়ত্ত করা কঠিন হ'য়ে পড়বে। অবশ্য কয়েকটা জিনিষের দাম যোগ ক'রতে গেলে আনার কথা এসে পড়বে, সে জায়গায় ক'পয়সায় এক আনা হয় তা ব'লে দিতে হবে—একসঙ্গে অনেকগুলো পয়সার যোগ মনে রাখার চেয়ে আনার হিসেব রাখলে কাজটা সহজ হয়। জিনিষপত্রের দাম নির্ধারণের সময় যেন বাজারদরের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে করা হয়, তাহলে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাজের যোগসূত্র থাকবে। বাড়ীতেও সত্যিকার বাজার ক'রে শিশু প্রকৃত টাকা আনা পয়সার ব্যবহার ক'রে মুদ্রার যোগের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে।

এই খেলার দোকান বা বাজার করার ভেতর দিয়ে শিশু মুদ্রার বিয়োগ অঙ্কের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে যেমন ক্রেতা কয়েকটা জিনিষ কিনল—দাম হিসেবে এক টাকা দিল, কিন্তু জিনিষগুলোর দাম এক টাকার কম হ'য়েছে—বাকী পয়সা ক্রেতাকে ফেরৎ দিতে হবে—বিয়োগের সমস্যা আপনা আপনি এসে প'ড়বে এবং এ সমস্যার সমাধান ক'রতে গিয়ে শিশু মুদ্রার বিয়োগ শিখতে পারবে।

৭। **ওজন—খেলার দোকান ও তরিতরকারীর ওজনের দ্বারা সের, আধ সের, পোয়া, ছটাক ইত্যাদির জ্ঞান—ওজনের স্থানীয় মানের সঙ্গে পরিচয়।**—প্রথম শ্রেণীতে খেলার দোকানের সাহায্যে সের, আধ সের, পোয়ার প্রারম্ভিক ধারণা শিশুর হ'য়েছে। এখানে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল ও স্পষ্টতর করা দরকার। শিক্ষক সত্যিকারের বাটখারা (সের, আধ সের, পোয়া ইত্যাদি) এনে শিশুদের প্রত্যেকটি কিরকম ভারী এবং একটির সঙ্গে অন্যটির ওজনের কিরকম তফাৎ তার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা দিতে পারেন। বিদ্যালয়ের বাগানের উৎপন্ন তরিতরকারী সত্যিকারের দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারার সাহায্যে ওজন ক'রে বিভিন্ন ওজনের তারতম্য বুঝতে পারবে। সেরের সঙ্গে আধ সের, পোয়া ও ছটাকের সম্বন্ধ শিক্ষক সাধারণ-ভাবে শিশুকে এরকম কাজের ভেতর দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর্যারূপে ওজনের জ্ঞান এ অবস্থায় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সের আধ সেরের মাপ ছাড়াও পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত যদি কোন স্থানীয় মাপ যেমন—কাঠা, রেক, পালি, শলী, বিশ, ইত্যাদি থাকে তাহলে শিক্ষক মহাশয় সেগুলির সঙ্গেও শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন।

৮। **রৈখিক পরিমাপ—ইঞ্চি, ফুট, গজ সম্বন্ধে ধারণা—শিশুগণের উচ্চতা, শ্রেণীকক্ষে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম, বাগানের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা।**—আগের বছর শিশুদের হাত, বিঘত ও আঙুলের সাহায্যে রৈখিক পরিমাপের ধারণা দেওয়া হ'য়েছে। এই শ্রেণীতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের ইঞ্চি, ফুট, গজ ইত্যাদির ধারণা দিতে হবে এবং একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক বুঝিয়ে দিতে হবে।

হাত, বিঘত বা আঙুল দিয়ে মাপবার সময়ে শিশুরা দেখেছে একই জিনিষের (টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি) বিভিন্ন মাপ হয়েছে (হাত, বিঘত, আঙুলের তারতম্যানুসারে কারো হাতের তিন হাত কারো ৩ হাত এক বিঘত ইত্যাদি হয়েছে); এ অবস্থায় শিশুরা মাপের জন্য একটা সাধারণ মানের প্রয়োজন অনুভব ক'রতে পারে। এই প্রয়োজন মেটাতে গেলে শিক্ষক এক ফুট লম্বা একটা বাঁশের বা কাঠের টুকরা শিশুদের দিতে পারেন এবং এই টুকরা দিয়ে শিক্ষক শিশুদের বিভিন্ন জিনিষ মাপতে ব'লতে পারেন। এইভাবে মাপবার সময় শিশুরা দেখবে কোন জিনিষের মাপ ৩ কাঠি বা ৪ কাঠি হয়েছে; তখন শিক্ষক ঐ জিনিষের মাপ ৩ ফুট বা ৪ ফুট একথা বুঝিয়ে দেবেন। বাগানের জমি, শ্রেণীকক্ষের মেঝে, শিশুদের পরস্পরের উচ্চতা প্রভৃতি ঐ কাঠি দিয়ে মেপে শিশুরা ফুট সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ ক'রতে পারে।

এরকমভাবে মাপতে গিয়ে শিশু হয়ত দেখবে কোন জিনিষ যেমন টেবিল ৩ ফুট হ'য়ে কিছু বেশী আছে যেটা ১ ফুটের চেয়ে কম। এই অংশটী মাপতে শিশুরা সমস্যায় প'ড়বে—হয়ত বাকী অংশটী আঙুল বা বিঘত দিয়ে মেপে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু এরূপভাবে মাপতে গিয়ে মাপের তারতম্য হবে এবং সাধারণ মানে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না (শিশুদের আঙুল, বিঘতের মাপের তারতম্য থাকাতে)। সুতরাং শিক্ষক এক ফুট কাঠিটিকে সমান

১২ ভাগে ভাগ ক'রে দেখিয়ে দিতে পারেন এবং এক এক ভাগকে এক ইঞ্চি বলা হয় একথা ব'লতে পারেন। শিশুরা এখন টেবিলের বাকী অংশটি (৩ ফুট হ'য়ে যা বেশী ছিল) ফুটের ছোট বিভাগ এই ইঞ্চির সাহায্যে মাপতে পারে। এভাবে ফুটের সঙ্গে ইঞ্চির সম্বন্ধ বুঝতে পারবে।

শিশুরা হয়ত কাপড়ের দোকানে দেখে থাকবে এক ফুটের চেয়ে লম্বা একটা কাঠির সাহায্যে কাপড় মাপা হয়। সেই কাঠিটিকে গজ বলা হয়। শিক্ষক মহাশয় দেখিয়ে দিতে পারেন এক ফুটের কাঠি দিয়ে কোন জিনিষ তিনবার মাপলে যতটা মাপা যায় গজের কাঠি দিয়ে ততটা একবারে মাপা সম্ভব; তাহলে এক গজের কাঠি এক ফুট কাঠির তিন গুণ। গজের কাঠি দিয়ে শিশুকে বিভিন্ন জিনিষ মাপতে দেওয়া যেতে পারে। শিশুদের উচ্চতা ফুট বা গজের কাঠি উভয়ের সাহায্যেই মাপা যেতে পারে।

৯। **তরল পদার্থ পরিমাপ—দুধ, তেল, পানীয় জল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা।**—শিশু দোকান থেকে তেল আনতে গিয়ে বোতল বা শিশিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল মেপে দিতে দেখে—বাড়ীতে গোয়ালা দুধ দিতে আসে, বাঁশের চোঙগা, বা ঘটি বা টিনের কৌটা দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ মেপে দিতে দেখে। এসব দেখে তার তরল পদার্থের পরিমাপ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা হ'তে পারে।

খেলার ছলে শিশু কোন বড় পাত্র থেকে টিনের কৌটা, মগ, ঘটি, নারিকেলের মালা ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন আকারের পাত্র জল দিয়ে ভরে দেখতে পারে কোন পাত্রে কত মগ বা ঘটি জল ধরে। এভাবে অন্যান্য তরল জিনিযের পরিমাপের সঙ্গে পরিচয় হ'তে পারে।

১০। **সময়—ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসরের সঙ্গে পরিচয়—মোটামুটি ঘড়ি দেখতে জানা।**—প্রথম শ্রেণীতে শিশুরা দিন, সপ্তাহ ও মাসের সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছে। বাস্তব ঘড়ির সাহায্যে শিশুকে ঘণ্টা মিনিট প্রভৃতির জ্ঞান দেবার চেষ্টা ক'রতে হবে। শিশু যাতে ঘড়ি দেখে সাধারণভাবে সময় ব'লতে পারে তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে—তাদের ঘড়ি দেখাতে হবে—শিক্ষকের সাহায্যে কার্ডবোর্ড দিয়ে ঘড়ি তৈরী ক'রবে। ঘড়ি দেখে সময় ব'লতে শেখাবার সময় শিশুর দৈনন্দিন জীবনে সময়ের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। কত ঘণ্টায় এক দিন হয়—দিন ও রাত্রি মিলে যে ২৪ ঘণ্টা হয় তা শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দিনের সঙ্গে সপ্তাহ ও মাসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জ্ঞানদান ক'রতে চেষ্টা ক'রতে হবে। মাসের বেলায় বাংলামাসের ওপর জোর দিতে হ'বে। মাসিক পঞ্জিকা তৈরী করা দরকার হবে।

কয় মাসে বছর হয় তা শিশুকে ব'লে দিতে হবে। শিশুর বয়স হিসেবের দ্বারাও বছর সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হ'তে পারে।

কোন নির্দিষ্ট দিন কি বার, কোন মাস, কোন তারিখ, কোন বৎসর ইত্যাদি ক্যালেণ্ডার দেখিয়ে বার, মাস, তারিখ ও বৎসর সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। মাসিক পঞ্জিকা থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে বৎসরের পঞ্জিকাও শিশুকে দিয়ে তৈরী করান যেতে পারে।

শিশুর জন্মতারিখ, মহাপুরুষগণের জন্মতারিখ, পূজা পার্বণের তারিখ ইত্যাদি বিষয়-গুলোর সঙ্গে শিশুর পরিচয় হ'লে সন তারিখের ধারণা হওয়া সম্ভব। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-দিবস শিশুকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শিশুর জন্মতিথি বাড়ীতে পালিত হ'য়ে থাকে, —অন্যান্য ঘটনা নিয়ে বিদ্যালয়ে উৎসবের ব্যবস্থা করা যেতে পারে—এসকল ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে শিশুকে দিন, মাস ও বৎসরের ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

১১। **খেলা ও অন্যান্য কাজকর্মের সাহায্যে হাতে রেখে সরল যোগ ও বিয়োগ (মৌখিক ও লিখিত) সম্বন্ধে জ্ঞান।**—প্রথম শ্রেণীতে শিশুরা খেলা ও অন্যান্য কাজকর্মের সাহায্যে এবং বস্তুনিরপেক্ষ সংখ্যার সাহায্যে হাতে না রেখে যোগ ও বিয়োগ ক'রতে শিখেছে। এখানে হাতে রেখে যোগ ও বিয়োগ শেখাতে হবে—স্থানীয় মানের দরকার হবে—Abacus ব্যবহারের প্রণালী সম্বন্ধে বলার সময় স্থানীয় মান সম্বন্ধে ধারণা কিভাবে দেওয়া যায় তা বলা হয়েছে।

শিশু ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যার সংযোজন ও বিশ্লেষণ শিখেছে। এই জ্ঞানের সঙ্গে সংখ্যার স্থানীয় মানের জ্ঞান হাতে রেখে যোগ ও বিয়োগ করতে শিশুকে সাহায্য ক'রবে। উদাহরণ-রূপে শিশুকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে তার বাগানের কোন অংশে প্রথম সারিতে ১৮টি বেগুন গাছ আছে, দ্বিতীয় সারিতে ১৫টি আছে—মোট কটি আছে? এখানে ১৮ ও ১৫ যোগ করতে হবে। ১৮ ও ১৫ নীচে নীচে যোগ করতে গেলে পদ্ধতিটা এরকম হবেঃ—

দশক	একক	
১	৮	+
১	৫	
৩	৩	

এককের ঘরে ৮ ও ৫ যোগ করলে ১৩ অর্থাৎ এক দশ তিন হয়—৩ এককের ঘরে নামবে এবং এক দশককে দশকের ঘরে যোগ করতে হবে। দশকের ঘরের ১ ও ১ যোগ করলে ২ হয় তার সঙ্গে আর এক দশক যোগ হয়ে দশকের ঘরে ৩ নামবে—উত্তর হবে ৩ দশ ৩ অর্থাৎ ৩৩।

বিয়োগের বেলায় এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন শিশু সকালে ১৮টি গাছ লাগিয়েছে—ঐ সারিতে মোট ৩৩টি গাছ লাগাতে হ'লে আর কয়টা গাছ তাকে লাগাতে হবে। সংখ্যায় প্রকাশ ক'রতে হলে অঙ্কটি এরূপ হবে ;—

১৮+কত=৩৩

এখানে বিয়োগের প্রশ্ন আসে। ৩৩ হ'তে ১৮ বিয়োগ ক'রতে হবে। সংখ্যা দুটো এইরকম দাঁড়ায়।

দশক	একক	
৩	৩	—
১	৮	
১	৫	

নীচের সংখ্যায় এককের ঘরে ৮ (তিনের বেশী) ও ওপরের সংখ্যায় এককের ঘরে ৩ আছে। ওপরের এককের ঘরের সংখ্যা নীচের এককের ঘরের সংখ্যা থেকে কম হওয়ায় ওপরের ঘরের এক দশ এককের ঘরের তিনের সঙ্গে যোগ ক'রতে হবে—তাহলে ওপরের এককের ঘরের তিন, এক দশ তিন অর্থাৎ ১৩ হবে—১৩ থেকে ৮ বাদ দিলে ৫ নীচে এককের ঘরে নামবে। উপরের দশকের ঘরের তিনটি দশক থেকে একটি দশক এককের ঘরে পূর্বেই নেবার দরুণ সেখানে দুটি দশক বাকি আছ। দুই দশ থেকে এক দশ গেলে দশকের ঘরে ১ থাকবে। তাহলে উত্তর হবে এক দশ পাঁচ অর্থাৎ ১৫।

শিক্ষক এ জাতীয় অঙ্কের দ্বারা হাতে রেখে যোগ বিয়োগ শিক্ষা দিতে পারেন।

শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যামূলক সহজ যোগ ও বিয়োগ অঙ্ক শিক্ষক মৌখিক-ভাবে সমাধান করবার জন্য শিশুকে দিতে পারেন।

১২। **কর্মতৎপরতার ভিতর দিয়ে ২, ৫ ও ১০ ঘরের গুণনের নামতা গঠন।**—যোগ অঙ্কের নিয়মানুযায়ী গুণনের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণীর শিশুদের এক এক সারিতে ২ জন ক'রে বসতে বা দাঁড়াতে বলা যেতে পারে। এরূপ দশটা সারি হলে মোট কতজন শিশু আছে। যোগ ক'রে বার করতে গেলে যতগুলো সারি আছে ততবার প্রত্যেক সারির শিশুর সংখ্যা ব'লতে বা লিখতে হবে। এতে সময় ও পরিশ্রম বেশী লাগবে। এর পরিবর্তে এক সারির শিশুর সংখ্যাকে সারির সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে মোট সংখ্যাটা সহজে পাওয়া যাবে। তাই গুণের সময় নামতা জানা দরকার হবে। নামতা লিখতে গেলে সংখ্যাটি এরূপ হবে—২ গুণন (বার) ১০=২০।

নামতা কিভাবে পড়তে হয় তাও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, যেমন—

২, ১ এ ২
২, ২ এ ৪
২, ৩ এ ৬ ইত্যাদি

অথবা

২, ১ এ ২
২, দুগুণে ৪
৩, দুগুণে ৬
৪, দুগুণে ৮ ইত্যাদি

বস্তু বা খেলা বা হাতের কাজের দ্বারা নামতার ধারণা একসঙ্গে সব শিশু নামতা আবৃত্তি ক'রে লাভ ক'রতে পারে।

নিম্নোক্ত চিত্রসাহায্যেও গুণনের নামতা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যেতে পারেঃ—

২ এর নামতার চিত্র

১টী দুই
২টী দুই
৩টী দুই
৪টী দুই
৫টী দুই
৬টী দুই
৭টী দুই
৮টী দুই
৯টী দুই
১০টী দুই

নামতা শেখান ব্যাপারে শিক্ষক এ বিষয়গুলো মনে রাখবেন—

(ক) নামতা সঠিকভাবে মুখস্থ রাখা একান্ত আবশ্যক,

(খ) শিক্ষক শিশুদের বাড়ী থেকে মুখস্থ ক'রে আসতে বলবেন না—শ্রেণীতেই মুখস্থ করাবেন এবং এই নিয়মগুলো পালন ক'রবেনঃ—

(১) মুখস্থ করবার পূর্বে শিশুরা ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা ক'রবে।

(২) প্রতিদিন ১০ মিনিটের অনধিক সময় তারা নামতা অভ্যাস ক'রবে।

(৩) আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা যেমন খেলার মধ্য দিয়ে নামতা শেখাবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

(৪) শিশুরা যেন গোড়ার থেকে কোন নামতা আবৃত্তি না ক'রেই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারে, যেমন—

৫ বার (গুণন) ৬ কত হয়? উত্তর দেওয়ার সময় শিশু যেন বলতে পারে ৫, ৬ এ ৩০ হয়।

১৩। খেলাধূলা ও বাগানের কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ জ্যামিতির জ্ঞান—ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র এবং বৃত্তের সঙ্গে পরিচয়।—এমন কতকগুলো খেলার ব্যবস্থা শিক্ষক ক'রতে পারেন যাতে শিশুদের বিভিন্ন আকারে দাঁড়াতে, ব'সতে বা দৌড়াতে বলা যেতে পারে, যেমন—ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্রাকার, বর্গক্ষেত্রাকার, বৃত্তাকার ইত্যাদি।

এছাড়া বিভিন্ন আকারের কাগজ কাঁচি দিয়ে কাটতে পারে—ঘুড়ি তৈরী ক'রতে পারে। মুদ্রা তৈরী করবার সময় বৃত্তাকার ও বর্গক্ষেত্রাকারের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ক'রতে পারে। শিক্ষক জ্যামিতির বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট কাঠের টুকরা শিশুদের দেখাতে পারেন।

বাগানের কাজ ক'রতে হলে জমি প্রস্তুত ক'রতে হয়। জমি প্রস্তুত করার সময় যদি বিভিন্ন আকারের জমি শিশুকে দেওয়া হয় তাহলে বিভিন্ন জ্যামিতির আকারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে।

বাগানে চারাগাছ লাগাবার সময় বিভিন্ন আকারে সাজিয়ে লাগান যেতে পারে।

জ্যামিতির বিভিন্ন আকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা শিশুদের হয়েছে কিনা, তা জানবার জন্য জ্যামিতির ঐ আকারগুলি শিশুদের আঁকতে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম শ্রেণী

বয়স ৬+ হ'তে ৭+

এই বয়সে শিশুদের ভূগোলের কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না এবং পৃথক বিষয় হিসাবে ভূগোল পড়ানও হ'বে না। তবে শিশুর নানাবিধ কাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে ভূগোল শিক্ষার প্রথম পাঠ আরম্ভ হ'বে। স্কুলে দেশ-বিদেশের নানারকমের রঙিগন ছবির বই, চার্ট ইত্যাদি থাকবে এবং সেগুলো আলমারীতে বন্ধ না রেখে শিশু যাতে সব সময় ব্যবহার করার সুযোগ পায়—সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১। নানা রংয়ের নানারকম জীবজন্তু, পশুপক্ষী, নিজেদের দেশের নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি (যেমন দার্জিলিং, শিলং, পদ্মা, গঙ্গা ইত্যাদি) প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিবিধ ছবি (যেমন কুমার ঘটিবাটি তৈরী করছে, জেলেরা মাছ ধরছে, কেহ বা দোকান করছে ইত্যাদি ইত্যাদি) শিশু দেখবে; হয়তো সে তখন পড়তেও পারে না কিন্তু তবু তাহা আগ্রহের সঙ্গে কোনটা কি তা জানতে চাইবে। এই প্রকারের বই আমাদের দেশে এখনও বড় বেশী হয়নি। কিন্তু তবু কাজ সুরু হওয়া দরকার। প্রাথমিক শিক্ষকগণও নিজেদের ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে এই প্রকারের বই রচনা করতে পারেন।

২। শিক্ষক মহাশয় শিশুদের মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাবেন এবং গ্রামের কোনদিকে স্কুল, পোষ্ট-অফিস, নদী, বাজার ইত্যাদি রয়েছে তা দেখাবেন। বাড়ী হ'তে স্কুলে যেতে হ'লে কোন পথ দিয়ে যেতে হয় এবং পথে কি কি জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়—শিশু তা লক্ষ্য করুক এবং আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষক মহাশয় তার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করুন। মনে রাখতে হবে—এই বয়সে শিশুদের শারীরিক সামর্থ্য খুবই কম। শিশুরা আনন্দের আতিশয্যে বাইরে যেতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করবে কিন্তু উৎসাহী শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য রাখবেন—যাতে শিশুরা অতিরিক্ত ভ্রমণের ফলে অসুস্থ হ'য়ে না পড়ে এবং পরিভ্রমণের সঙ্গে শিক্ষার যেন যোগসূত্র থাকে।

৩। পথ চলতে চলতে নানাবিধ লোকের সঙ্গে শিশুর পরিচয় হবে, কেউ বা ধোপা, কেউ বা নাপিত, কেউ বা কামার, কেউ বা কুমার, কেউ বা গয়লা, কেউ বা মুদী, কেউ বা চাষী, কেউ বা ব্যবসায়ী ইত্যাদি। শিক্ষক মহাশয় শিশুদের উপযোগী করে' সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়—তা বুঝিয়ে দেবেন। (যদিও সমাজ সম্বন্ধে শিশুর কোন স্পষ্ট ধারণা নাই—তবু তারা কে কি কাজ করেন এবং না থাকলে কি অসুবিধা হ'ত—তার একটা ধারণা দেবেন।) এই প্রসঙ্গে শিশুকেও গল্প বলতে উৎসাহিত করা হ'বে।

৪। শিশুরা সাধারণতঃ নানাপ্রকার জীবজন্তু ভালবাসে এবং অনেকের বাড়ীতে নানা-প্রকার পোষা পশুপক্ষীও আছে। এই সব পোষা পশুপক্ষী জীবজন্তুকে কেন্দ্র করে শিক্ষক মহাশয় নানাবিধ আলোচনা করবেন এবং জীবজন্তুর স্বভাব, খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে শিশুদের নিকট হ'তে গল্প আদায় করবেন।

৫। বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই স্কুলের চারধারে পথের পাশে আমগাছ, জামগাছ, কাঁঠালগাছ প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলফুলের গাছপালা থাকে। কোন ফল খেতে কেমন, কোন ফলের কি রং, কোন ফল দেখতে কেমন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় আলোচনা করবেন এবং শিশুর চারপাশে যা কিছু আছে—তার সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলবেন।

৬। এই বয়সে শিশুদের দিক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হবে। সকাল-বেলায় সূর্য কোনদিকে ওঠে এবং সন্ধ্যাবেলা কোনদিকে অস্ত যায়; সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আকাশের রং কেমন পরিবর্তন হয় ইত্যাদি বিষয়ে বলা হ'বে। কেন রাত্রি হয়, কেন দিন হয়, সূর্যের গতি, আহ্নিকগতি বা বার্ষিকগতি ইত্যাদি জটিলতর বিষয় বোঝাবার বৃথা চেষ্টা এখনই না করে'—সাধারণভাবে দিঙ্-নির্ণয় ও রাত্রি-দিনের বৈচিত্র্য বোঝাবার চেষ্টা করা হ'বে।

এইভাবে অতি পরিচিত বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে শিশুর প্রথম ভূগোলপাঠ আরম্ভ হ'বে এবং শিক্ষক মহাশয় এইসব বিষয়ের অবতারণা করে' ভূগোলশিক্ষাকে সরস করে' তুলবেন। তবে উপরিলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষকের নির্দেশক মাত্র। কৌশলী শিক্ষক নিজ পরিবেশের

মধ্যে যে সব বিষয়বস্তু লক্ষ্য করবেন তাকে কেন্দ্র করে' ভূগোল পাঠ দিতে চেষ্টা করবেন এবং ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ রেখে (সমবায় প্রণালীতে) ভূগোল শেখাতে চেষ্টা করবেন।

হাতের কাজ ও সংগ্রহ

১। পরিভ্রমণের সময় শিশু যা দেখেছে—তার ছবি আঁকা।

২। শ্রেণীকক্ষের নক্সা, বিদ্যালয় গৃহের নক্সা, বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ে আসার পথ আঁকা। প্রথমতঃ শিক্ষকের অঙ্কিত নক্সার উপর শিশুরা নিজেদের অবস্থিতি, শ্রেণীকক্ষের নানাবিধ দ্রব্যের অবস্থিতি ইত্যাদি বসা'বে, পরে নিজেরাই আঁকতে চেষ্টা করবে। (যদিও এই বয়সে ঠিক স্কেল অনুযায়ী হ'বে না তবু এটা পরে মানচিত্র অঙ্কনে সাহায্য করবে)।

৩। বালি, কাঁদা ইত্যাদি নিয়ে খেলা করা (পরে এটা ভৌগোলিক তথ্য জান্তে সাহায্য করবে এবং প্রাকৃতিক ভূগোল অনায়াসেই আয়ত্তে আসবে)।

৪। নিজেদের পরিবেশের মধ্যে পাখীর বাসা, নানাপ্রকার পোকামাকড়, ফল, ফুল, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করা।

৫। নানাবিধ খেলনা সংগ্রহ করা এবং এইসব খেলনা কোথায় কিভাবে কারা তৈরী করে সে সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করা। শিশু অবশ্য তা প্রস্তুতের নানাবিধ কলা কৌশল সম্বন্ধে খুব বিশেষ জ্ঞান লাভ করবে না তবু কোথায় পাওয়া যায় এবং কে করেছে সে সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে জানবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী

বয়স ৭+ হতে ৮+

(এই শ্রেণীতেও কোনপ্রকার পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। প্রথম শ্রেণীতে যে যে বিষয়ের কথা বলা হ'য়েছে সেই সেই বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনা চলবে ; তা ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করতে হবে।)

১। গ্রামের চারপাশে যে সব ফসল হয়, শিশু তা অবশ্য লক্ষ্য করবে ; যেমন ধান, পাট, গম, নানাবিধ শাকসব্জী, ফল ইত্যাদি। সেগুলো কখন আবাদ হয়, কোন রকম জায়গায় হয় (উঁচু জায়গায় না জলা জায়গায়), কখন পাকে, পাকলে কেমন দেখায়, কখন কাটে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিক্ষক মহাশয় আলোচনা করবেন এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য হ'তে কিভাবে আমাদের খাদ্য তৈরী হয়, সে সম্বন্ধে শিশুকে ধারণা দেবেন।

২। এই বয়সে যানবাহন সম্বন্ধে শিশুকে ধারণা দিতে হবে। গ্রামে গরুর গাড়ী, পাল্কী গাড়ী, সাইকেল, ডুলি, নৌকা ইত্যাদি দেখা যায়; তেমনি সহরে বাস, ট্রাম, রিক্সা, মোটর প্রভৃতি নানাবিধ যানবাহন দেখা যায়। একস্থান হতে অন্যস্থানে যেতে হ'লে কোথাও বা নৌকায় যেতে হয় কোথাও বা রেলগাড়ীতে যেতে হয়। শিশু কোথাও গিয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করে' শিক্ষক মহাশয় এইসব নানাবিধ যানবাহনের বিষয় উল্লেখ করবেন। যানবাহন সম্বন্ধে কোন Project নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে সমবায় প্রণালীতে অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন বাসের ভাড়া কত, নৌকার ভাড়া কত, কোনটা দ্রুত চলে, কোনটা ধীরে চলে, কেন সহরে এইপ্রকার যানবাহন, তা'দের জীবনযাত্রার প্রণালী গ্রামবাসীদের নিকট থেকে কোথায় স্বতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। তা ছাড়া ষ্টীমার, এরোপ্লেন ইত্যাদি বিষয়ও গল্পচ্ছলে বলতে পারা যাবে। যানবাহন সম্বন্ধে আলোচনা কালে অনেক হাতের কাজ করা যেতে পারে। যেমন শিশুরা কাগজ দিয়ে নৌকা তৈরী করতে পারে, কাঠ, বাঁশ দিয়ে বাস, রেলগাড়ী, গরুর গাড়ী ইত্যাদি অনায়াসেই করতে পারে। এই প্রসঙ্গে দেশ বিদেশের যানবাহনের আলোচনা চলতে পারে। শিক্ষক মহাশয় এই বিষয়ে আগে নিজে ভাল করে জানবেন এবং ছবি সংগ্রহ করবেন।

৩। পরিভ্রমণ কালে গ্রামে অথবা গ্রামের কাছাকাছি হাট-বাজার থাকলে শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে শিশুদের সেখানে নিয়ে যাবেন। সেখানে কি কি জিনিষ পাওয়া যায় তা কোথা

নবম অধ্যায়

পরিবেশ-পরিচিতি

(ক) ভূমিকা

শিক্ষাজগতে যুগে যুগে নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ নূতন নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতকে কিভাবে আরও অধিকতর সুন্দর ও কল্যাণকর করা যায়—তারই প্রচেষ্টা অহরহ চল্‌ছে।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আদর্শ নানা দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন যতই বিতর্কমূলক হক না কেন অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সর্বত্রই শিক্ষার একটি মূলসূত্র অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষাকে সর্বদেশে সর্বকালে "adjustment" হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে।

এই "adjustment" করতে হলে মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে জানতে হয়। ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের শাখা সেই পরিবেশকে জানতে সহায়তা করে। এতকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগগুলোকে আমরা পৃথকভাবে শেখাতে চেষ্টা করেছি। অথচ শিশুর পক্ষে (৬ হ'তে ১১ বৎসর) এইসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞান অর্থহীন; পক্ষান্তরে পরিবেশের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী তাদের আকর্ষণ করে।

সেইজন্য "Environmental studies"এর নাম আজকাল শিক্ষাজগতে খুবই শোনা যায়। ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান না দিয়ে—পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঐসব বিষয়ের জ্ঞান দেওয়াই "Environmental studies"এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা এর নামকরণ করেছি—"পরিবেশ-পরিচিতি"।

আমরা আমাদের পরিবেশের মধ্যে অনেক জিনিষই দেখি বটে কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাহা পর্যবেক্ষণ করি না। আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি আমাদের নেই—সেখানেই শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। উপরন্তু শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগসূত্র বড় একটা দেখা যায় না। তাই বর্তমান কেতাবী শিক্ষাকে লক্ষ্য করে এবং তার ব্যর্থতা উপলব্ধি করে' রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে' এক জায়গায় বলেছেন—

"বহুদিন ধরি বহুদেশ ঘুরি'
বহুব্যয় করি বহুক্লেশ করি'
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু"।

সেজন্যই দেখতে পাওয়া যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন এবং রামধনুর সাত রঙ নিয়ে হয়তো যথেষ্ট গবেষণাও করেছেন—এমন অনেক কৃতী ছাত্র বাস্তব ক্ষেত্রে কোনটা কি রঙ তা বলতে পারেন না। ভূগোলের কৃতী ছাত্র হিমালয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে রাতদিন গবেষণা করলেও নিজের ঘরের উচ্চতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান। আবার দেখা যায়—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চৌদ্দ পুরুষের নাম মুখস্থ বলতে পারলেও নিজের বংশের দুইতিন পুরুষের নাম পর্যন্ত বলতে পারেন না। পক্ষান্তরে না বলতে পারাটাকেও খুব দোষাবহ বা নিন্দনীয় কিছু মনে করেন না। বরং অনেকে ইহাকে আত্মশ্লাঘার বিষয় বলেও মনে করেন।

জ্ঞানের এই যে অসম্পূর্ণতা, দৃষ্টিভঙ্গীর এই যে অভাব, তার পরিবর্তন দরকার। নইলে
শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যায়। আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি নিয়ে, সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী
নিয়ে আমাদের শিশুরা তাদের পরিবেশকে সম্যকরূপে জানতে শিখুক, বুঝতে শিখুক,
উপলব্ধি করতে শিখুক এবং সেই লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক। নিজেদের
প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান কতখানি স্থান জুড়ে' আছে এবং
অলক্ষ্যে তা তাদের জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে—তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তারা আহরণ করুক।
তবেই ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

(খ) ভূগোল

ভূগোল পড়তে গিয়ে গোলে না পড়েছেন—এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই আছে।
দেশবিদেশের নাম ও নদনদী, হ্রদের সংজ্ঞা মুখস্থ করা যে কিরকম কষ্টকর তা কারও অবিদিত
নেই। কিন্তু তবু ভূগোল পড়তে হয়েছে। এজন্য ভূগোলশিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি উভয়কেই
দায়ী করা যেতে পারে।

ছেলেবেলায় অনেককেই মুখস্থ করতে হ'য়েছে—"যে শাস্ত্র পাঠ করিলে পৃথিবীর জল
ও স্থলের বিবরণ জানা যায়—তাহাকে ভূগোল বলে"। সেজন্য কতগুলি দেশের নাম, নদীর
নাম, পর্বতের নাম মুখস্থ করাই ভূগোল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই পৃথিবীতে
মানুষের বাস। মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যই নানা শাস্ত্রের অবতারণা। কাজেই প্রাকৃতিক,
বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি—কিভাবে মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে—তাই ভূগোল
শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্যই ভূগোলশিক্ষাকে আজকাল মানবকেন্দ্রিক করা হয়েছে।
এক দেশের ঋতু, জলবায়ু, অবস্থিতি প্রভৃতি ভৌগোলিক কারণগুলি সেই দেশের জীবনযাত্রার
প্রতি পদক্ষেপে, কি পোষাকে পরিচ্ছদে, কি আহারে বিহারে, কি শিল্পবাণিজ্যে—সর্বত্রই
মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা ভূগোলশিক্ষার
অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরাও এই কারণ খুঁজে বার
করুক। প্রচুর বৃষ্টি না হ'লে ধান হবে না, আবার শীতকাল ছাড়া গম হবে না; নোয়াখালী
চট্টগ্রামের অধিকাংশ লোকই কেন নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী, পক্ষান্তরে কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে
অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী ও কেরাণী—কেন এইসব হয়—কারণ কি? শিশুরা নিজেরাই
তার সমাধান করুক, তবেই ভূগোলশিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম দুই শ্রেণীতে—ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে—ভূগোলের
জ্ঞান সহজে আসে না এবং জোর করে' মুখস্থ করালেও তার সম্বন্ধে তাদের কোন সম্যক
ধারণা জন্মায় না। অথচ ৬।৭ বৎসরের শিশু চায়—তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হ'তে
এবং তা সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সমস্ত প্রাণমন দিয়েই করতে চায়। তার ব্যক্তিগত
অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশু যে জ্ঞান আহরণ করবে—সেটাই তার কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে থাকবে।
শিক্ষক হয়তো নদী কি তা বোঝাবার জন্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করছেন তবুও শিশুরা
বুঝতে পারছে না—কিন্তু বেড়াবার সময় যদি তাকে নদী দেখান হয়—তবে সহজেই নদী
সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারণা হবে।

পৃথিবী গোল না চ্যাপটা, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে
ঘোরে—এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারাটা শিশুর পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক
নয়—কিন্তু গ্রামের উত্তর পাড়ায় জেলেদের বসতি, দক্ষিণ পাড়ায় কয়েকঘর নাপিত আছে,
গ্রামের রাস্তার শেষদিকে বামধারে একটা পুরাণ ভাঙ্গা মন্দির আছে—এই সব তথ্য সংগ্রহ
শিশু খুব আনন্দের সঙ্গেই করতে চায়। রথের মেলায় কত লোক জড় হয়—কত রকম
খেলনা, খাবার আসে ইত্যাদি বিষয়ে শিশু খুবই আগ্রহান্বিত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্য
দিয়ে শিশুর প্রথম ভূগোলের জ্ঞান দেওয়া হবে এবং ধীরে ধীরে তাকে কার্যকারণ সম্বন্ধ
খুঁজে বার করতে উৎসাহিত করা হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজকাল অবিভিন্ন কার্যসূচী (undifferentiated curri-
culum) গ্রহণ করা হ'য়েছে। কাজেই প্রথম দুই বৎসর মাতৃভাষা শিক্ষার সময়ই নানারূপ
গল্পচ্ছলে শিশুর বাচনভঙ্গী বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে ভূগোলের জ্ঞান দিতে হবে।

হ'তে কে এনেছে, কেন এনেছে, কোনগুলি গ্রামে উৎপন্ন হয়, কোনগুলি অন্যগ্রাম থেকে এসেছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

৪। গ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। কোন-দিকটা উঁচু, কোনদিক নীচু, বর্ষাকালে কোথায় জল জমে, কোন পথে কাঁদা হয় এবং কেন এরকম হয় এই সমস্ত বিষয় হ'তে আলোচনা করে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রথম পাঠ আরম্ভ করা যেতে পারে। গ্রামে যদি নদী থাকে তবে নদীর ধারে শিশুদের নিয়ে গিয়ে তার গতি, উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে শিশুর কৌতূহল জাগ্রত করা যেতে পারে।

হাতের কাজ ও সংগ্রহ

(প্রথম শ্রেণীতে যা করা হয়েছে, তার অনুশীলন চলবে। তা' ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করা যেতে পারে।)

১। শিশুরা কাঁদা, মাটি, পাতা দিয়ে ঘরবাড়ী, পথঘাট ইত্যাদি তৈরী করবে।

২। শ্রেণীর নক্সা, বিদ্যালয়ের নক্সা, বিদ্যালয়ে আসার পথের নক্সা ইত্যাদি নানাবিধ নক্সা আঁকা।

৩। নানাবিধ ফসল ও বীজ সংগ্রহ করা এবং একটি সংগ্রহশালা (মিউজিয়াম) তৈরী করা।

৪। ফলের বাগান, সব্জীর বাগান ও ফুলের বাগান করা এবং কোন ঋতুতে, কত দিনে কোন গাছে কি ফল ও ফুল হলো তা লক্ষ্য করা।

৫। বৃষ্টি মাপবার যন্ত্র। কোনদিন কতখানি বৃষ্টি হলো শিশুরা তা লক্ষ্য রাখবে এবং সারা মাসে অথবা সারা বৎসরে কত ইঞ্চি বৃষ্টি হলো তা অনায়াসেই বার করতে পারবে।

৬। Weathercock—বাতাস কখন কোনদিক হ'তে প্রবাহিত হচ্ছে—এই যন্ত্রের সাহায্যে শিশুরা অনায়াসেই তা বুঝতে পারবে।

৭। Shadow-stick এর সাহায্যে ঋতুর সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান এবং বৎসরের কোন সময় ছায়া কোনদিকে হেলে পড়ে এবং দিনের বেলায় কোন সময়ে ছায়া ছোটবড় হয় এবং কেন সে সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া।

৮। শিশু দৈনিক যে সব জিনিষ ব্যবহার করে তা কোথায় কিভাবে হয় এবং কি করেই বা শিশু পায় সে সম্বন্ধে অবহিত করা ; যেমন থালা বাসন, চায়ের পেয়ালা, দোয়াত, কালি, কলম, চিরুণী, কাপড়, গামছা, জামা ইত্যাদি।

৯। পোষ্ট-অফিস সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা। ডাকঘর Project হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। শিশুরা এই বয়সে কাজ করতে ভালবাসে। যে কোন Project এর মধ্য দিয়ে তাদের এই কাজ করার সহজাত প্রবৃত্তিকে সহজেই পরিচালিত করা যেতে পারে; পক্ষান্তরে অঙ্ক, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলিরও অনুশীলন হবে। যেমন ডাকঘর, প্রোজেক্টের মধ্যে একদল পোষ্ট বাক্স তৈরী করলো, কেউ বা খাম তৈরী করলো। কেউ বা টিকিট বানাল, কেউ বা পোষ্ট মাষ্টার, কেউ বা পিয়ন, কেউ বা ভেণ্ডার সাজলো। টিকিট বিক্রয় করার সময় কে কত দিল, তার দাম কত ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্কের অনুশীলন চলতে পারে। চিঠিতে কে কি লিখবে, কাকে লিখবে ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করে ভাষা ও সাহিত্য শেখা হবে। তারপর কোন দেশের টিকিট কি রকম, তার দাম কত ইত্যাদি বিষয় উপলক্ষ্য করে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হবে। অবশ্য এই শ্রেণীর উপযোগী করেই সব বিষয় বলতে হবে।

১০। পরিবেশ-পরিচিতির নানাবিধ চার্ট বা ক্যালেণ্ডার তৈরী করা। কোথায় কোন গাছ কোন মাসে দেখেছে, কোথায় কোন ফুল কোন মাসে ফুটেছে, কোথায় কোন জিনিষ কখন কুড়িয়ে পেয়েছে তার চার্ট রাখা। প্রয়োজনবোধে শিশুরাই ছবি এঁকে দিতে পারে অথবা লিখে দিতে পারে। কোন মাসে কি পাখী দেখেছে, কোথায় কি পোকা মাকড় ধরেছে ইত্যাদি প্রাকৃতিক জীবজন্তু পোকামাকড়ের ইতিহাস সংগ্রহ করা যেতে পারে। এইভাবে প্রকৃতিপঞ্জী (Nature calendar or nature diary) তৈরী করা যেতে পারে।

(গ) ইতিহাস

ভূমিকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিষয়বস্তুর একটা সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় (subject) বিশেষ করে শিশুর স্বভাবের সামাজিক দিকের বিকাশের সাহায্য করে। ইতিহাসকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যেতে পারে ও নানারূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিন্তু ইতিহাস যে মানবজীবনের কাহিনী এই কথাটাই বেশী করে মনে রাখতে হবে। "অতীতে মানুষ যাহা ভাবিয়াছে ও করিয়াছে ইতিহাস তাহাই বর্ণনা করে।" তাদের সুখ দুঃখ, ভুল ত্রুটি, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, জয় পরাজয়ের কাহিনী। সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তারা কিভাবে এই পৃথিবীকে আরও আনন্দপূর্ণ ও আরামদায়ক করেছে তা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সামাজিক ভাবের বিকাশ সাধন করা। ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর পুনর্গঠন করে শিশুকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান জীবনের সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অতীতের ও দেশ-বিদেশের কাহিনী বলা উচিত। শিশুর সামাজিক বিকাশ তখনই সম্ভব হবে যখন শিশুর শিক্ষা উন্নত, বাস্তব ও জীবন্ত হবে। অর্থাৎ শিশুকে অফুরন্ত সুযোগ দিতে হবে যেন তার অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে সে কোনও শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন, মূল্যনিরূপণ, ও চিন্তা করে কাজে পরিণত করতে পারে। কোন বিষয় শেখাবার সময় মনে রাখতে হবে যে শিশুর মানসিক ক্ষমতা বা বোঝবার যোগ্যতা কতটা, তার জানবার ইচ্ছা বা আগ্রহ আছে কিনা, তার বয়স অনুসারে সে কতটা জানতে পারে এবং জানা উচিত। শিশুর ক্ষমতা, আগ্রহ ও প্রয়োজন এই তিন ভিত্তির উপর স্থাপন করতে হবে তার সমগ্র শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা।

শিশুরা স্বভাবতঃ কৌতূহলী, তারা দেশবিদেশের ও অতীতদিনের লোকদের জীবন, তাদের পছন্দ অপছন্দ, আচারব্যবহার, ধর্ম ও বিশ্বাস এই সব বিষয় জানতে চায়। এই কৌতূহল জাগিয়ে রাখা ও বৃদ্ধি করা উচিত যেন সেটা চিরদিন জাগরূক থাকে। ইতিহাস শিক্ষার ফলে শিশু ক্রমশঃ বুঝতে শিখবে যে অতীত থেকেই বর্তমানের উদ্ভব হয়েছে ও বর্তমানই আবার ভবিষ্যতে পরিণত হবে। আরও সে বুঝতে পারবে যে একজাতির ঘটনাবলী সময়ে সময়ে আর একজাতির ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে—যেমন বর্তমানে টাকার মূল্য হ্রাস (Devaluation), গত মহাযুদ্ধের ফলে অস্থায়ীভাবে অনেক ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি ও জীবিকা সমস্যা দূরীকরণ। ইতিহাসের গল্প সকল শিশুর কল্পনাশক্তির উদ্রেক করে ও তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

অবিভাজ্য শিক্ষা পদ্ধতিতে (undifferentiated curriculum) ইতিহাস শিক্ষার প্রণালী পুরাতন পদ্ধতি থেকে ভিন্ন প্রকারের হবে। গতানুগতিক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তে শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করে একটা নির্দ্ধারিত বিষয় (topic) নির্বাচন করে কাজ করা বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রের প্রচলিত প্রণালী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, পুরাকালের জীবনযাত্রা, জীবনযাত্রার দৈনিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন, পৃথিবীর নানাদেশের আবিষ্কার ও উন্নতি-বিষয়ক বর্ণনা, জাতির কৃষ্টি, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা (যথা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও কাজ করা যেতে পারে।

এই প্রণালীতে শিক্ষাদানে শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে শিশুর শিক্ষাগ্রহণ কাজগুলি (learning activity) তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত, কাজগুলির একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই এবং কার্য প্রসঙ্গে কোনও বিশেষ নির্বাচিত সমস্যার সমাধান করা যেন হয়। এই নির্দ্ধারিত বিষয়ের (topic) প্রসঙ্গে অথবা সেই বিষয় বোঝাবার বা কাজে পরিণত করবার জন্যে যে যে তথ্য বা জ্ঞানের প্রয়োজন ঠিক সেইগুলি যেন শিক্ষাদানের বা শিক্ষাগ্রহণের সময় স্থান পায়—প্রয়োজন ব্যতীত অবান্তর কথা উল্লেখ বা শেখানো বা গ্রহণ যেন কোনও মতে করা না হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীতে ইতিহাস শেখার স্থান কোথায় এবং যদি শেখানো হয় তা হলে কতটা বিষয়বস্তু দেওয়া উচিত এবং কোন প্রণালী বা কোন কোন প্রণালী অবলম্বন করলে শিশুর শিক্ষালাভ হবে এই সম্বন্ধে এখন দু' একটি কথা বলতে হবে।

ইতিহাসের বহুদিক আছে। ঐতিহাসিক বা ইতিহাস লেখক কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মানবজীবনের একটি দিক তুলে ধরেছেন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে সেটা জানা দরকার। কেউ জোর দিচ্ছেন অতীতদিনের কোনও এক বিশেষ বংশাবলীর কীর্তিকলাপের ওপর (Dynastic history)। কেউ বা জোর দিচ্ছেন অতীতদিনের কোনও এক নির্বাচিত অংশের সামাজিক অবস্থার ওপর। অন্য একজন হয়তো, অতীতদিনের শাসনতন্ত্র প্রণালী ও রাজনৈতিক অবস্থা ও উন্নতির বিষয় বর্ণনা করেছেন। শিশুশিক্ষক বুঝতেই পারছেন যে, ইতিহাসের এই কোন রূপ শিশুর সামনে ধরা যেতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে যে শিশুকে কি তাহলে ইতিহাস শেখানো দরকার নেই এই প্রথম অবস্থায়? উত্তর এক কথায় দেওয়া চলে না—তবে এটা ঠিক যে ইতিহাসের সহজ ও সুন্দর রূপ অর্থাৎ অতীতের মানব-জীবনের কাহিনী এই দিকটা শিশুকে তার ক্ষমতা, আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুসারে ক্রমে ক্রমে পরিচয় করিয়ে দিতে পারা যায়। ইতিহাসের সত্যাসত্য বা গবেষণামূলক তথ্য শিশু এই বয়সে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করতে পারবে না কিন্তু তাই বলে তাকে ইতিহাস শেখা থেকে বঞ্চিত করা চলে না। এখন প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ ৭ থেকে ৯ বছরের ছেলেমেয়েদের কি কি প্রণালীতে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে কিছু বলব। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে "সাধারণ শিশু" বলে কিছু ধরাবাঁধা বস্তু নেই। শিক্ষক তাঁর বিশেষ বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্ষমতা, আগ্রহ ও পরিবেশ লক্ষ্য করে সেই অনুসারে তাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিতে আরম্ভ করবেন। বয়সের হার সবসময়ে মাপকাঠি হবে না—শ্রেণীর মাপ-কাঠিও অনেক সময়ে সাহায্য করে না। স্থানীয় শিশুদের বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে অর্থাৎ অন্য বিদ্যালয়ের তুলনায় এরা হয়তো এগিয়ে গেছে বা পিছিয়ে পড়ে আছে। শিক্ষক নিজের জ্ঞান অনুসারে সেখানে ইতিহাস শেখাবেন এবং উল্লিখিত প্রণালীর যেগুলি প্রয়োগ করা চলে সেইগুলি ব্যবহার করবেন। এমনও হতে পারে যে কোনও অঞ্চলের শিশুরা কোনও কারণে ইতিহাস শেখার জন্য আগ্রহ দেখায়নি এবং শিক্ষকের উৎসাহ বা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এই স্থলে শিক্ষক ইতিহাস শেখাবার চেষ্টা স্থগিত করবেন। প্রথম দুই শ্রেণী ছেড়ে হয়তো তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে তারা ইতিহাস শিখতে প্রস্তুত হবে তখন শিক্ষক যেন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত উন্নততর ইতিহাস তাদের কাছে উপস্থিত না করেন। আরম্ভ করতে হবে প্রথম অবস্থার প্রণালীর সাহায্যে এবং একটু পরেই শিক্ষক দেখবেন যে তারা সহজে ও শীঘ্রই দ্বিতীয় অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীতে ঐতিহাসিক কাহিনী বলা যেতে পারে কিন্তু তার ভেতর ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্যের সঙ্গে যোগ বেশী। রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, পুরাণের কাহিনী, সঙ্কলিত "সেকালের কথা" এইগুলি থেকে শিক্ষক গল্প বেছে নিতে পারেন। গল্প বলার সঙ্গে অভিনয় করা, ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করা, কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করে নিজেকে অতীতের লোকদের সঙ্গে এক করে ফেলা, এই অভিজ্ঞতাগুলি ইতিহাস শেখার পর্যায়ে পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শিক্ষক চারটি প্রধান উপায় অবলম্বন করে ইতিহাস শেখা আরম্ভ করতে পারেন।

১। **মহামানব জীবন কাহিনীর ভেতর দিয়ে ইতিহাস শিক্ষা।**—ইতিহাসের সঙ্গে শিশুর পরিচয় হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন কাহিনীর ভেতর দিয়ে। এই বয়সের ইতিহাস শিক্ষা বাস্তব ও ব্যক্তিগত হওয়া চাই। এইভাবে শেখার একটা ত্রুটি থেকে যায়—ধারাবাহিকতার (continuity) অভাব হয়। জীবনচরিত সঞ্চয়ন করা হয় অতীতের বা দূরবিদেশের ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত পাতা থেকে—অসংলগ্নভাব এসে পড়ে সেই শেখার মধ্যে। এই অভাব দূর করা যেতে পারে যদি ঐ জীবনীগুলি একটি পর্যায়ের ভেতর ফেলে একটু সাজিয়ে, পড়ানো যায় যেমন—আবিষ্কারের প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন আলোচনা করা এবং আবিষ্কারের ক্রমবিকাশ ও উন্নতিকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষা গ্রহণ করা।

২। কোনও নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন করে ইতিহাস শেখা।—এটা দুইভাবে হতে পারে (ক) সময়ের অনুক্রম অনুসারে বিষয় নির্বাচন করা, (খ) প্রসঙ্গক্রমে নির্বাচন করা। যে প্রণালীই অবলম্বন করা হোক শিশু যেন সেই বিষয়টি চারিদিক থেকে দেখে তার সঙ্গে জড়িত ছোট ছোট আরও প্রশ্ন ও আলোচ্য বিষয় দেখতে পায়। সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে সেই শেখার মধ্যে থেকে যেন শিশু সত্য খুঁজে পায়।

৩। কাজের ভিতর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগ্রহণ **(Activities)**।—পুরাণো প্রণালীতে ইতিহাস শেখানোতে জোর পড়ত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি স্মরণে রেখে প্রশ্নের বা পরীক্ষার উত্তর দেওয়ার উপর। নতুন ব্যবস্থায় শিশুর কাজের তালিকা বেড়ে গেছে। শিশুকে মুখস্থ করতে হয় না কিন্তু কাজ করতে হয়, এই কাজ করার ভেতর শিশুর অভিজ্ঞতা বাড়ছে। সে পর্যবেক্ষণ করে, অনুসন্ধান করে, হাতের কাজ দিয়ে জিনিষ তৈরী করে, অভিনয় করে, ইতিহাস বোঝে ও শেখে। উদাহরণ নীচে দেওয়া হোলঃ—

(১) স্থানীয় নগর বা গ্রামের মানচিত্র পরীক্ষা ও তৈরী করা(local map-making),
(২) নমুনা দেখে নকল তৈরী (model-making),
(৩) কোনও বিশেষ বিষয় বেছে তার অাঁক কষে সংগ্রহ করা তথ্য সাজানো যথা— স্থানীয় জীবিকা নির্বাহের উপায়গুলি ও প্রত্যেকটির জনসংখ্যা নির্ধারণ,
(৪) চলচ্চিত্রে ঐতিহাসিক চিত্র দেখা,
(৫) Museum ও ঐতিহাসিক মূল্য পূর্ণ বিশিষ্ট জায়গা পরিদর্শন,
(৬) ছবির বই তৈরী, ছবি সংগ্রহ করে, বর্ণনা লিখে ইতিহাসের বই তৈরী,
(৭) অভিনয়—নাটক রচনা, পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী,
(৮) পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা।

এই প্রণালীতে ইতিহাস শিক্ষায় শিশুদের স্বাধীনভাবাপন্ন হতে সাহায্য করে, অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে তাদের বয়সানুযায়ী আত্মনির্ভরতা বাড়ে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার ইচ্ছাও বাড়ে। এর পরিণতি হয় বিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজ আবির্ভাবে।

৪। **ছাত্রসমাজ।**—শিশুদের জিজ্ঞাসু মন কোনও সমস্যার সমাধান করবার সময়ে ব্যক্তিগতভাবে অতীতের ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে এবং বুঝতে পারে যে অতীতের চিন্তাধারা, কার্যপ্রণালী, বিচার ও প্রচেষ্টা বর্তমানের থেকে পৃথক। এই সত্য উপলব্ধি করা ইতিহাসের এক প্রধান উদ্দেশ্য। এই আবিষ্কারের সঙ্গে শিশু ইতিহাসকে নিজস্ব করে—শুষ্ক প্রাণহীন অতীতের শিক্ষা রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিগত সজীব অতীত কাহিনীর আকারে।

প্রাথমিক অবস্থায় ইতিহাস শিক্ষার প্রণালী

শিশু এবং তার ঔৎসুক্য ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে তার প্রথম পাঠ আরম্ভ হবে। গতানুগতিক নিয়মে বিষয় শিক্ষার উপরে প্রথমে জোর না দিয়ে ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করতে হবে। কাজ করবার সময় দুইটি বিষয় মনে রাখতে হবেঃ—

(১) সমস্ত বিষয়বস্তুর বাস্তবজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি থাকবে,
(২) সমস্ত পাঠগুলি শিশুদের চিত্তাকর্ষক হবে।

এই দুইদিক থেকে বিচার করলে বিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ইতিহাস শেখার প্রকৃত স্থান নেই। ইতিহাস শেখার একটা প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমানকে ভাল করে জানা, সমসাময়িক নির্ধারণ করতে শেখা যেন তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা করে ভবিষ্যতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণ ও সম্পন্ন করতে পারে। ইতিহাস শিক্ষাকে প্রাণবন্ত বলে দেখানো হবে, অতীত ও বর্তমানের ঘটনাগুলি চলন্ত দৃশ্য বলে মনে হবে; স্থির বা প্রাণহীন পট বলে মনে হবে না। শিশুদের জন্য মাঝে মাঝে আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে

তাদের ভালমন্দের বিচারশক্তি হয় এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের মূল্যনির্ধারণ উচ্চতর শিক্ষাস্তরে অত্যন্ত দরকারী। কোনও বিশেষ বংশের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া আদর্শ নয় বরং শিশুকে শেখাতে হবে যে এক বিশেষ যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা কিভাবে জীবনধারণ করত। বিচার ক্ষমতার উন্মেষ সাধন করতে পারা ইতিহাস শিক্ষার প্রধান সুফল।

১। **গল্প-বলা ও তৎসম্পর্কিত প্রণালী।**—যেহেতু ৭ থেকে ৯ বছরের শিশুরা সময়ের ধারণা করতে পারে না সেই হেতু এই স্তরের ইতিহাস শিক্ষা গল্পের মধ্যে দিয়েই হবে। এই গল্পগুলি সমস্তই যেন পৌরাণিক ও বীরত্বব্যঞ্জক হয় ও বিস্ময় উদ্রেক করে। এগুলি সাহিত্যের অঙ্গ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ও দরকার হলে অভিনয়ও করা যেতে পারে। সময়ের অনুক্রম বাদ দিতে হবে। শিক্ষক বিষয়টি "অনেক অনেক দিন আগে" ঘটেছিল, এরকম করে আরম্ভ করতে পারেন। যেহেতু এই সময়ে স্থান সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয় সেইজন্য শিশুর পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস ও ভূগোলের সমন্বয় করা সম্ভব নয়। এই সময়ে স্থান ও কালের জ্ঞান না দিলেও চলে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইতিহাস শেখার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে গল্প বলা কিভাবে আরম্ভ করা যেতে পারে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারা অনুসারে শিক্ষক শ্রেণীতে স্ব ইচ্ছায় সোজাসুজি কোনও বিষয় উপস্থাপন করতে পারবেন না। তাই গল্প বলা সাধারণ নিয়মে কোনও ভ্রমণের পর বা কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসবার পর আরম্ভ করা যেতে পারে।

উদাহরণ।—(ক) প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির বা তীর্থস্থান দর্শন, (খ) বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত উৎসব—

বুদ্ধ জন্মোৎসব থেকে বুদ্ধদেবের বিষয় আলোচনা,
জন্মাষ্টমী থেকে কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা,
ঈদ থেকে মহম্মদের বিষয় আলোচনা,

এই সব মহামানবের স্মরণে বিদ্যালয়ের উৎসবানুষ্ঠানের দিনগুলির আগে বা পরে।

(ক) **ঐতিহাসিক গল্প কথা** বলতে পারা যায়। কোনও বিশিষ্ট লোকের ছবি দেখে বা কোনও বিশেষ যুগের ছবি থেকে বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে।

পৌরাণিক গল্প বলবার সময়ে নীতিবোধ বা সত্যাসত্যের উপরে বিশেষ জোর না দিয়ে মানবতার উপরে বেশী জোর দিতে হবে। শিশুদের পরিচিত গল্প রামায়ণ, মহাভারত, ও পুরাণ থেকে গল্প আহরণ করতে হবে। ঐসব বই থেকে শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী রাম ও লক্ষ্মণের বাল্যজীবনের কয়েকটি ঘটনা, অর্জুন ও একলব্য কাহিনী, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের শৌর্যবিষয়ক কথা বলা যেতে পারে। যদিও এই সময়ে শিশুর সময়জ্ঞান, কার্যকরণ বা বাস্তব ও কল্পনার সম্বন্ধে কোনও প্রকৃত ধারণা হয় না—তবুও শিক্ষক অল্পভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের ভেতর এই ধারণাগুলি সহজভাবে উদ্রেক করবার চেষ্টা করবেন। এটা সম্ভব হবে যদি শিক্ষক তাদের ক্ষমতানুযায়ী খানিকটা আলোচনা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা স্থানীয় ইতিহাসের প্রতি তাদের কৌতূহল জাগাতে পারেন।

(খ) **দেশবিদেশের আবিষ্কার ও ভ্রমণ কাহিনী এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা** শিশুদের উপযোগী করে বলা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে নিজের দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেলে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশী। শিশুর কৌতূহল, জ্ঞানপিপাসা ও আগ্রহ ভৌগোলিক সীমার ভেতর আবদ্ধ থাকে না। অতীতের কয়েকটি মহান জাতির ইতিহাস ও গল্প শিশুদের কাছে খুব চিত্তাকর্ষক হয়—পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য জিনিষের উল্লেখ করে চীনের প্রাচীর, বাবিলনের দোলায়মান বাগান, রোডসের (Rhodes) কলোসস্ মূর্তি, মিসরের পিরামিড এই প্রসঙ্গে দেশগুলির বিষয় সামান্য উল্লেখ চলতে পারে। চীন ও মিসরের ইতিহাস শিশুদের কাছে প্রিয়। এই দেশ দুইটির ভৌগোলিক দূরত্ব ও সময়ের তাৎপর্য খুব বেশী বলে শিশুর

মনে বিস্ময় জাগায় ও তার আগ্রহ বাড়ায়—কল্পনার মায়াজালে বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাস জড়িত হয়ে এক রঙগীন স্বপ্নের আকার নেয়। এইরকম করে শিশুর সঙেগ অতীতদিনের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিতে পারা যায়।

(গ) ছবি।—সুন্দর ও স্পষ্ট করে আঁকা, রঙীন, ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনীর ছবি—ইতিহাস শেখার সহায়তা করে। ছবিতে চেহারা, মুখের ভাব লক্ষ্য করে সেই লোকের মনের ভাব আভাসে বুঝতে পার যায়। সেই সময়ের যুদ্ধ-সজ্জা, পোষাক পরিচ্ছদ ও আসবাবাদি লক্ষ্য করে সামাজিক অবস্থার ও সভ্যতার স্তর নির্ণয় করা যেতে পারে। পরে শিশুরা নিজে সংগ্রহ করে ছবির খাতা ও ইতিহাসের বই তৈরী করতে পারে। গৃহীত ছবি থেকে তাদের ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুসারে ঐতিহাসিক তথ্য জানতে শেখে।

ছবি দেখে যেভাবে ইতিহাস শেখানো যায় যাদুঘরে বা ঐ জাতীয় শিক্ষার স্থানে সংগৃহীত ঐতিহাসিক বা জাতীয় জীবনের কৃষ্টির মুদ্রাঙকস্বরূপ যে **দ্রষ্টব্য উপাদানগুলি** আছে সেগুলি (Exhibits) দেখে শিশুর জ্ঞান আরও স্পষ্ট হয়। পুরাকালের যুদ্ধ-সজ্জা, রাজা-রাণীর পোষাক, অলঙকার ও সিংহাসন দেখে শিশু আনন্দ ও জ্ঞান দুইই লাভ করবে। এই অভিজ্ঞতা আরও সুদৃঢ় হবে যখন শিশু ঐগুলি দেখে বিদ্যালয়ে ফিরে এসে তার আগ্রহ অনুসারে কয়েকটি জিনিষ আঁকবে বা তৈরী করবে বা ঐ বিষয়ে আলোচনা করে সেই সম্বন্ধে পড়তে চাইবে বা অভিনয়ের সময় ঐ জিনিষগুলি তৈরী করে ব্যবহার করবে। ঐ জ্ঞান তাদের সাহায্য করবে অভিনয়ের সময় ঐ চোখে দেখা ইতিহাসের চিহ্নগুলি থেকে যে জ্ঞান সে অর্জন করল সেটা তার নিজস্ব ধন হয়ে যাবে।

(ঘ) **পাঠ্যপুস্তক।**—এখন থেকে শিশু ইচ্ছা করলে সহজ ঐতিহাসিক কাহিনী বা গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করতে পারে এবং পাঠ্য বিষয় পড়ে ও বুঝে আনন্দও পাবে।

(ঙ) **অভিনয়।**—শোনা গল্প অভিনয় করার মধ্যে শিশু যেমন একদিকে পায় আনন্দ অন্যদিকে সে নানাভাবে অভিজ্ঞতাকে বাড়াবার সুযোগ পায়। অভিনয়ের আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপের ভেতর অনেকগুলি কাজ এসে যায় যেমন—নিজের ভাষায় নাটক রচনা করা, সাজপোষাক তৈরী করা, রঙগমঞ্চ সাজানো, প্রত্যেক অঙেকর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (যেমন সিংহাসন, তরবারি, বন্দীশালার দুয়ার, ঘণ্টা, শাঁখ, মঙগলঘট ইত্যাদি) গুছিয়ে রাখা ও প্রয়োজনমত তুলে দেওয়া, মিলিতভাবে অভিনয়ের সব কাজ সমাধান করা। কল্পনা থেকে প্রথমে সাজ পোষাক তৈরী করবে। শিশু পরে বয়স ও অভিজ্ঞতা অনুসারে নাটকের কালে প্রচলিত সাজসজ্জা সে শিক্ষকের সাহায্যে বই থেকে খুঁজে, ছবি এঁকে, মাপ দিয়ে তৈরী করালে ইতিহাস শেখার সঙেগ সহজ ও সুন্দরভাবে হাতের কাজের সমন্বয় সাধন হতে পারে। শিক্ষককে সাহায্য করতে হবে সংগ্রহ, রচনা ও প্রযোজনায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্রেণীর সকল শিশু কিছু কাজ করবার সুযোগ পায় এবং তাদের যুক্ত সাহায্যে ও পরিশ্রমে অভিনয়টি যেন সম্পন্ন হয়। ইতিহাস শেখার সঙেগ জড়িত হবে পরস্পরের মিলেমিশে কাজ করবার সুযোগ ও অভ্যাস, ভেবে পরামর্শ করে পরিকল্পনা বা কাঠামো তৈরী করা, সঙেগ সঙেগ এসে পড়বে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য—সঙকল্প, সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে একটি কাজে পরিণত করা।

৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙেগ নিম্নলিখিত তিনটি প্রণালীতে ইতিহাস শেখা আরম্ভ হতে পারে —৯ থেকে আরম্ভ করে ১১ বছর পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা যেতে পারে :—

মূলসূত্র প্রণালী বা Source Method।

Projects হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানলাভ (Survey)।

ছাত্রশাসন হতে নাগরিকতা শিক্ষা (Civic training) ও দেশশাসন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান।

মূলসূত্র প্রণালী।—শিশু পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটা সমস্যা (problem) বুদ্ধির সঙ্গে পরীক্ষা করতে শেখে। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োজন শুধু বিজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য গবেষণাগারে নয়—ইতিহাস শেখার জন্যও কাজে লাগতে পারে। সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় শিশুকে পরিমাণে অনেকটা জ্ঞান দেওয়া বরং সে কিভাবে বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি ব্যবহার করছে, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে কতটা জ্ঞানলাভ করছে তার উপর জোর পড়ছে মূলসূত্র থেকে তথ্য আহরণ করার একটা বড় উপকার এই যে শিশু নিজে থেকে পড়ে বিচার করে, পরীক্ষা করে সত্য আবিষ্কার করছে। ভবিষ্যতে সে শোনা কথায় সহজে বিশ্বাস করবে না। সাধারণতন্ত্র সমাজের একটা বড় ভিত্তি হবে যখন প্রত্যেক নাগরিক পরীক্ষামূলক শিক্ষার ফলে ও বিচারশক্তির প্রয়োগে জীবনের ও রাষ্ট্রের সব প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান করবে। অপরের দ্বারা চালিত না হয়ে নিজের শক্তিতে সত্য গ্রহণ করবে ও সেই অনুসারে কাজ করবে।

এই প্রণালীতে ইতিহাস শিক্ষা সহজভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরম্ভ করা যেতে পারে। স্থানীয় ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে যাওয়া তারপর সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস পুনর্গঠন করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—মুর্শিদাবাদের শিশুদের পুরাতন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখানো ও তৎ-সম্পর্কে আলোচনা ও ইতিহাস শেখা। এইখানে তারা যে বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখল সেটার মূল্য এই যে শিক্ষকের মৌখিক গল্প বলবার মধ্যে যে ফাঁক ছিল তা পূর্ণ করে শিশু নিজের মনে বিগত দিনের ইতিহাসের কিছুটা তৈরী করে নিতে পারে। অতীত সেই অল্প সময়ের জন্য তাদের কাছে মূর্ত হয়ে দেখা দেবে। শিক্ষক ইচ্ছা করলে এখানে সাহিত্যের সমন্বয় (correlation) করতে পারেন ও এমন সাহিত্য পড়তে অনুপ্রাণিত করতে পারেন যা সেই যুগের সাক্ষ্য দেয়। সেই সময়ের লোকদের অবস্থা, বস্ত্র ও খাদ্যের সুলভতা, যানবাহন, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ, অস্ত্র ও যুদ্ধ-সজ্জা, জীবিকানির্বাহের উপায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ও আলোচনা, উপযুক্ত পরিচালনার মধ্যে দিয়ে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষক কোন সময়েই নিজের মতামত জোর করে খাটাবেন না। এই ধরণের কাজ করতে গিয়ে যদি তিনি শিশুদের অমনোযোগ লক্ষ্য করেন তবে তিনি তৎপর হয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা পরিত্যাগ করবেন কারণ শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করাই শিক্ষার একটা মূল উদ্দেশ্য।

কোলকাতার Victoria Memorial স্মৃতিসৌধ বা আগ্রার তাজমহল পরিদর্শনে আনন্দ আছে। প্রথমোক্ত স্থানে সযত্নে রক্ষিত রাণীর ব্যবহার্য জিনিষগুলি ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখে, সেই সময়ের বিখ্যাত লোকদের ছবি দেখে, নানারকম চিঠি ও কাগজপত্র দেখে, models পরীক্ষা করে, শিশুদের মনে ইতিহাসের ব্যক্তিগত দিক ও মানবিকতার দিক (human element) স্পষ্ট করে চোখে পড়ে। Fort William কেল্লা পরিদর্শনে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শিশুরা তাদের অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত দেখে তাই এই সময়ে শিক্ষক কখনও কৃত্রিম উপায়ে তাদের উত্তেজিত করে বা তাদের কৌতূহল উদ্রেক করবেন না। হাতের কাজ, সেলাই, আঁকা, ও model তৈরীর ভেতর অভিজ্ঞতা নিজের ধন হয়ে যায় "learning by doing" সেকালের শিল্পকলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন শিক্ষক যখন সেকালের আসবাব, অস্ত্র, অলঙ্কার, ও পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে শেখাবেন।

৩। Project ও Survey আগে যা কিছু বলা হয়েছে তার ভেতর project method এর আভাস আছে—অভিনয় করা বা ধ্বংসাবশেষ দেখে সেই দিনের ইতিহাস পুনর্গঠন করা project এরই অঙ্গ। বিশেষভাবে এখন বলা হবে কি করে এই প্রণালীতে ইতিহাস শেখানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষভাগে বা তৃতীয় শ্রেণীর প্রথমদিকে শিক্ষক সহজভাবে এই প্রণালীতে মূল্যবান ইতিহাস শিক্ষা আরম্ভ করে দিতে পারেন। ইতিহাস শেখার নানা উদ্দেশ্যের ভেতর একটা উদ্দেশ্য বর্তমান জীবনকে ভাল করে জানা ও বোঝা এবং এই জ্ঞান আসবে যখন শিশু দেখতে শিখবে অতীতের কোন ঘটনা থেকে বর্তমানের কোন অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে বা

কিভাবে এক ঘটনা অপর ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে বা দুই ঘটনার মধ্যে সংযোগ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিশুকে তার পারিপার্শ্বিক স্থানটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করতে সাহায্য করা হবে। শিক্ষক একদিন তাদের নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরোবেন পাড়ার শেষে বড় রাস্তায় এসে পড়বেন বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা প্রশ্ন করবে এটা কি? ওটা কি? কেন? কখন? কে আরম্ভ করল? না থাকলে কি হোত? শিক্ষক তাদের বোঝবার ক্ষমতা অনুসারে সহজভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবেন ও কৌতূহল উদ্রেক করবেন। এইরকম করে ক্রমে ক্রমে তারা বাসগৃহ, প্রয়োজনীয় স্থান যেমন ডাক্তারখানা আগুন নেবাবার দমকলখানা, ট্রাম ডিপো, বই ও কাপড়ের দোকান, হাট ও বাজার, খেলবার মাঠ বা পার্ক, সিনেমা, আদালত, ছাপাখানা, জেল, নদীর উপর সাঁকো, বন্দর, মন্দির, শ্মশানঘাট, কলেজ, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি দেখবে ও ধীরে ধীরে বুঝবে Town planning এর মূল্য। তাদের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় হবে ও প্রত্যেকটির প্রয়োজন বুঝবে ও প্রশ্ন করবে। এইভাবে তারা জানতে পারবে যে জীবনযাত্রা স্থির দৃশ্য নয় বা পট নয়—তা চলন্ত, জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল—আজ যেখানে ছোট নৌকা করে খড় ও ইঁট বোঝাই করে নদীর একদিক থেকে অন্যদিকে ব্যবসা করছে বণিক কাল বাষ্পযানের সাহায্যে বড় নৌকায় একসঙ্গে দশগুণ খড় বা ইঁট স্থানান্তর করতে পারা যাবে তাতে বণিকের লাভ হবে বটে কিন্তু নৌকার মালিক ও মাঝির কাজ কমে যাবে বা থাকবে না। Unemployment এর সমস্যা এইভাবে সম্মুখীন করা হবে শিশুর অভিজ্ঞতার ভেতর।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার survey করে এই কয়েকটি ভাবে ইতিহাস শিক্ষা দিতে পারা যায়ঃ—

(ক) **ইতিহাস ও পরিবেশ।**—জাতি, বেশভূষা, কাজ ও অবসরকালীন খেলাধূলা বা অন্য রকম আনন্দের ব্যবস্থা যেমন কথকতা বা যাত্রা। খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা—ভিন্ন অঞ্চলে কি কি উপায়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(খ) **রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নাগরিকের সুবিধার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা।**—শিক্ষা ও শুশ্রূষালয়ের ব্যবস্থা। যন্ত্রের আবিষ্কার, ব্যবহার ও জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন।

(গ) **জ্ঞানবৃদ্ধি।**—জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্তন যেমন কারখানা, বৈদ্যুতিক ও অন্য উপায়ে চালিত যানবাহন, খাল ও রাস্তা তৈরী, জঙ্গল কাটানো। সহরের আরম্ভ—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি।

অতীতে নিজ হাতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী—এখন বেশীর ভাগ কারখানায় প্রস্তুত (personal past ও impersonal present)।

খাদ্যসমস্যা ও অন্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা—বাণিজ্যে আদানপ্রদান

৪। **নাগরিকতা শিক্ষা।**—শ্রেণিগত নির্বাচন দিয়ে শিক্ষক দেশশাসন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান দিতে পারেন। তিনি নায়ককে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেবেন, প্রত্যেক সভ্যকেও কর্তব্য বুঝিয়ে দেবেন ও তারপর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যে যুক্ত দায়িত্ব, সহযোগিতা প্রভৃতি শ্রেণীকার্যের বিশেষত্বগুলি বিস্তৃতভাবে দেশশাসন প্রণালীর উপর প্রযোজ্য। ভোট দেওয়া, শুল্ক দেওয়া, জল, আলো, শুশ্রূষালয়, বাজার, স্কুল, পুস্তকাগার, এই সমস্তই স্থানীয় দায়িত্ব ও শাসনের আঙ্গিক। এইভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবে ও জীবনে কি চাই বুঝতে সক্ষম হবে এবং সেটা লাভ করবার পথে যে সমস্ত বাধা এসে পড়ে সে সব বোঝবার জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়বে। শিশুকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া হবে। কার্যসূচী যতটা সম্ভব পরিবর্তনশীল করতে হবে। বাস্তবের সঙ্গে তার শিক্ষার সম্বন্ধ আছে কিনা সে বিষয়ে সব সময়ে সতর্ক থাকতে হবে ও ছেলেমেয়েরা সেই সম্বন্ধটা দেখতে পারছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হবে। রাষ্ট্রশাসনকার্য আলোচনার সময় শিক্ষক স্পষ্ট করে তাদের বোঝাবেন যে দাবীর সঙ্গে দায়িত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে আশা করে ও দাবী করে বহু সুবিধা, সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের নিজের কতকগুলি কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে রাষ্ট্রের প্রতি। উভয়ে যখন কর্তব্য সাধনে তৎপর হয় তখন সেই রাষ্ট্রের কার্য ও সেই রাষ্ট্রবাসীদের জীবন সুখময় হয়।

(ঘ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

উদ্দেশ্য

প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীতে প্রকৃতিবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে (১) শিশুর পর্যবেক্ষণশক্তির বিকাশে সাহায্য করা, (২) তার ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি সাধন করা, (৩) আবিষ্কারের বা নিজে জেনে নেবার, পরীক্ষা করার স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে জাগরূক রাখা এবং (৪) ক্রমশঃ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরীক্ষণ করা, কার্য-কারণ সম্বন্ধ, মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদের পরস্পর নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা। এক কথায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলা এবং শিশুকে বিজ্ঞানী ক'রে তৈরী করা প্রকৃতি পরিচিতির অন্যতম লক্ষ্য।

সাধারণ পদ্ধতি

শিশুকে সুযোগ দিতে হবে পরীক্ষা করবার; প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবার। হাত ফেরতা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অনেকাংশে শিশুর কাছে নিরর্থক হয়। ৬-৮ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শ্রেণীতে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন নেই। তাতে শিশুরা আগ্রহবোধ ক'রবে না। প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ ক'রতে গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় যে সাধারণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রবে শিশুর পরিবেশের মধ্যে যেটুকু বিজ্ঞান স্বাভাবিকভাবে আসবে প্রধানতঃ তাকে কেন্দ্র ক'রেই শিশুর প্রকৃতিবিজ্ঞান গড়ে উঠবে। ঐ বয়সের শিশুকে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে পরিচিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পাখীর ডানার বর্ণবৈচিত্র্যে ও তার গানে মুগ্ধ হ'য়ে শিশু পাখীর পেছনে ছোটে, এভাবে সে পাখী সম্বন্ধে অনেক কিছু নিজেই জেনে ফেলে। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির ধারা নামে। শিশু বৃষ্টিবিন্দুর টুপটাপ শব্দ শোনে আর ভাবে বাতাসের বুক চিরে কেমন ক'রে জল নেমে আসে। বয়োজ্যেষ্ঠদের বাগানের কাজ ক'রতে দেখে শিশুও বাগানের কাজ ক'রতে চায়, সে মাটি ঘেঁটে আবিষ্কার করে এঁটেল মাটি ও বেলে মাটির প্রভেদ, নিজের হাতে লাগানো চারাগাছটি একদিন ফুলে ফলে সুন্দর হ'য়ে ওঠে, শিশুর আনন্দ আর ধরে না। শীতের ভোরে ঘাস কেন ভিজা থাকে, দিনের পরে কেন রাত আসে, মাছ কেন জলে থাকে—এরকম কত প্রশ্ন শিশুর মনের মধ্যে ভিড় করে। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নির্মল অফুরন্ত আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়ে শিশু বিজ্ঞানী হ'য়ে ওঠে। পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রকৃতি শিশুকে অফুরন্ত সুযোগ দেয়। শিক্ষক শিশুকে ঐ সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না করেন। ভুট্টাগাছের জীবন ইতিহাস ছেলেমেয়েদের মুখস্থ না করিয়ে শিক্ষক শিশুদের ভুট্টার বীজ বপন ক'রতে দেবেন, নিজের হাতে লাগানো গাছটির ক্রমবিকাশ সে দিনের পর দিন সানন্দে পর্যবেক্ষণ করবে, গাছটিকে যত্ন ক'রবে, গাছটিতে ফল আসবে, শিশুর মন খুসীতে ভ'রে উঠবে। ভুট্টার জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন ক'রে তার শিক্ষাকে সার্থক ক'রবে।

বলা বাহুল্য প্রকৃতিবিজ্ঞান বইএর কয়েকটি পাতায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রকৃতির বিরাট রাজ্যই শিশুর পাঠ্যপুস্তক। শিশুকে প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ করবার জন্য বরং তার অণুসন্ধিৎসাকে জাগরূক রাখবার জন্য অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে দুদিন শিশুদের সংগে প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে হবে এবং ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার সুযোগদান ক'রতে হবে। প্রয়োজনবোধে অবশ্য পাঠদানের সময় তালিকা পরিবর্তিত হ'তে পারবে। যথা, বাংলা সাহিত্যের পাঠদানকালে বাইরের শস্যক্ষেত্রে যদি এক ঝাঁক টিয়া এসে বসে এবং তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে যদি শিশু টিয়া সম্বন্ধে জানবার জন্য আগ্রহান্বিত হয় তবে শিক্ষক, সেই সময় সাহিত্যের পাঠদান না করে পাখীগুলিকে দেখাবার জন্য শিশুদের অনুমতি দেবেন এবং ঐ পাখীগুলি কি রকম দেখতে, কি তারা খায়, কেমন ক'রে ওড়ে ঐ সব আলোচনা ক'রবেন।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি নির্ধারিত হবে বিভিন্ন ঋতু ও পরিবেশের দ্বারা। শীতকালে পাট চাষের কথার অবতারণা করা হ'লে শিশু প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে না। আকাশ যেদিন নির্মল, মেঘমুক্ত সেদিন মেঘের আলোচনা নিষ্ফল। সহরবাসী ছেলে-মেয়েকে মটরশুঁটির জীবন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাতে হ'লে তার শ্রেণীকক্ষে মাটির সরাতে কিংবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মটর বীজ বপন ক'রে অথবা নিকটবর্তী গ্রামের মটর ক্ষেতে শিশুকে নিয়ে গিয়ে মটরগাছ বা তার চাষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা ক'রা যেতে পারে।

বিশেষ পদ্ধতি

(১) ফলফুলের বাগান ও প্রকৃতি পরিচিতি

প্রকৃতিপাঠের জন্য সব্জী ও ফুলের বাগান প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। বিদ্যালয়ের জমির খানিকটা অংশকে ছোট ছোট ক্ষেত্রে বিভক্ত ক'রে সেগুলিকে চাষের উপযোগী ক'রে তৈরী ক'রে দিয়ে তাতে ছেলেমেয়েদের বীজ বপন ক'রতে যদি দেওয়া হয় এবং এক একটি দলকে এক একটি ক্ষেত্র চাষ করার জন্য যদি দেওয়া হয় তবে বাগানের কাজের ভেতর দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ জন্মাবে—নিজের ভূমিটাকে ফুলেফলে সুন্দর করে তুলতেই যে হবে তাকে। উপরন্তু অংকুরোদ্গম, শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং কিরূপে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, তাপ, জল ও মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তা' পরীক্ষা করতে পারবে এবং উদ্ভিদের 'শত্রু ও বন্ধুদের' সংগে পরিচিত হ'তে পারবে। বিভিন্ন ঋতুতে নানাবিধ শাকসব্জী ফুল ইত্যাদি উৎপাদন করে শস্য বপন পঞ্জিকা তৈরী ক'রতে পারবে। বাগানটিকে সুসজ্জিত এবং সুপরিকল্পিত ক'রতে গিয়ে ওরা জ্যামিতি ও গণিত সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য 'আবিষ্কার' ক'রবে। বিভিন্ন রঙের পুষ্পের উদ্যান রচনা ক'রে রঙ সম্বন্ধে ধারণা ক'রে নিতে পারবে এবং সংগে সংগে সৌন্দর্যবোধ ও রুচির উন্মেষ সাধিত হবে। শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য ছোটরা কোদাল চালাতে পারবে না সত্য ; ওরা কর্ষিত জমিতে বীজ বপন, গাছের যত্ন করা, আগাছা উৎপাটন করা, লতানো গাছটির আকর্ষের জন্য খুঁটি পুঁতে দেওয়া ইত্যাদি কাজ সাগ্রহে ক'রবে। বাগানের গাছপালাগুলির ছবি আঁকতে ছোটরা ভালবাসবে। বাগানের কাজ ক'রতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা যদি কেঁচো, উইয়ের ঢিপি, পিঁপড়ার বাসা, শামুক, সুঁয়ো পোকা, প্রজাপতি এবং বেগুণ, ঢেঁড়স ইত্যাদি গাছের কাণ্ডের ভিতর পোকার সন্ধান পায় তবে শিক্ষক তাদের সেই সব জিনিষ, পোকামাকড় পর্যবেক্ষণ ক'রতে ব'লবেন এবং তাদের সম্বন্ধে সহজভাবে আলোচনা করবেন। শিশুদের মধ্যে যারা লিখতে পারে তারা লিখে রাখবে কোন জিনিষটি কোনদিন কোথায় কি অবস্থায় পেয়েছে।

সহরের বিদ্যালয়গুলিতে উদ্যান রচনার স্থান না থাকলে কাঠের বাক্সে বা মাটির সরাতে বা টবে বীজ বপনের পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(২) আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ, আষাঢ় শ্রাবণের আকাশভরা মেঘ এবং বর্ষণমুখর প্রকৃতি চারিদিকে ভেকের অবিশ্রান্ত আর্তনাদ, শরতের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ, দোয়েলের গান, শিউলির সুবাস, শীতের কুয়াসা, উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া প্রকৃতির এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করানোই ছোটদের স্কুলে আবহাওয়ার চার্ট তৈরী করার প্রধান উদ্দেশ্য। অত্যন্ত স্বাভাবিক আগ্রহের সংগে শিশুরা আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং সেইসংগে ঋতু পর্যবেক্ষণ করবে কারণ আবহাওয়ার দ্বারা তাদের খেলাধুলা ও অন্যান্য কাজ প্রভাবান্বিত হয়। বর্ষায় গ্রামের রাস্তা কর্দমাক্ত হ'য়ে যায়। খালবিল জলে পরিপূর্ণ হয়। বাড়ীর উঠানে জল জমলে শিশুরা তাতে লাফালাফি সুরু ক'রে দেয়। অত্যধিক রৌদ্রে অল্প ছুটাছুটিতেই তারা

পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। সকালে সূর্য আকাশের কোন স্থানে অবস্থান করে, কখনই বা মাথার উপর আসে আবার কখনই বা হেলে পড়ে, ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিমাপ, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, নক্ষত্রভরা আকাশ, কোনদিন ঝড় বইল, কোনদিন বৃষ্টি হ'ল,—এসব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী শিশুরা ছবি এঁকে বা কথায় লিখে প্রতিদিন লিপিবদ্ধ ক'রতে পারে। বৃষ্টির আভাস ছাতি এঁকে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ সূর্য এঁকে আবহাওয়ার চার্টে দেখাতে পারে। মাসের শেষে বিভিন্ন দিনের তালিকাগুলি একত্রিত ক'রে কয়দিন বৃষ্টি হোল, কয়দিন রোদ উঠল ইত্যাদি শিশুরা নির্ণয় ক'রে আবহাওয়া সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নিতে পারবে। সম্ভব হ'লে শিক্ষক একটি তাপমানযন্ত্র স্কুলে রাখবেন। সূর্যঘড়ি এবং বৃষ্টিমাপযন্ত্র শিক্ষক মহাশয় নিজেই তৈরী ক'রে নিতে পারবেন।

কার্ডবোর্ড বা
কাষ্ঠফলক।

আষাঢ়

এখানে বড় হরফে একটা বর্ষার কবিতা বা ছড়া লেখা থাকবে—(যেমন—)

এখানে একটা ছবি আঁকা থাকবে যাতে ধানের চারা, পাট গাছ, ব্যাঙ, জলে ভরা নদী ইত্যাদি অঙ্কিত থাকবে

"এমন বর্ষা জীবনে দেখিনি
থই থই করে জল
কুমড়া লতাটি শুকাইল চালে
ঝ'রে গেল কচি ফল
লঙ্কা বেগুন শশা ঝিঙা পুঁই
হয়ে গেল সব সারা
মরে গেল জলে বাবার লাগানো
কাঁঠালের দুটি চারা।"

(৩)

প্রকৃতি পঞ্জীর নমুনা

কি দেখেছে	ছবি	কে দেখেছে	কোন দিন দেখেছে	কোথায় দেখেছে
দোয়েল		রূপা	২-৫-৫৬	স্কুলের পাশের গাছটির ডালে
শিউলি ফুল		তুলসী	৮-৭-৫৬	বাড়ীর উঠানে
ধানের শীষ		হামিদ	৯-৭-৫৬	স্কুলের পাশের মাঠে
শুঁয়া পোকা		রেখা	৯-৭-৫৬	কুল গাছে

(কার্ডবোর্ডের উপর কাগজ, তাতে ঘর কাটা থাকবে, যে যখন যা দেখবে লিখে দিয়ে যাবে)

(৬) প্রকৃতি পাঠ, ছড়া ও কবিতা

শিশুরা কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি ক'রতে ভালবাসে। যে সকল কবিতা বা ছড়ায় প্রাকৃতিক তথ্য রয়েছে সেগুলি যদি ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে তবে যুগপৎ কবিতা বলার আনন্দ ও প্রাকৃতিক জ্ঞান আহরণ ক'রতে পারবে। চিত্রাংকণ সাহায্যে ছড়াগুলিকে আরও হৃদয়গ্রাহী করা যেতে পারে এবং পর্যবেক্ষণের সহায়তাও করা যেতে পারে। তাছাড়া ছেলে-মেয়েরা যেসব দ্রব্য সংগ্রহ ক'রবে বা পর্যবেক্ষণ করবে সেগুলি সম্বন্ধে গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি রচনা করবার জন্য শিক্ষক তাদের উৎসাহিত ক'রবেন। এ'ভাবে প্রকৃতিপাঠ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দিতে গিয়ে তিনি ছোটদের সৃজনাত্মক লেখার সুযোগ দিতে পারবেন। কয়েকটি ছড়ার ও কবিতার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল ঃ—

(১) "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ন'দে এলো বান"

(২) "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল"

(৩) "দিনের বেলায় ঝোপে ঝাড়ে আড়ালে গা ঢাকি
মাঝে মাঝে বনের মাঝে হুয়া হুয়া ডাকি
গাছের থেকে কৌশলেতে কাঁঠাল চুরি ক'রি
লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সটান সরে পড়ি।"

(৪) "গরমের কালে লিচু আম জাম জামরুল থরে থরে
বেল পেঁপে লেবু কলা আনারস আমার বাগানে ধরে।"

(৫) "এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে
সকাল বেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ধরে।"

(৪) ভ্রমণ ও প্রকৃতি পরিচয়

আগেই বলা হ'য়েছে মাঠঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিশুরা পরিচিত হয়। এই অভিজ্ঞতা শ্রেণীকক্ষে ছবি চার্টের সাহায্যে দেওয়ার চেষ্টা ক'রলেও জ্ঞান ও বাস্তবতার মধ্যে অনেকখানি অপূর্ণতা থেকে যায়। সেইজন্য শিশুদের মাঝে মাঝে ভ্রমণের সুযোগ দিতে হবে। সম্ভব হ'লে তাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে দলে বিভক্ত হ'য়ে ভ্রমণে বা'র হওয়া উচিত। যেমন, বিভিন্ন প্রকারের মাটি সংগ্রহ করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে সেদিন প্রধানতঃ মাটিই সংগ্রহ করতে শিশুদের ব'লতে হবে। যদি মাছধরা উদ্দেশ্য হয় তবে উপযুক্ত জাল, কাচের বোতল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে সেদিন বিশেষ ক'রে মাছধরার চেষ্টাই হবে। কোন জিনিষ কিভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রতে হয় তা' শিক্ষক মোটামুটিভাবে শিশুদের ব'লে দেবেন। ভ্রমণে বার হবার পূর্বে নিজেদের সুবিধার জন্য কয়েকটি নিয়ম ছোটরা নিজেরা ঠিক ক'রে নেবে এবং একজন দলপতি নির্বাচিত ক'রে নেবে। "না জিজ্ঞাসা ক'রে কারও ফলফুল পেড়ে নেব না", "ডালপালা নষ্ট করব না", "দলপতির কথামত চ'লব" ইত্যাদি। নিজেদের তৈরী নিয়মাবলী শিশুরা সানন্দে পালন ক'রবে।

পর্যটনের সময়ে ছেলেমেয়েরা গাছপালা, শস্যক্ষেত্র, ধানের জমি, বুনো গাছপালার উপনিবেশ লক্ষ্য ক'রবে। কি কি পাখী দেখল তা লিপিবদ্ধ ক'রবে, পাখীর পালক সংগ্রহ

ক'রবে। জীবজন্তুর পায়ের ছাপ দেখলে তা' এঁকে নিতে চেষ্টা ক'রবে। জীবজন্তু, পোকা-মাকড় কে কোথায় কিভাবে বাস করে তা' পর্যবেক্ষণ ক'রবে, তাদের বাসা বাঁধবার পদ্ধতি জানতে, বুঝতে চেষ্টা ক'রবে। এভাবে জীবজগতের সঙ্গে শিশুরা ক্রমশঃ পরিচিত হ'তে পারবে।

(৫) শিশুর আহরণী

শিশুদের সংগৃহীত দ্রব্যাদি শ্রেণীকক্ষের এক কোণায় সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখা হবে। যারা লিখতে জানে তারা প্রত্যেকটি দ্রব্যের গায়ে তারিখসহ লেবেল লাগিয়ে দেবে। নতুবা শিক্ষক নিজে লিখে দেবেন। শিক্ষক কি লিখলেন তা' জানবার জন্য শিশুদের আগ্রহ হবে এবং সেই সঙ্গে বর্ণের সহিত পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষাও জাগবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রকৃতিপাঠ সম্বন্ধে মামুলি পাঠদানের প্রয়োজন না থাকলেও সংগৃহীত দ্রব্যাদি ও পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষক আলোচনা ক'রবেন এবং সেই সম্বন্ধে নানারকমের গল্প ও ছড়া রচনা বা সংগ্রহ ক'রবেন এবং শিশুদের শোনাবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আলোচনা প্রসংগে কিছু ভূগোল, কিছু সাহিত্য ও ভাষা, কিছু পারিপার্শ্বিক ইতিহাসের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই এসে প'ড়বে। কারণ শিশু ভূগোল থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা ক'রে দেখে না এবং সাহিত্য হ'তে ইতিহাসকেও পৃথকভাবে উপলব্ধি করে না—জ্ঞান তার কাছে 'সমগ্র'ভাবেই আসে।

হাট বাজার বা মেলায় শিশুদের মাঝে মাঝে নিয়ে গেলে তারা পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে, বেচা-কেনা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন তো ক'রবেই উপরন্তু কি কি শাকসব্জী, জীবজন্তু বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে তা' দেখবার সুযোগ পাবে। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামের বা পল্লীর মানুষ, তাদের বিচিত্র পোষাক ইত্যাদি দেখবার অবকাশও মিলবে।

(৬) খেলার ছলে প্রকৃতি পরিচয়

বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ে আসবার পথে কোন চিত্তাকর্ষক দ্রব্য কুড়িয়ে পেলে সে জিনিষটি সে শ্রেণীকক্ষের নির্দিষ্ট স্থানটিতে রেখে দেবে, লেবেল লাগিয়ে দেবে—কখন কোথায় কি অবস্থায় পেয়েছে তা লিপিবন্ধ ক'রবে। এইখানে কয়েকটি গাছপালা, পশুপক্ষীর ছবির বই থাকলে শিশুরা তা' নাড়াচাড়া ক'রবে। অনেক তথ্য নিজেরাই আহরণ ক'রে নেবে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহকে জাগরূক রাখবার জন্য ও অনুসন্ধিৎসাকে বাড়াবার জন্য শিক্ষক মহাশয় নানাবিধ খেলার অবতারণা ক'রতে পারেন—যেমন বিভিন্ন প্রকারের পাতা সংগ্রহ ক'রে শ্রেণীকক্ষের একস্থানে সাজিয়ে রাখবেন—আর বলবেন "কোনটি কি গাছের পাতা বলতো? যে বেশী সংখ্যক পাতার নাম ঠিক ক'রে ব'লতে পারবে সে খেলায় জিতবে"।

(৭) জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ

গ্রামের সাত আট বছরের ছেলেমেয়েরাও ছিপ ফেলে মাছ ধরে, এ'ভাবে মাছ ধ'রতে গিয়ে তারা মাছের চলার ভঙ্গী ও মাছের দেহের গঠন সম্বন্ধে কিছু তথ্য স্বাভাবিকভাবেই 'আবিষ্কার' ক'রে ফেলে। সর্বক্ষেত্রে এ'ভাবে পুকুরে বা ডোবায় নিয়ে গিয়ে জলজ উদ্ভিদ, বা প্রাণী পর্যবেক্ষণ সম্ভব নাও হ'তে পারে। এ'ক্ষেত্রে কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তুত করা মন্দ নয়।

(৮) কৃত্রিম জলাশয়

একটা কাঁচের চওড়া মুখ বোতল বা বৈয়াম নিতে হবে। পাত্রটির তলায় কিছু বালি দিতে হবে। একটি জলজ উদ্ভিদ, নিয়ে তাকে ভাল ক'রে ধুয়ে ঐ বালির মধ্যে রোপণ ক'রে দিতে হবে। ঐ বালির উপর কয়েকটি পাথরের টুকরা দিতে হবে। ঐ পাথরের টুকরার ফাঁকে প্রয়োজনে মাছ লুকিয়ে থাকতে পারবে। এবারে পুকুরের পরিষ্কার জল অথবা কলের কয়েক ঘণ্টা ধ'রে রাখা জল আস্তে আস্তে বোতলের ভেতর ঢেলে দিতে হবে এবং প্রাণীগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে। এমন দুই প্রাণী একই সঙ্গে বোতলের মধ্যে রাখা উচিত নয় যারা

পরস্পর শত্রু। ব্যাঙাচি ও শামুক একসঙ্গে থাকতে পারে। সব পাত্রেই দুই একটা শামুক দিয়ে দেওয়া ভাল। কারণ শামুকেরা মাছ বা অন্য প্রাণীর ময়লা খায়। বোতল বা বৈয়ামের গায়ে লেবেল এঁটে লিখে রাখতে হবে কোনদিন কি কি প্রাণী বা উদ্ভিদ 'জলাশয়টিতে' ছাড়া হ'ল। এ' জীবগুলির পরিচর্যা ও খাবার যোগানো শিশুরাই ক'রবে। ঐ দায়িত্ব শিশুরা সানন্দে নেবে। ব্যাঙাচির ব্যাঙে রূপান্তর গ্রহণ, মশকের রূপান্তর, মাছের চলার ভংগী, তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য ইত্যাদি শিশুরা এই কৃত্রিম জলাশয়ের ভেতর দেখতে পারবে।
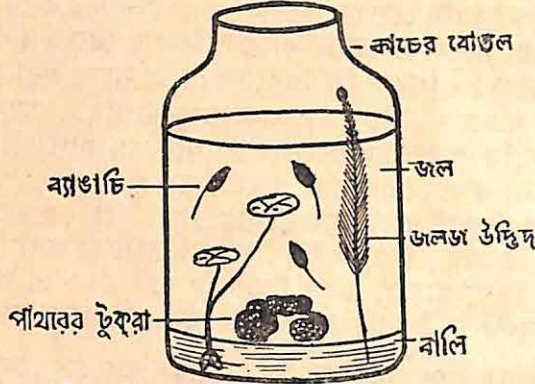
(৯) প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি কীট পতঙ্গের রূপান্তর

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বক থেকে বিশ্রী শুঁয়াপোকার উৎপত্তি, তার আবার গুটিতে পরিণতি এবং অবশেষে সুন্দর প্রজাপতিতে রূপান্তর—এ একটি প্রাকৃতিক বিস্ময়। প্রজাপতির জীবনের ইতিহাস বই থেকে মুখস্থ না করিয়ে এই বিচিত্র রূপান্তর দিনের পর দিন চোখের সামনে শিশুদের দেখতে দেওয়া উচিত। বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত কতদিনে হ'চ্ছে, শুঁয়োপোকা কি খায়, কেমন ক'রে খায়, কখন খাওয়া বন্ধ করে, কেমন ক'রে গুটিতে আবদ্ধ হ'য়ে যায়—এ' সব কিছুই শিশুরা চোখের সামনে দেখুক। প্রজাপতি ফড়িং ইত্যাদি পতঙ্গ ধ'রে এনে কার্ডবোর্ডের বাক্স (সাবানের বাক্স—বাতাস যাতায়াতের জন্য যাতে কয়েকটি ছিদ্র ক'রে দেওয়া হ'য়েছে) বা টিনের মধ্যে রাখতে পারে। Magnifying glass এর সাহায্যে সেগুলিকে শিশুরা পর্যবেক্ষণ ক'রতে পারে এবং তাদের দেহের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারে। পতঙ্গ ধরবার একটা ফাঁদের একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হোল।
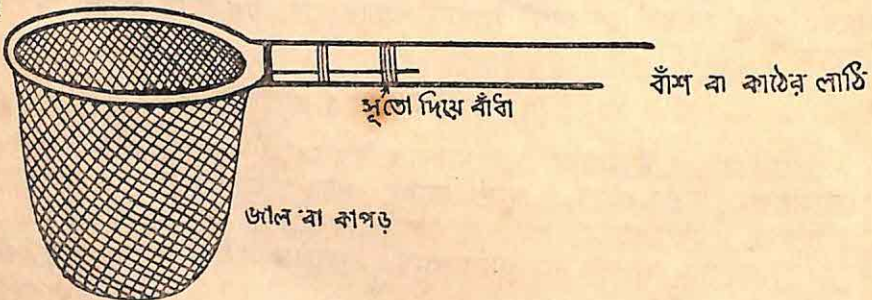
(১০) পক্ষী পর্যবেক্ষণ

জানালার পাশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ছোলা, মটর, ধান, রুটির টুকরো, কেঁচো, ফল ইত্যাদি বিভিন্ন খাবার ছড়িয়ে দিলে অনেক পাখী খাবার খেতে আসবে। কোনদিন কি পাখী এলো, কি খাবার খেয়ে গেলো, কতখানি খাবার খেলো, বিভিন্ন রকমের পাখীর ঠোঁট ও পায়ের গড়নের প্রভেদ, ডানার পালক দেখতে কিরকম, কেমন ক'রে উড়ে যায়, কিরকমের শব্দ করে, ডালের উপর কেমন ক'রে বসে ইত্যাদি পাখী সম্বন্ধীয় অনেককিছুই শিশুরা জেনে নিতে পারবে। মাটির পাত্রে সেখানে খানিকটা জল এনে রেখে দিলে সে জলে পাখীরা

স্নান ক'রবে, এবং শিশুরা পাখীর স্নান দেখতে পাবে। ৭।৮ বৎসরের ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন পাখীগুলি কোন খাবার খেয়ে গেলো তার একটা হিসাবও রাখতে পারবে। ঠোঁটের আগায় খড় কুটো নিয়ে কত ধৈর্যের সঙ্গে পাখীরা বাসা বাঁধে, কেন বাসা বাঁধে, সব সময় বাসা বাঁধার এত হিড়িক তো পড়ে না—এমনিতর অনেক কিছু জানবার সুযোগ ছোটদের দেওয়া যেতে পারে। .একটা খুঁটির উপর কাঠের বাক্স দিয়ে পায়রার খোপ ক'রে দিলে, পায়রা এসে বাসা বাঁধবে, শিশুরাও প্রতিদিন পায়রা দেখবার, তার স্বভাব জানবার সুযোগ পাবে।

(১১) গৃহপালিত পশু

ছাত্র-ছাত্রীদের কারও বাড়ীতে পোষা বিড়াল, কুকুর, খরগোস, পাখী ইত্যাদি থাকলে সেগুলি মাঝে মাঝে শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসতে শিশুদের বলা যেতে পারে। নিজেদের পোষা জীবজন্তুকে ওরা খুবই ভালবাসবে, তাদের যত্ন ক'রবে, সময়মত খাবার দেবে এবং প্রতিদিন চোখের সামনে দেখবে ব'লেই ঐ জীবগুলি সম্বন্ধে তাদের সম্যক ধারণা জন্মাবে। কয়েকটি চতুষ্পদ জীবজন্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হ'লে অনুরূপ জন্তুকে না দেখেও তার দেহাবয়ব ও তার গঠন ভাল বুঝতে পারবে। যেমন বিড়ালকে জানা হ'য়ে গেলে হয়ত বাঘের গল্প শুনে বাঘের আকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান ক'রতে পারবে বাঘ না দেখেও।

(১২) আহরণী পুস্তক
শিশুদের 'পাতার বই,'
'ফুলের বই', 'পালকের বই'

শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে শিশুরা নিজেদের 'পাতার বই', 'ঘাসের বই', 'ফুলের বই', 'গাছের বই', 'পালকের বই', 'পাখীর বই' ইত্যাদি তৈরী ক'রবে। ৭।৮ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের আহরণ করবার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী। যে সব জিনিষ তারা সংগ্রহ ক'রবে সেগুলি তারা সযত্নে রেখে দেবে। পাতা, ঘাস, ফুল ইত্যাদি দুটো ব্লটিং কাগজের মধ্যে রেখে ভারী জিনিষ দিয়ে চাপা দিলে ৬।৭ ঘণ্টা পরে দেখা যাবে তাদের জলীয় অংশ কাগজ শুষে নিয়েছে। এখন এই পাতা, ফুল ইত্যাদি নিজেদের খাতায় শিশুরা লাগিয়ে রাখতে পারে। এমনি ক'রে তারা 'ফুলের বই', 'পালকের বই' তৈরী ক'রতে পারবে।
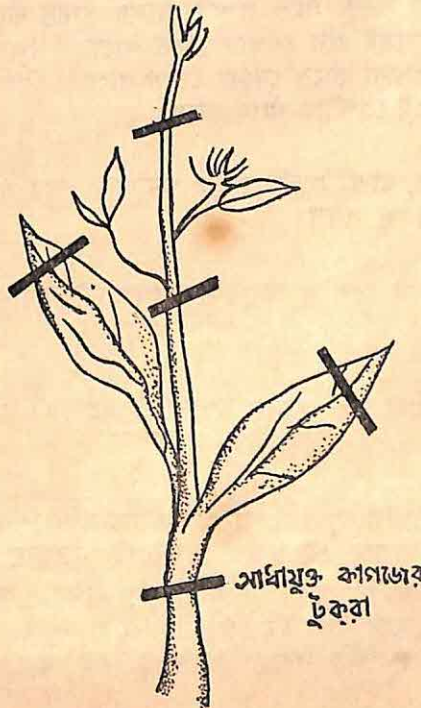
(১৩) প্রকৃতি পরিচয় ও ভাষা, সংখ্যা ও চিত্রকলার অভিজ্ঞতা

নিজেদের সংগৃহীত দ্রব্যাদির নামকরণ ও নাম লিখতে গিয়ে শিশুরা লিখন পঠনের ও নূতন নূতন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। বেগুনের ক্ষেতে কতটি সারি, এক এক সারিতে ৬টি ক'রে বেগুন গাছ থাকলে ১০টি সারিতে কয়টি বেগুন গাছ আছে, ক্রমবর্ধমান চারা গাছটি কত ইঞ্চি ক'রে বাড়ছে ইত্যাদি অঙ্ক সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যা সমাধান ক'রতে পারবে। গাছপালা, পশুপক্ষী, মেঘ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি আঁকতে গিয়ে অঙ্কনের অভ্যাস ক'রতে পারবে।

দশম অধ্যায়

(ক) নৃত্য সম্বলিত অঙ্গ সঞ্চালন

ভারতীয় নৃত্যকলা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য শিশুশিক্ষার ভেতর দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। শিশুকে সুষ্ঠুভঙ্গী, আত্মবিশ্বাস, সৌন্দর্যপ্রীতি, সুগঠিত স্বাস্থ্য অর্জন করতে সাহায্য করতে হবে এবং শিশুর শিল্পকলায় অনুরাগ জন্মিয়ে দিতে হবে।

নৃত্যকলা শিখবার প্রথম অবস্থায় অঙ্গভঙ্গী একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

প্রথম শ্রেণীতে নানারকম অঙ্গভঙ্গীর ভেতর দিয়ে ও নানারকম ছন্দ ও তালের সঙ্গে শরীরচর্চার অভ্যাস করতে হবে। পাহাড়ওঠা, অগ্নিশিখা, পাতা ঝরে পড়া ইত্যাদি জিনিষগুলো প্রকাশ করবার একটা সহজ ভঙ্গী তাদের আয়ত্ত করা চাই এবং ছন্দ ও তালের সঙ্গে শরীরচর্চার ভেতর দিয়েই এটা শেখান যেতে পারে। শিশুর পরিবেশ অনুযায়ী দু একটি সহজ লোকনৃত্যের ধারণা তাকে দেওয়া যেতে পারে। "সূর্যমামা", "হা-খে-না-খা" প্রভৃতি সহজ ব্রতচারী নাচ এই শ্রেণীতে স্থান পাবে।

এই বয়সে হরিণ, সিংহ, হাতী প্রভৃতি জন্তুর অনুকরণ করে তা ভাবে প্রকাশ করতে শিশু চেষ্টা করবে এবং তাতে আনন্দ পাবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতেও প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা শিশু সহজ ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করবে।

সহজ সাঁওতাল নাচ এবং এই বয়সের উপযোগী ব্রতচারী নাচ আরও দু একটা দেওয়া যেতে পারে।

ফসল কাটা, হোলি ইত্যাদি দু একটি উৎসবের নাচ যদি শিশুর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় তবে দেওয়া চলে। তবে এই দুই শ্রেণীতেই নৃত্যের বেশীর ভাগ কর্মসঙ্গীত (action song) ও শরীরচর্চার ভেতর দিয়ে সমাপ্ত হবে। আলাদা করে নাচ শেখাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশকে ছন্দ ও তালের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্বলিত করতে পারলেই এই বয়সের শিশুদের নৃত্যশিক্ষার গোড়াপত্তন হ'ল।

(খ) ছন্দ ও ছড়া

(ক) ভূমিকা

ছড়া বলতে আমরা বুঝি ছেলেভুলান ছড়া, ইংরেজীতে যাকে বলা হয়ে থাকে nursery rhymes. রবীন্দ্রনাথের মতে "ছড়াগুলিই শিশুসাহিত্য, তাহারা মানবমনে আপনি জন্মেছে। ছড়াগুলি ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং বৈচিত্র্যবশতঃই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করে আসছে। শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র ধরে রচিত হয় নি"। তিনি আরও বলেছেন "প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত—আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকাখুকুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি"।

সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে বসলে এই ছড়াগুলোর ভেতর যে উচ্চস্তরের সাহিত্যের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া কঠিন, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিশ্লেষণ করলে ভাবের পারস্পর্য, ভাষার সৌন্দর্য, ঘটনার ধারাবাহিকতা ইত্যাদি কিছুই ছড়াগুলোর ভেতর পাওয়া যাবে না। কবিতার বাঁধুনী যথেষ্ট অপটু হাতের একথা স্বীকার করতেই হবে। নিয়মের বন্ধন মেনে না চলার ফলে ছড়াগুলো অসংলগ্নতা দোষে দুষ্ট একথাও না মেনে উপায় নেই। প্রচলিত ছড়াগুলোর মধ্য দিয়ে যে ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায় তাকে শুধু অদ্ভুত বললে চলবে না, অসম্ভব ও অসঙ্গত বলেও মেনে নিতে হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে এসব অসম্ভব, অসঙ্গত, অর্থহীন ছড়াগুলো সহর থেকে একরকম বিলুপ্ত হয়ে গেলেও পল্লীগ্রামে এখনও কি ক'রে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলছে? তার উত্তরে আমরা বলতে পারি ছড়ার ভেতর দিয়ে পল্লীবহুল বাংলাদেশের যে স্বাভাবিক চিত্র ফুটে উঠেছে, পল্লীর কুটীরের যে সঙ্গীত অনুরণিত হয়ে উঠেছে, কৃত্রিম সহরের ছবির সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই বলেই ছড়ার ধারা আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একই খাতে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে বাংলার পল্লীগুলিতে।

"আয় আয় চাঁদা মামা টিপ দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কাল গরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টীপ দিয়ে যা।"

এখানে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো এবং কাল গরুর দুধের লোভে চাঁদা মামা ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও আরও বেশী সন্দেহ জাগে সহরে বসে চাঁদা মামার উপযুক্ত মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো এবং কাল গরুর দুধ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা।

(খ) ছড়ার পিছনে মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য

আগেই বলা হয়েছে শিশু মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরে ছড়াগুলো রচিত হয় নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিশু মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরে রচিত না হয়েও ছড়াগুলো চিরকাল শিশুদের মনোরঞ্জন করে আসছে। এই পরস্পরবিরোধী কথাটাই এখন বিচার্য বিষয়।

এই বিষয়ে বিচার করতে গেলে আমরা বলতে পারি যে রচনার সময় মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলো সম্মুখে ধরে রচিত হয়ে না থাকলেও যখন চিরকাল শিশুর মনোরঞ্জন করে আসছে তখন নিশ্চয়ই ছড়াগুলো রচনার পর থেকে মনোবিজ্ঞানের নিয়মগুলো মেনে আসছে। নয়তো শিশুর মনকে রঞ্জিত করছে কি ক'রে?

এখন দেখতে হবে কি কারণে অসঙ্গত, অসংলগ্ন ছড়াগুলো শিশুমনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়? মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত না হয়েও যদি ছড়াগুলো গভীরভাবে শিশুমন আলোড়িত করে থাকে, তবে বুঝতে হবে ছড়া রচনা খুব সহজ কথা নয়। ছড়ার ভেতর দিয়ে যে সহজ সরল সুরটি বেজে ওঠে, সেই সরল সুরটিকে আবিষ্কার করে ছড়ারচনা খুবই আয়াসসাধ্য। ছড়ার "যেমন তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। যেটি সর্বাপেক্ষা সরল, সেটি সর্বাপেক্ষা কঠিন"।

ছড়া রচনা করা কঠিন হোক আর নাই হোক এখন আলোচ্য বিষয় রচিত এবং প্রচলিত ছড়াগুলোর বৈশিষ্ট্য কি? কি কারণে চিরকাল ধরে এরা শিশুর মনোবীণায় মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হয়ে আসছে?

এর উত্তরে প্রথমেই বলা যায় অসংলগ্নতা শিশুমনের পরিচায়ক। সুসংলগ্নভাবে কোন কিছুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা শিশুমনের ধর্ম নয়। এজন্য অসংলগ্ন ছড়াগুলো চিরকাল শিশুমনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে আসছে।

দ্বিতীয়তঃ নিয়মবন্ধনহীন ছড়ার সঙ্গে শিশুমনের এক অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। শিশুমন নিয়ম মেনে চলতে পারে না বলেই নিয়মবন্ধনহীন ছড়ার ছবিগুলো অতি সহজে সে গ্রহণ করতে পারে এবং গ্রহণ করে অপরিসীম আনন্দলাভ করে।

তৃতীয়তঃ শিশুমন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। এই প্রখর কল্পনাশক্তির সাহায্যে অতি সহজেই তারা মনের মত ক'রে জিনিষ গড়ে নিতে পারে। সেজন্যই ছড়ায় ভোঁদড়ের নাচ, লাল গামছা পরিহিত টিয়ে পাখী, ক্ষীর নদী অথবা কাঁকাল বাঁকিয়ে সীতানাথের নাচ ইত্যাদি কোন চিত্রই শিশুমনের কাছে অদ্ভুত অথবা অসম্ভব নয়। কারণ "শিশু এখনও জগতে সম্ভাব্যতার শেষ সীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকে ফিরে আসেনি। সে বলে যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলই সম্ভব"।

চতুর্থতঃ শিশুমন অর্থলিপ্সু নয়। অর্থের জন্য তার জগতের কিছুই আসে যায় না। ছড়ার ছন্দের ঝঙ্কারই তার মনোবীণার তারে ঝঙ্কার তুলতে যথেষ্ট সমর্থ। সুতরাং বয়স্ক জগতে অর্থহীন হলেই যা বর্জনীয়, শিশু জগতে অর্থহীনতার জন্য তা বর্জনীয় নয়।

সর্বশেষে আমরা দেখতে পাই ছড়ার সুরের মাধুর্য শিশুমনকে গভীরভাবে অভিভূত করে ফেলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রচনার আগে ছড়াগুলো মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরে রচিত না হয়ে থাকলেও রচনার পর শিশু মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলো মেনেই চলেছে। এ কারণেই শিশুর মনোজগতে ছড়ার আধিপত্য।

(গ) শিশুর মানসিক বিকাশে ছড়ার প্রয়োজনীয়তা

ছড়াগুলো শিশুর মানসিক বিকাশে প্রয়োজনীয় কিনা—এ বিষয়ে বিচার করে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাই (১) ছড়ার ছন্দের ঝঙ্কার এবং ছত্রে ছত্রে মিল শিশুমনে অজ্ঞাতসারে সাহিত্যরসবোধ সৃষ্টি করে থাকে, (২) ছড়ার অদ্ভুত অসংলগ্ন ছবিগুলো শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশসাধনে সাহায্য করে, (৩) ছড়া আবৃত্তির দ্বারা শিশু আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে, (৪) স্মৃতিশক্তির উন্মেষ সাধিত হয়, (৫) বাক্‌শক্তি ও উচ্চারণের জড়তা কেটে যায়, (৬) ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দগুলো শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, (৭) দলগতভাবে আবৃত্তি অপেক্ষাকৃত ভীরু (nervous) ও লজ্জাশীল (shy) শিশুকে ভীরুতা ও লজ্জাশীলতা দূরীভূত করতে সাহায্য করে, (৮) ঘুমপাড়ানী অথবা অনুরূপ ছড়া আবৃত্তির সাহায্যে মা মাসীর অনুকরণে শিশু মা মাসীর স্থানে নিজকে কল্পনা ক'রে অভিনয় করে

থাকে—এভাবে ছড়া আবৃত্তির সাহায্যে শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি সন্তোষ লাভ করে এবং এর সাহায্যে মনের ভারসাম্য (mental balance) রক্ষিত হয়, (৯) সর্বোপরি ছড়া আবৃত্তিদ্বারা শিশু প্রচুর আনন্দলাভ করে থাকে।

সুতরাং শিশুর জগতে ছড়ার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে প্রধানতঃ ৪-৭ বৎসর বয়স্ক শিশুরাই ছড়াদ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও উপকৃত হয়ে থাকে। কারণ এ বয়সের শিশুরাই বেশী কল্পনাপ্রবণ।

(ঘ) ছড়ার শ্রেণীবিভাগ

ছেলেভুলান ছড়াগুলোকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

(১) ঘুমপাড়ানী ছড়া,

(২) মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের পরিচায়ক খোকাখুকুর স্তবরূপে রচিত ছড়া,

(৩) প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়া,

(৪) খেলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়া,

(৫) চিত্রবহুল কল্পনা উদ্দীপক ছড়া।

(১) মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ছে—এরকম শিশুর চিত্র বাংলাদেশে অতি সাধারণ।

"ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি মোদের বাড়ী এস
খাট নাই পালং নাই খোকার চোখে বস।"

এই ছড়াগুলো শিশুদের ঘুমপাড়াবার জন্য মা মাসীরা ব্যবহার করলেও মা মাসীদের মুখ থেকে শুনে শুনে খেলার ছলে ৪-৬ বৎসর বয়স্ক খুকুমণিরাও আবৃত্তি করে থাকে এবং নিজেকে মা মাসীর জায়গাতে কল্পনা করে অভিনয়ের ভেতর দিয়ে প্রচুর আনন্দলাভ করে থাকে।

(২) এই জাতীয় ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নব নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক শিশু দেবতার কত মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে"। বাস্তবিক নানাভাবে শিশু দেবতার স্তব করেও মাতৃহৃদয়ের আকাঙ্খা মিটতে চায় না।

"ধন ধন ধন
বাড়ীতে ফুলের বন"

অথবা

"খোকন আমাদের সোনা
সেকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেব দানা।" ইত্যাদি

এ জাতীয় ছড়াও সাধারণতঃ ৪—৬ বৎসর বয়স্ক শিশুরা মা মাসীর জায়গাতে নিজেকে কল্পনা করে অভিনয়ের ভঙ্গীতে আবৃত্তি করে থাকে।

(৩) প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়া বাংলার ঘরে ঘরে শিশুদের আবৃত্তি করতে শোনা যায়। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, শিশুমন গৃহের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে চাইছে। সরল বিশ্বাসে সে তখন মনের ভাব প্রকাশ করছে—

"লেবু পাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি থেমে যা"

এ জাতীয় ছড়া সাধারণতঃ ৫—৮।৯ বৎসর বয়স্ক শিশুরা আবৃত্তি করে থাকে।

(৪) খেলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়াও বাংলার গ্রামে কম প্রচলিত নয়। এরকম ছড়াগুলো নিতান্তই অর্থহীন। তবুও শব্দবিন্যাস ও সুরের ঝঙ্কার এবং তার সঙ্গে খেলার আনন্দ শিশুমনে জাগিয়ে তোলে অদ্ভুত প্রেরণা সাধারণতঃ দেখা যায় কয়েকটি খেলার সাথী শিশু একসঙ্গে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। তাদেরই ভেতর পরিচালনায় সমর্থ কোন শিশু ছড়ার প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হাঁটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে এবং আবৃত্তি করে চলেছে—

"আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে" ইত্যাদি

এ জাতীয় ছড়ার সঙ্গে খেলার আনন্দ উপভোগ করে থাকে সাধারণতঃ ৬—৮।৯ বৎসর বয়স্ক শিশুরা।

(৫) চিত্রবহুল কল্পনা উদ্দীপক ছড়াগুলো সাধারণতঃ ৫—৭।৮ বৎসর বয়স্ক শিশুরা আবৃত্তি করে থাকে। চিত্র যতই অদ্ভুত হোক শিশুমনের কল্পনাপ্রবণতা অতি সহজেই কোন কিছু সৃজন করতে সক্ষম। তার কল্পনা রচিত সৃষ্টিগুলোই ক্রমশঃ তার ভাবের অভিব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকে। এ জাতীয় ছড়ার চিত্রগুলোকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (ক) অদ্ভুত, অসম্ভব ছবি (খ) বাঙগালী গৃহের সজীব ছবি (গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি।

(ক) "টিয়ের মার বিয়ে
লাল গামছা দিয়ে" ইত্যাদি

পরিণত মন নিয়ে দেখতে গেলে টিয়ের মার বিয়ের নিহিত অর্থই হল একটি বিধবা বিয়ের আসর এবং দেখা যায় বিয়ের জন্য টিয়ে পাখী লাল গামছায় সজ্জিতা। শিশুমন যুক্তিতর্ক দিয়ে জানতে চাইবে না টিয়ে সমাজে বিধবা বিয়ে প্রচলিত আছে কি না অথবা টিয়ে সমাজে গামছা পরবার রীতি প্রচলিত আছে কিনা। শিশুমন নিঃসন্দেহে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে মনে মনে ছবি এঁকে চলে।

(খ) আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ী সংসার কাঁদিয়ে।
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে,
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে।
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে।

বাঙগালী ঘরের একটি সজীব করুণ ছবি—মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠানো। শিশুবেলা থেকে মা বাবা যাকে স্নেহের আঁচলের আড়ালে আড়ালে মানুষ করে তুলছিলেন কাল তার বিয়ে। মা বাবার স্নেহের বাঁধন কাটিয়ে তাকে দূরে চলে যেতে হবে। তাই মা বাবা কিছুতেই অশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না। এতো আমাদের বাঙগালীর হৃদয়ের চিরন্তন বেদনার ছবি।

(গ) "আয় চাঁদ আয়
বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে
চাঁপা গাছের ওপর দিয়ে
দীঘির জলে সাঁতার দিয়ে
আয় চাঁদ আয়।"

বাংলার পল্লীতে লালিত পালিত শিশুর কাছে বাঁশ বনের দৃশ্য, চাঁপা গাছের আকৃতি অথবা দীঘির জলের গভীরতা মনশ্চক্ষুতে দেখবার প্রয়োজন হয় না।

মোটের ওপর ছড়ার শ্রেণীবিভাগ করে আমরা নির্দিষ্ট কোন ছড়াকে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তই করি না কেন প্রত্যেকটি ছড়াই শিশুর মানসিক বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে মেঘের সঙেগ তুলনা করে বলেছেন "জড়জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙখল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশুশস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা বৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।"

(ঙ) ছড়া শিক্ষা পদ্ধতি

ছেলে ভুলান ছড়া শিশুর প্রথম কাব্য—৫—৭।৮ বৎসর বয়স্ক শিশুদের কাছে ছড়ার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে এইজন্য যে ছড়ার ভেতর যেন শিশুমনের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। ছড়াগুলো শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে ব'লে শিশুর পঠনক্রিয়া সুরু হবার আগের থেকেই ছড়া শিক্ষা সুরু হওয়া প্রয়োজন। ছড়াগুলো বিশেষভাবে মৌখিক পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ শুনে শুনে শেখার পদ্ধতিটাই শিশুর স্বভাবসম্মত পদ্ধতি। শিশু প্রথম ভাষা আয়ত্ত করে শুনেই। তাছাড়া মৌখিকভাবে ছড়া শিক্ষার ভেতর রয়েছে শোনা এবং বলা। এর ভেতর দিয়েই ছোট শিশুর আত্মপ্রকাশের ভঙগী আয়ত্ত হয়। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে বাক্‌শক্তি ও উচ্চারণের জড়তা কেটে যায় ছড়া আবৃত্তির ভিতর দিয়ে। এসব কারণে ছড়াগুলো মুখে মুখে শেখানই প্রশস্ত উপায় অর্থাৎ শিক্ষককেও বলতে হবে বারবার এবং শিশুদের দিয়ে বলাতেও হবে বার বার। এইভাবে ছড়া মুখস্হ করাতে হবে।

তবে প্রচলিত মুখস্হ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। কেননা সাধারণতঃ দেখা যায় বিদ্যালয়ে কবিতা মুখস্হ করান হয় একই ছত্র বার বার উচ্চারণ করে। তাতে ছন্দের তাল কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে, অর্থবোধও হয় না। এ কারণে প্রচলিত মুখস্হ পদ্ধতিতে মুখস্হ ব্যাপারে শক্তি ও সময় যতটা অপচয় হয়, সুফল ততটা পাওয়া যায় না। মুখস্হ করবার পদ্ধতি হওয়া উচিত সমস্ত ছড়াটা বার বার উচ্চারণ করে প্রথমে মোটামুটি তার ভাব গ্রহণ, তারপর মুখস্হ করা। মুখস্হ বিষয়ে এভাবে শিশুকে পরিচালনা করলে শিশুর দিক থেকে সুফল পাবার সম্ভাবনা। ছড়া বড় হলে ভাব গ্রহণের পর অর্থবোধক অংশে বিভক্ত করে মুখস্হ করান যেতে পারে। আর আকারে ছোট হলে বিভক্ত করবার প্রয়োজন হয় না।

ছড়ার পাঠদান মৌখিক হলেও শিক্ষকের দিক থেকে নির্দিষ্ট ছড়ার জন্য রঙগীন চিত্রযুক্ত চার্ট শ্রেণীতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তার কারণ রঙগীন চিত্র শিশুমনকে যত সহজে আকৃষ্ট করে এমন আর কিছুতে নয়।

এছাড়া কল্পনার চোখে মনে মনে যে ছবি সে এঁকে চলেছে, চোখের সামনে নানারঙেগ প্রতিফলিত তারই বাস্তবরূপে সহজে ছড়ার ভাবগ্রহণে তাকে সাহায্য করে।

ছড়ার পাঠদান শ্রেণীতে সমবেতভাবে হওয়া প্রয়োজন। তাতে ছন্দের ঝঙকার ও সুরের মাধুর্য বেশী উপলব্ধি করা যায়। এবং অপেক্ষাকৃত ভীরু (nervous) এবং লজ্জাশীল (shy) শিশুরা ভীরুতা ও লজ্জাশীলতা কাটিয়ে উঠবার সুযোগ পায়। অবশ্য সমবেতভাবে হলেও শিক্ষকের তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ব্যক্তিগত উচ্চারণভঙগী ও মনোযোগিতার উপর।

মোটের উপর শিশু উপযোগী ছড়ার মধ্য দিয়েই হবে শিশুর সাহিত্যের সঙেগ প্রথম পরিচয় এবং ছড়ার মধ্য দিয়েই প্রথম জন্মাবে সাহিত্যের রসবোধ।

(চ) ছড়ার নমুনা তালিকা

(১)

ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি
মোদের বাড়ী এস,
মেজ নেই মাদুর নেই
খোকার চোখে বস।

বাটা ভরে পান দেব
গাল ভরে খেও
খিড়কীদুয়োর খুলে দেব
ফুড়ুৎ করে যেও।

(২)

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।।
ধান ফুরুল, পান ফুরুল
এখন উপায় কি?
আর কতদিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।।

(৩)

কাঁদুনে মাসী কাঁদুনে মাসী
নিমতলাতে বাসা
ছেলে কাঁদবে বলে তুমি
মনে করেছ আশা
শোলা ডোবে পাথর ভাসে
কাঁদুনে ছেলে ফিক্ করে হাসে।

(৪)

খোকা এল বেড়িয়ে
দুধ দাওগো জুড়িয়ে।
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন খ্যাপ্ত।।
খোকা যাবেন নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।।

(৫)

আয় জল ঝেঁপে
মুড়ি দেব মেপে
কচুর পাতা নল
ঝেঁপে আয় জল।

(৬)

আয় রোদ্দুর হেনে।
ছাগল দেব টেনে।
সূর্যির মা বুড়ি।
কাঠ কুড়ুতে গেলি।।
ক্ষখানা কাপড় পেলি।
ক' বৌকে দিলি।।
আপনি মরিস্ জাড়ে।
কলাগাছের আড়ে।।
কলা পড়ে টুপটাপ।
বুড়ি খায় গুপ্‌গাপ।।

(৭)

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি।
চামের কাটা মজুমদার।।
ধেয়ে এল দামোদর।
দামোদরের হাঁড়ি কুঁড়ি।।
দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা,
ভাত খাওগে দুপুরবেলা।।
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁছি।।
কোদাল হল ভোঁতা।
খা কামারের মাথা।।

(৮)

আয়রে আয় টীয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে।।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা।।

(৯)

খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ী
সঙ্গে যাবে কে।
বাড়ীতে আছে কেলো ভুলো
কোমর বেঁধেছে।।
কেলোর মুখে লণ্ঠন
ভুলোর মুখে লাঠি।
পাল্কী করে বউ আনবে
খোকন পরিপাটি।

(১০)

"ওপারেতে কাল রঙ্‌
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ ঝম্‌
এপারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে"
"এ মাসটা থাক দিদি কেঁদে কঁকিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে"
"হাড় হল ভাজা, ভাজা, মাস হল দড়ি
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

(১১)

ও পাড়ার ময়রা বুড়ো।
রথ করেছে তের চূড়ো।।
তোরা রথ দেখতে যা।
তোদের হলুদমাখা গা।।
আমরা পয়সা কোথায় পাব।
আমরা উল্টোরথে যাব।।

(১২)

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূর্যি গেল পাটে।
খুকু গেছে জল আনতে
পদ্মদীঘির ঘাটে।।

পদ্মদীঘির কাল জলে
হরেক রকম ফুল।
হেঁটোর নীচে দুলছে খুকুর
গোছাভরা চুল।।

বৃষ্টি এলে ভিজবে সোনা
চুল শুকান ভার।
জল আনতে খুকুমণি
যায় না যেন আর।।

দ্রষ্টব্য।—খুকুমণির ছড়া—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সিটি বুক সোসাইটি।

(গ) সঙ্গীত

ভূমিকা

শিল্পের মধ্যে ললিত তথা চারুকলার স্থানই হল প্রধান। চারুকলার প্রকাশ, চিত্র, ভাস্কর্য ও সঙ্গীত নিয়ে পরিপূর্ণ। এ তিনের ভাব সৌন্দর্যের তুলনা নাই। কিন্তু তাহলেও শিল্পবিদ্‌রা সঙ্গীতকেই শ্রেষ্ঠ কলা বলেছেন।

সঙ্গীত কি? সঙ্গীত বলতে বুঝায়, গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয়—অর্থাৎ আদর্শ সঙ্গীত হবে গান বাজনা ও নাচের একত্র সমাবেশ।

সঙ্গীত যে কেবল কলার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ তা নয়। মানুষের জীবনেও এর স্থান অতি উচ্চে এবং মানব শিক্ষার সৃষ্টি হতে বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারেও সঙ্গীত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক হাতে বীণা ও আর এক হাতে পুস্তক। আর্য ঋষির কল্পিত বাগ্‌দেবীর এই মূর্তিতেই প্রকাশ পাচ্ছে শিক্ষায় সঙ্গীতের স্থান কোথায়।

বুনিয়াদী শিক্ষায় সঙ্গীত

বুনিয়াদী শিক্ষায় সঙ্গীতকে একটি বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কেন? প্রত্যেক জাতি বা দেশ বেঁচে থাকে তার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে; বেঁচে থাকে তার কাব্য-সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে। ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে রক্ষিত হ'য়ে চলে আসছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার মোহে পড়ে আমরা সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ভুলে যাচ্ছিলাম। তাই ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৃত্যুও আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধনা কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে ভারতীয় কৃষ্টির নির্বাণোন্মুখ দীপশিখাকে প্রজ্বলিত করার অনির্বাণ সাধনাই করেছেন সারাজীবন। বাপুজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পিছনেও রয়েছে সেই একই আদর্শ। তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় সঙ্গীতকে একটি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষায় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব

বর্তমান যুগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু-শিক্ষার যুগ বলা হয় অর্থাৎ শিক্ষার ব্যাপারে শিশুই আজ মুখ্য বিষয়বস্তু (নহে)। বর্তমান জগতের শিক্ষাবিদগণ শিশু মনোবিজ্ঞানে বহু গবেষণার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হবে আনন্দের মধ্য দিয়ে, খেলার মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে। শিশুর গৃহ ও বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও পার্থক্য ভেঙেগ দিতে হবে। তার পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তুলতে হবে।

শিক্ষাদর্শনের এই নীতির দিকে লক্ষ্য রেখেই গান্ধীজি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উৎসবের প্রবর্তন করেন। এই উৎসবগুলির প্রাণই হল সঙ্গীত। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু এইসব উৎসব উদযাপন করতে গিয়ে শিখবে সেই সব উৎসবের উপযোগী নানা সঙ্গীত। শিশু-কেন্দ্রিক নূতন শিক্ষায়তনগুলিতে শিশু শিখবে অজস্র গান নানা ধরণের গান, সে সকল গানের মধ্য দিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিণতি হবে এবং সে সকল গানের মধ্যে সে খুঁজে পাবে অবিমিশ্র হাসি ও আনন্দের উৎস।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গীতকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে ভাগ করতে পারি:—

(১) ভজন বা ধর্মসঙ্গীত,

(২) জাতীয় সঙ্গীত বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত,

(৩) ঋতু সঙ্গীত,

(৪) কর্ম সঙ্গীত,
(৫) শিশুমনের উপযুক্ত আদর্শ আছে যেসব গানে,
(৬) খেলা হাসি ও আনন্দের গান।

সঙ্গীত কিভাবে শিশুর জীবনকে প্রভাবান্বিত করে

(১) সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মসূচীতে পরিবর্তন আনে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দময় করে তোলে। শিশুরা পায় নির্মল নির্দোষ আনন্দ, সে আনন্দের রেশ চলে তার সারা জীবন ধরে। নৃত্য গীত ও বাদ্যের প্রতি সকল শিশুরই একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ও আকর্ষণ থাকে। মনের এই দিকটি বিকশিত না হলে কোন মানুষের শিক্ষাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা হতে পারে না।

(২) শিশুর চরিত্রের উপর ও সঙ্গীতের প্রভাব বড় কম নয়। সুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত শিশুকে মার্জিত রুচি সম্পন্ন করে তোলে।

(৩) শিশুর মানসিক শক্তি বিকাশেও সঙ্গীতের প্রভাব কিছু কম নয়। প্রথম অবস্থায় শিশুরা যখন পড়তে শেখে না, তখন তারা গান শেখে শুনে শুনে—এতে তাদের স্মৃতিশক্তি বাড়ে। শিশুরা যখন পড়তে শিখে যায়, তখনও সঙ্গীত পড়তে গিয়ে বাড়ে তার নিরীক্ষণ শক্তি, দ্রুত পঠন ক্ষমতা ও ভাবপ্রকাশ ক্ষমতা। গানের সুরের উত্থান পতন লক্ষ্য করতে গিয়ে বৃদ্ধি পায় তাদের বিচার শক্তি ও ধারণাশক্তি এবং মনঃসংযোগের ক্ষমতা।

(৪) শিশুরা কেবল একক সঙ্গীত শিক্ষা করে না—তারা শেখে সমবেতভাবে গান করতে। সমবেতভাবে গান শিখতে গিয়ে তারা একই সঙ্গীত পরিচালকের নির্দেশ মেনে চলতে শিখে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুরের প্রতি লক্ষ্য রেখে গান করতে শেখে। এতে তাদের একত্ববোধ জাগে। তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখে।

(৫) শিশুর শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশেই আজ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুদের ভজন গান করতে করতে, শুধু যে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠবে তা নয়, প্রাচীন ভারতের ভজনের সঙ্গে তারা পরিচিত হবে। জানবে তারা ভারতীয় সঙ্গীতের গৌরবময় ইতিহাসকে।

(৬) বুনিয়াদী শিক্ষা কর্ম-কেন্দ্রিক। স্বভাব-চঞ্চল শিশুরা স্থির হয়ে বসে পাঠ অভ্যাস করার চাইতে কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করতেই ভালবাসে। তাদের এই কর্মের আনন্দ দ্বিগুণিত হয় যখন তারা সমবেতভাবে গান গেয়ে গেয়ে কাজ করে।

(৭) জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধও জাগ্রত করা যায় এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিশুদের মনে দেশাত্মবোধ জাগানো, দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে তোলা। সঙ্গীত সেই দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়।

সঙ্গীত শিক্ষার লক্ষ্য

(১) বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল শিশুর শ্রবণশক্তিকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যেন তাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণা জন্মে এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের প্রতি তাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

(২) দ্বিতীয়তঃ শিশুর কণ্ঠস্বরকে এমনভাবে চালিত করতে হবে যেন সঙ্গীতের সুর, তাল লয় বজায় থাকে।

(৩) সঙ্গীত শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হবে যে, যখন শিশু বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করবে, তখন তারা যেন সঙ্গীতের ভাব গ্রহণ করতে পারে।

(৪) সঙ্গীত শিক্ষায় সকলের চাইতে বড় লক্ষ্য হল, শিশুর আনুভূতিক বিকাশকে সাহায্য করা। দৈহিক, মানসিক, আনুভূতিক, সামাজিক ও চারিত্রিক—এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

সঙ্গীত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর

শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সঙ্গীত শিক্ষার ও বিভিন্ন স্তর হওয়া উচিত। শিশুর জীবন বিকাশের পথে আমরা পাই শিশুর শৈশব (অর্থাৎ Infancy) ৫ হতে ৭ বৎসর পর্যন্ত। শিশুর বাল্য (Boyhood) ৭ হতে ১১ বৎসর পর্যন্ত এবং শিশুর কৈশোরকে (Adolescence) ১১ বৎসর হতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত। সঙ্গীতকেও শিশুর মানসিক বিকাশ ও শক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়—অর্থাৎ একেবারে শিশুদের জন্য অতি সহজ সরল গান বালকদের জন্য আরও একটু কঠিন এবং কিশোরদের জন্য আরও শক্ত সঙ্গীত নির্বাচন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক বৈশিষ্টের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ শিশুর যে গান ভাল লাগবে কিশোর সে গানে আনন্দ পাবে না। যেমন শিশু পছন্দ করে সহজ সরল কর্ম সঙ্গীত, প্রাকৃতিক সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ও মজার গান। কিন্তু কৈশোরে শিশু হয়ে উঠে ভাববিলাসী ও বীরপূজারী তখন তারা চায় জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত—যে সঙ্গীতের তালে তালে তাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়ে উঠবে। ছোট শিশুদের উপযুক্ত আদর্শ তাদের উপযুক্ত সরল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করলে তাদের চারিত্রিক বিকাশের সহায়তা হয়। কিন্তু তাদের বোধশক্তির অনধিগম্য উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতও তাদের প্রাণে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তোলে না।

বিদ্যালয়ের সঙ্গীত নির্বাচনে শিশুর মানসিক শক্তি ও বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে সর্বপ্রথমে। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে শিশুর শক্তি কতখানি এবং কতটুকু সে গ্রহণ করতে পারে। আমাদের আরও জানা দরকার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা কোন্ ধরণের সঙ্গীত কতখানি শিখবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমাদের লক্ষ্য হবে যেন শিশুরা সমবেতভাবে পরস্পর কণ্ঠ মিলিয়ে গান করতে পারে। তারা সাধারণ সহজ ভজন, লোক-সঙ্গীত, কর্ম সঙ্গীত, প্রাকৃতিক সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, নিছক হাসি খেলা ও আনন্দের গান শিখবে। শিশুদের সঙ্গীত নির্বাচনে আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যেন গানের ছন্দ থাকে অধিকাংশ শব্দ যেন তাদের জানা হয়, একই শব্দ যেন কয়েকবার থাকে, ভাবও যেন মোটামুটি তারা বুঝতে পারে এবং গানের সুরও যেন তাদের পক্ষে খুব কঠিন বা জটিল না হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষকের শিশুদের সঙ্গীত নির্বাচনের আগেই তার নিজস্ব পরিকল্পনা ও সঙ্গীত সংগ্রহ থাকা দরকার। তাঁকে আগেই ভেবে স্হির করে নিতে হবে, সারা বৎসরে কোন্ শ্রেণীতে কোন্ প্রকারের গান কতগুলি শেখাবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী কতগুলি গানের তালিকা এই পুস্তিকায় দেওয়া হল।

সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতি

·শ্রেণীতে সঙ্গীত শিক্ষা ২০।৩০ মিনিটের বেশী একসঙ্গে করা উচিত নয় কারণ শিশুরা এর চাইতে বেশীক্ষণ একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারে না। শিক্ষক গানের কথাগুলি লিখে আনতে পারেন বা বোর্ডে লিখে দিতে পারেন।

এইবার গান আরম্ভ করতে হবে। আরম্ভের জন্য এক স্তবকই যথেষ্ট। কিন্তু শিশুরা পুরা গানটির সৌন্দর্য ও মাধুর্য যাতে উপলব্ধি করতে পারে তজ্জন্য সমগ্র গানটি তাদের একবার শোনান দরকার হবে। এর পর শিক্ষক একটি ছত্র গাইবেন—শিশুরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গান করবে। শিশুরা স্বভাবতঃই সুরগ্রাহী। শিশুদের উপযুক্ত গান সমবেতভাবে তিন চারবার করার পরে অধিকাংশ শিশুই আপনা হতেই গানের সুরটি শিখে নেবে।

সমস্ত গানটি যখন চলতে থাকবে শিক্ষককে তখন তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে কোন্ ছেলে গান করছে, কোন্ ছেলে করছে না এবং কেন করছে না। কোন ত্রুটির জন্য না গাইলে সেই ত্রুটি খুব যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে সংশোধন করে দিতে হবে। গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজনাও চলতে পারে। যারা অত্যন্ত বেসুরা বা অত্যধিক জোরে গান করবে তাদের থামিয়ে সকলের সঙ্গ ধরিয়ে দিতে হবে। শিশুদের সঙ্গীতের তাল রক্ষার জন্য ১, ২, ৩ বলে আরম্ভ করাতে হবে এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের মত তারাও হাতে তালি দিয়ে তাল রাখতে শিখবে। সাধারণতঃ গানের বই বা খাতা ব্যবহার করা হবে না, কারণ তাতে মনোযোগ ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা।

সঙ্গীত শেখাতে গিয়ে আর একটি জিনিষ মনে রাখতে হবে। সঙ্গীত শেখাতে হবে বলে যে কেহ যেন সঙ্গীত শেখাতে চেষ্টা না করেন। সঙ্গীত শিক্ষক যদি নিজে ভাল গান করতে না পারেন, তাহলে তিনি গাঁয়ের সুগায়ক যাঁরা তাঁদের সাহায্য নেবেন। শিশুদের সামনে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের নমুনাই ধরতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় সঙ্গীত শিক্ষক নিজে খুব সুগায়ক, কিংবা ভাল গান জানেন। কিন্তু তাঁর কাছে গান শিখেও শিশুরা ভাল গাইতে শেখে না। এর পিছনে আছে কতকগুলি কারণ—(১) প্রথমতঃ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হয়তো অত্যন্ত বেশী—শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারলেন না কিংবা শিশুরা তাঁকে মেনে চলে এমন ব্যক্তিত্বও তাঁর নাই। অথবা গানগুলি হয়তো শিশু-চিত্তাকর্ষক নয়। শিক্ষক মহাশয় যদি গানের ক্লাশটিকে সরস এবং লোভনীয় করে না তুলতে পারেন, তখন তার শ্রেণীতে অযথা গোলমালের সৃষ্টি হয়। শিশুদের কণ্ঠস্বরের কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে হয় তো একই দিনে সঙ্গীতের দুটি ঘণ্টা পর পর রয়েছে। এমন ক্ষেত্রেও মোটে সঙ্গীত শিক্ষা হয় না। সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টা সঙ্গীতের জন্য না রেখে দুদিন আধ ঘণ্টা করে রাখলে অনেক বেশী কাজ হয়।

(৩) তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশুরা খুব বেশী চীৎকার করে গান করে। কিন্তু এই প্রকার গান সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে হবে। জোরাল কণ্ঠস্বরই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের মাপকাঠি নয়। চীৎকার করে গান গাইতে গেলে শিশুদের গানে ভাব কিংবা তালও রক্ষিত হয় না। সেজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে ছোটবেলায় কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হলেও পরিণত বয়সে সেটা আর থাকে না।

(৪) অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষক মহোদয় সর্বক্ষণই শিশুদের সঙ্গে গান করছেন, ফলে শিশুরা স্বাধীনভাবে গান করতে শেখে না এবং একলা গান করতেও পারে না।

(৫) সঙ্গীতের সঙ্গে সকল সময়ে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করলে শিশুরা এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে তারা যন্ত্র ছাড়া গান গাইতে পারে না এবং বাজনা ছাড়া গাইতে গেলেই তাদের সুর কেটে যায়।

(৬) শিশুদের ভাল গান গাইতে না পারার একটি বিশিষ্ট কারণ হল শিক্ষকের অযোগ্যতা বা সহানুভূতির অভাব। শিক্ষক হয় তো সুগায়ক কিংবা দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ কিন্তু উপযুক্ত পদ্ধতি জানা না থাকায়, কিংবা ধৈর্য ও শিশুদের প্রতি সহানুভূতির অভাবে শিশুদের সামান্য ভুল ত্রুটিতে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন। ঐ সকল ক্ষেত্রে শিশুরাও তাঁর কাছে গান শিখে আনন্দ পায় না সুতরাং তারা ভাল গান করতেও শেখে না। শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গীতে দখল থাকবে সন্দেহ নাই কিন্তু দক্ষতার অপেক্ষাও তাঁর বেশী থাকা প্রয়োজন সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ, নিষ্ঠা ও ধৈর্য এবং শিশুদের ভালবাসবার মত প্রাণ। যত খানি অনুরাগ আগ্রহ ও দরদ দিয়ে তিনি গান শেখাবেন ততখানি প্রাণ দিয়েই শিশুরা শিখবে।

১। ধর্ম সঙ্গীত

(১) তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে।
(২) রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
(৩) তুমি যে গো সাথে সাথে।
(৪) সকলেরই প্রভু তুমি।
(৫) ছোট শিশু মোরা।
(৬) ভাইবোনে মিলে।
(৭) বল দেখি ভাই এমন করে।

২। জাতীয় সঙ্গীত

(১) জন-গন-মন (প্রথম স্তবক)।
(২) ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল (প্রথম স্তবক)।
(৩) বল বল বল সবে (প্রথম স্তবক)।
(৪) হও ধরমেতে ধীর।
(৫) বাংলার মাটি বাংলার জল।

৩। ঋতু সঙ্গীত

(১) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে।
(২) আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ।
(৩) ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল।
(৪) ফাগুন লেগেছে বনে বনে।
(৫) ফাগুনের নবীন আনন্দে।
(৬) পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে।
(৭) শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন।
(৮) বাদল বাউল বাজায়।
(৯) বাদল ধারা হল সারা।
(১০) শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।
(১১) আমি পথ ভোলা এক পথিক।
(১২) পথিক মেঘের দল।
(১৩) সহসা ডাল পালা তোর।
(১৪) ওরে বকুল ওরে পারুল।
(১৫) আজ ধানের ক্ষেতে।

৪। কর্ম সঙ্গীত

(১) আমরা চাষ করি আনন্দে।
(২) চল কোদাল চালাই।
(৩) নে চষে নে চষে নে চষে ভূঁই।
(৪) "আয়রে মোরা ফসল কাটি।"
(৫) চল ভাই যাই জল আনি যাই।
(৬) আর রোদ কোথাও নাই চল বাগানেতে যাই।

৫। শিশুদের উপযুক্ত আদর্শ

(১) আমরা শিশুর দল।
(২) আমি তাই ভাবি বসে।
(৩) ছোট একটি কৃষক আশ্রম।
(৪) বেঁটে খাটো থাকব না কো।
(৫) গণক ঠাকুর গণক ঠাকুর।
(৬) ঐ শোন ডাকছে কোকিল।

৬। খেলা, হাসি, মজা, ও আনন্দের গান

(১) হাসি মোরা হাসি।
(২) খেলা করি খেলা।
(৩) চল চল খেলি ফুটবল।
(৪) লাল রঙা ঘুড়ি।
(৫) একদিন জিভ বলে শোন ভাই।
(৬) সুপ্রভাত হে সূর্যিমামা।
(৭) খাওরে মণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা।
(৮) কত পাখী আছে।
(৯) আমরা খরগোষ।
(১০) বড় গরম ভারি গরম।
(১১) ঐ এসেছে কেল্লো।
(১২) আমরা সবাই রেলের গাড়ি।
(১৩) হ্যাদেগো নন্দরাণী।
(১৪) ফুলের পোষাক পরব।

(ঘ) গান ও স্বরলিপি

খেলা করি খেলা

ভাসাই মোরা সযতনে

হরষেরই ভেলা

নানা রকম খেলা করি

খেলার ছলে লিখি পড়ি

প্রাণটি নূতন করে তোলে

আমাদেরই খেলা ।

II পা পা দা | পা মজ্ঞা মা | পা ণা দা | পা -া -া |
খে - লা - ক রি খে - - লা - -

সা সা রা | জ্ঞা মা পমা | জ্ঞরা জ্ঞা -া | ঋা আ -া |
ভা সা ই মো রা - স য - ত নে -

জ্ঞা জ্ঞা ঋা | ঋা ঋা জ্ঞা | ঋা সা -া | -া -া -া II
হ র - ষের এ ই ভে লা - - - -

II দা দা -া | না র্সা -া | ন র্সা -া | না র্সা -া |
না না - র ক ম খে লা - ক রি -

র্সর্রা -া -া | র্সা -া র্সর্রা | র্সনা র্সা -া | র্সনা র্সা -া |
খে লা র ছ লে - লি খি - প ড়ি -

র্রা -া র্রা | র্সা র্সা -া | ণা সা ণা | দা পা -া |
প্রা ণ টি নূ ত ন ক রে - তো লে -

পা পা দা | দা দা ণা | দণদা পা -া | -া -া -া II
আ মা - দের এ ই খে লা - - - -

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমার দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছে সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন, করেছ আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরিবন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে
জনমে মরণে শোকে আনন্দে, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

২ ৩ ০
II { সা সা সা | গা -া গা | মা মা মা | প -া ধা I
তো মা রি গে - হে পা লি ছ স্নে -া হে

র্সা -া ণা | ধা -া মা | পা -ধা মা | গা -া -া } I
তু - মি ধ - ন্য ধ - ন্য হে - -

না না না | না -া না | র্সা র্সা র্সা | পা -া ধা I
আ মা র প্রা - ণ তো মা রি দা - ন

র্সা -া ণা | ধা -া মা | পা -ধা মা | গা -া -া II
তু - মি ধ - ন্য ধ - ন্য হে - -

II { মা পা পা | না -া না | না র্সা র্সনা | র্র্সা -া র্সা I
(১)পি তা র ব - ক্ষে রে খে ছ মো - রে
(২)তো মা র বি শা ল বি পু ল ভু ব নে
(৩)হৃ দ য়ে বা হি রে স্ব দে শে বি দে শে

I না না না | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সর্রা ণা | ধা -া পা] I
(১) জ ন ম দি য়ে ছ জ ন নী ক্রো - ড়ে
(২) ক রে ছ আ মা র ন য় ন লো ভ ন
(৩) যু গে, যু গা ন্ তে নি মে ষে নি মে ষে

| ধা ধা ধপা | মা গরা গা | মা মা মা | পা -া ধা |
(১) বেঁ ধে ছ স খা র প্র ণ য় ডো - রে
(২) ন দী গি রি ব ন স র স শো ভ ন
(৩) জ ন মে ম র ণে শো কে আ ন ন দে

| র্সা -া ণা | ধা -া মা | পা -ধা মা | গা -া -া | II
(১) তু - মি ধ - ন্য ধ - ন্য হে - -
(২) তু - মি ধ - ন্য ধ - ন্য হে - -
(৩) তু - মি ধ - ন্য ধ - ন্য হে - -

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল-জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

II সা রা গা গা | গা গা গা গা | রগা -া গা গা | গরা গা মা -া I
জ ন গ ণ ম ন অ ধি না - য় ক জ য় হে -

| রগা -া গা গা | রা -া রা ন্া | ন্রা -া সা -া | -া -া সা -া |
ভা - র ত ভা - গ্য বি ধা - তা - - - পন্ -

| রপা -া পা পা | -া পা পা -া | পা -া পা পক্ষা | গপা-ক্ষা ধপা -া |
জা - ব সি ন্ ধু গুজ - রা - ট মা রা - ঠা -

| মা -া মা মা | মা -া মা গা | গরা -মা গা -া | -া -া -া -া |
দ্রা - বি ড় উৎ- ক ল ব - ঙ্গ - - - - -

| [ম]গা -া গা গা | গা -া গা রা | [র]পা পা পা -া | [প]মা -া মা -া |

বি – ন্ধ্য হি মা – চ ল য মু না – গঙ্ – গা –

| গা -া গা গা | [গ]রা রা রা ন্‌া | [ন]রা -া সা -া | -া -া -া -া |

উ – চ্ছ ল জ ল ধি ত র – ঙ্গ – – – – –

গা গা গা গা | গা -া গা মা | [ম]রা -গা মা -া | -া -া -া -া |

ত ব শু ভ না – মে – জা – গে – – – – –

[ম]গা মা পা পা | [ম]পা -া মা গা | [গ]রা -মা গা -া | -া -া -া -া |

ত ব শু ভ আ – শী ষ মা – গে – – – – –

[ম]গা -া গা -া | গা গা [গ]রা রা | [র]ন্‌া -রা সা -া | -া -া -া -া |

গা – হে – ত ব জ য় গা – থা – – – – –

[গ]পা পা পা পা | পা -া পা হ্মা | পা -া পা পা | [প]হ্মা ধা [ম]পা -া |

জ ন গ ণ মঙ – গ ল দা – য় ক জ য় হে –

মা -া মা মা | [ম]গা -া গা গমা | [গ]রা -মা [ম]গা -া | -া -া না না |

ভা – র ত ভা – গ্য বি ধা – তা – – – জ য়

[ন]র্সা -া -া -া | -া -া -[র্স]না ধা | না -া -া -া |

হে – – – – – জ য় হে – – –

-া -া পা পা | [প]ধা -া -া -া | [ধ]সা সা রা রা | গা গা [গ]রা গা |

– – জ য় হে – – – জ য় জ য় জ য় জ য়

মা -া -া -া |

হে – – –

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।

কেয়া পাতার নৌকা গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে
তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব
চল্‌বে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখ্‌ব গায়ে ফুলের রেণু,
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

II সা সা -রা | গা পা -ধা | পধা -না না | [ন]ধা পা -া |
মে ঘের – কো লে – রোদ্ – হে সে ছে –

[প]গা রা -া | গা গা মা | [ম]গা রা -গরা | -সা -া -া |
বা দল – গে ছে – টু টি – – – –

সা -া -রা | গা -া রা | সা -া -া | -া -া -া |
আ – – হা – – হা – – – – –

পা -া ধা | [ধ]র্সা র্সা -া | [র্স]র্রা র্সা -া | [র্স]না ধা -না |
আ – আ মা দের – ছু টি – ও ভা ই

নপা -া ধা | ধপা পা -গা | গপা পা ধা | না -া -া |
আজ – আ মা দের – ছু টি – – – –

সা -া রা | গা -া রা | সা -া -া | -া -া -া II
আ - - হা - - হা - - - - -

II পা -া গা | পা পা -ধা | ধর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া |
কি - ক রি আজ - ভে বে - না পাই -

র্সা -া র্রা | র্রা র্মর্রা -র্গা | র্গর্রা -া র্সা | র্সনা ধপা -া |
পথ - হা রি য়ে - কোন্ - ব নে যাই -

পা -া ধা | ধর্রা র্সা -া | র্সনা না -র্সনা | নধা পা -া |
কোন - মা ঠে যে - ছু টে - বে ড়াই -

পধা -ধা -ণা | নধা পা -া | গা গা -া | -া -া -রা |
স ক ল ছেলে - - জু টি - - - -

সা -া রা | গা -া -রা | সা -া -া | -া -া -া II
আ - - হা - - হা - - - - -

II প্সা সা -া | সা সা -রা | গা -া গা | গা গা -া |
কে য়া - পা তার - নৌ - কা গ ড়ে -

গা গা রা | গা গা -ধা | ধা ধা -ণধা | ধপা -া -া |
সা জি য়ে দে ব - ফু লে - - - -

গা -া রা | গা গা -মা | মগা গা গা | গরা সা -া |
তাল - দি ঘি তে - ভা সি য়ে দে ব -

সা -া ধ্া | সা সরা -গা | গা গরা -গরা | -সা -া -া |
চল্ - বে দু লে - দু লে - - - -

পা মপা -গা | পা পা -ধা | ধা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
রা খাল - ছে লের - স - ঙ্গে ধে নু -

র্সা র্সা র্রা | র্রা র্সর্রা -র্গা | র্গর্রা র্সা র্সা | র্সনা ধপা -া |
চ রা — ব আজ — বা জি য়ে বে ণু —

ধা -া ধা | ধর্রা র্সা — | র্সনা না -র্সনা | নধা পা -া |
বাৎ — ব পা য়ে — ফু লের — রে ণু —

ধা ধা -পা | পধা পা -া | গা গা -া | -া -া -রা |
চাঁ পার — ব নে — লু টি — — — —

রসা -া -রা | গা -া -রা | সা -া -া | -া -া -া II
আ — — হা — — হা — — — — —

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে-লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি'।
মাণিক-গাঁথা ঐ যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।

II র্সা র্সা -া | র্সণা ণা -া | ধা ধা -া | ধপা মা -া |
শ র ৎ তো মা র অ রু ণ আ লোর —

গা -া গরা | পমা -া -া | সা মা মর্সা | র্সনা র্রর্সা -া |
অন্ — জ লি — — ছ ড়ি য়ে গে ল —

-া -া -া | -া -া -ণা | ণধা ধা ণা | ণধা র্সণা -া |

– – – – – – ছ ড়ি য়ে গে ল –

-া -া -া | -া -া ধা | ধপা পা র্সা | র্সণা ধা -া |

– – – – – – ছ ড়ি য়ে গে ল –

ধা ধণা ণধা | পা মা -া | গা রা গা | পমা -া -া II

ছা পি য়ে মো হন – অঙ – গু লি – –

II মা মা -া | পা ধা -া | ধা ধা -ণা | ণা ণা -া |

শ রৎ – তো মার – শি শির – ধো ওয়া –

ণধা -া পা | ধা -া -া | ধর্সা র্সা -া | র্সণা ণা -া |

কুন – ত লে – – ব নের – প থে –

ধা ধা ধা | পা মা -া | সগা -া রা | পমা -া -া |

লু টি য়ে প ড়া – অন্ – চ লে – –

মা -া র্সা | র্সনা র্সা -া | র্সনা র্সা -া | র্সনা র্রসা ণা |

আজ – প্র ভা তের – হৃ দয় – ও ঠে –

ণধা -া ণা | ণর্রা -া -া |

চন্ – চ লি – –

II ধ্া ধ্া -া | রা রা -া | রা -গা -গা | গা গা -া |

মা ণিক্ – গা থা – ঐ – যে তো মার –

গা -া গা | গা -া -া | মা মা -া | পা ধা -া |

কঙ – ক নে – – ঝি লিক – লা গায় –

ধা ণা -া | ণা ণা -া | ণধা -া পা | ধা -া -া |
তো মার – শ্যা মল্ – অঙ্ – গ নে – –

পধা -মা মা | পা ধা -া | পধা -মা মা | পা ধা -া |
কুন্ – জ ছা য়া – গুন্ – জ র ণের –

ণা -া পা | ধা -া -া | ধর্সা -া র্সা | সণা ধা -া |
সঙ্ – গী তে – – ওড় – না ও ড়ায় –

ধণা ধা -া | পা মা -রা | মা -া পা | ধা -া -া |
এ কি – না চের – ভঙ্ – গী তে – –

ধর্সা -া র্সা | র্সনা র্সা -া | র্সনা -া র্সা | র্সনা র্রর্সা -ণা |
শিউ – লি ব নের – বুক – যে ও ঠে –

ধা -া ণা | ণর্রা -া -া |
আন্ – দো লি – –

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসগো শারদ লক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্মল নীল পথে
এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্বতে!
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত-শতদল
শীতল শিশির-ঢালা।।

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত-কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে
হাসি ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলক কোণে
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে!
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইলে আলা।।

[ণদা দা পা]
II { ঋা মা মা | মা মগা মা | পা -া পা | ।।(দপা -সা সা) }
{ বেঁ ধে ছি কা শে র গু — চ্ছ আম — রা। }

পা -া পা | পমা দা দা | না র্সা ঋর্সা | নর্সা -পা -দা |
আম — রা গেঁ থে ছি শে ফা লি মা — —

না -া -া | নদা না না | র্সা র্সা র্সঋা | র্সনা -র্সা র্সনা |
লা — — ন বী ন ধা নে র মন্ — জ

দা দপা পমা | মপা পা পণা | ণদা পা মা | মগা -া মা |
রী দি য়ে সা জি য়ে এ নে ছি ডা — —

মণা -া দা II
লা — —

-া -া -া II পদা দা দা | ন র্সা র্সা | র্সঋা -া ঋর্সা |
– – – এ স গো শা র দ ল – ক্ষ্মী

র্সনা র্সা -া | র্সা -া র্সর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা র্সা | র্সনা র্সা -না |
তো মার – শু – ভ্র মে ঘে র র থে –

ণদা পা -া | পর্সা -া র্সা | র্সা র্সর্ঋা ঋর্সা | র্সনা র্সা -না |
এ স – নি – র্ম্ম ল নী ল প থে –

নদা পা দা | পর্সা -া র্সা | র্সা র্সা ঋা ঋর্সা | র্সনা র্সা না |
এ স – ধৌ – ত শ্যা ম ল আ লো ঝ

নদা পা পমা | মপা পণা ণদা | পা পমা -গা | মা পা -া |
ল ম ল ব ন গি রি প – র্ব্ব তে –

-া সা সা | রা ম্যা মা | মা মগা মা | পা পা পা |
– এ স মু কু টে প রি য়া শ্বে ত শ

পা পা পা | পদা দা দর্ঋা | ঋর্সা র্সা না | নপা -া -দা |
ত দ ল শী ত ল শি শি র ঢা – –

না -া -র্সা II
লা – –

-া -া -া II সা ঋা মা | মা মা মা | মা -গমা -পদা |
– – – ঝ রা মা ল তী র ফু – –

মপা -া -া | পদা দা দা | দা দা দা দপা প পণা |
লে – – আ স ন বি ছা নো নি ভৃ ত

ণদা -া পা | প দা দপা | -মা মা মা | ম -গমা -পদা |
কুন্ – জে ভ রা গ – ঙ্গা র কূ – –

মপা -া -া | পা দা না | নর্সা র্সা -া | র্সনা র্সা না |
লে – – ফি রি ছে ম রাল – ডা না পা

দা দপা পমা | মপা পা পণা | দণা দা পা | পমা -া গপা |
তি বা রে তো মা র চ র ণ মূ – –

পমা -া গা | {গসা -গা -গা | গঋা ঋা -া |
লে – – গুন্ – জ র তান –

সা সা সা | সা সা -া | সা সঋা -া | ঋা ঋা -া |
তু লি য়ো তো মা র সো নার – বী ণার –

ঋা -া সন্া | সা -া -া | সা ঋা গা | মা মা -া |
তা – – রে – – মৃ দু ম ধু ঝঙ্ –

মা -া -গপা | পমা -গা (-ঋা) }] -া I
কা – – রে – – –

পা দা দর্সা | র্সা র্সা -া | র্সনা র্সা না | দা পা পমা |
হা সি ঢা লা সুর – গ লি য়া প ড়ি বে

মপা পা পণা | ণদা -া পা | মা -গমা -পদা | মপা -া -া |
ক্ষ ণি ক অ – শ্রু ধা – – রে – –

দা দা দা | ন র্সা র্সা | র্ঋা ঋা ঋা | র্সনা র্সা র্সা |
র হি য়া র হি য়া যে প র শ ম ণি

র্সা র্সা র্সজ্ঞা | জ্ঞঋা ঋা র্সা | র্সনা -া -র্সঋা | নর্সা -দ -া |
ঝ ল কে অ ল ক কো – – ণে – –

দঋা র্সা র্সা | -া ঋা র্সা | র্সনা র্সা র্সনা | দা পা পমা |
প ল কের – ত রে স ক রু ণ ক রে

পণা ণদা পা | পণা ণদা পা | পমা -গমা -পদা | দপা -া -া |
বু লা য়ো বু লা য়ো ম – – নে – –

সা ঋা ঋমা | মা মগা মা | পা পা পা | পা পা পা |
সো না হ য়ে যা বে স ক ল ভা ব না

পদা দা দঋা | ঋর্সা র্সা না | পা -া দা |
আঁ ধা র হ ই বে আ – –

না -া -র্সা II II
লা – –

বাদল বাউল বাজায়রে একতারা
সারা বেলা ধ'রে ঝর ঝর ঝর ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তালে আপনি মেতে
নেচে নেচে হোলো সারা
ঘন ঘটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পূবে হাওয়া গৃহহারা।

{সা -া গা গা | গা -মা ধপা -া | পগা -া মা -া | মগা -া পমা -গা |
বা – দ ল্ বা – উ ল্ বা – জা য় বা – জা য়

গরা -া গপা -পমা | মগা -া (-া -া | ।।গপা -হ্মা পা না | নধা না নপা -া |
বা – জা য় রে – – – বা – জা য় রে – এ ক্

পা ধা মা পা | পগা -মা -রা -গা)} I পা -া I পা না -া না |
তা – – – রা – – – সা – রা – – বে

না -র্সা -া সনা I ধনা -া -পা -া | -া -া পা হ্মা |
লা – – ধ রে – – – – – ঝা র

প র্সা র্সনা -র্সা | নধা -না নপা -া | পা -ধা -মা -পা |
ঝ – র – ঝ – র – ধা – – –

পগা -সা -রা -গা II
রা – – –

II পা হ্মা ধা পা | পনা নধা না -া | নর্সা -া র্সা -া | র্সা -া র্সা -া |
জা – মে র ব – নে – ধা – নে র ক্ষে – তে –

পার্সা -া র্সা না | নধা -না র্সা -া | র্সা -না র্রা র্সনা | ধনা -া ধপা -া |
আ – প ন তা – নে – আ – প নি মে – তে –

পা -র্সা -া ণা | ণা -া ণা -ধা | ধপা -ধা ধপা -া |
– – – – নে – চে – নে – চে –

পমা -পমা মগা -া | সা -া গা -া | গা -মা পা -া II
নে – চে – হো – লো – সা – রা –

II সা -া সা -া | সা -া সন্া -া | সা -া রা -া | রা -া রসা -না |
ঘ – ন – ঘ – টা র্ ঘ – টা – ঘ – না য়

সা -া গা গা | গমা -া পা গা | গমা -রা গা -া | -া -া -া -া |
আঁ – ধা র আ – কা শ মা – ঝে – – – – –

গপা হ্মা পা হ্মা | হ্মপা হ্মাপা গা হ্মা | পা না নধা ধা | ধপা হ্মা পা -া |
পা – তা য় পা – তা য় টু – পু র টু – পু র

পহ্মপা -ধা ধপা -া | পমা -া গা -া | গরা -পমা মগা -া | -া -া -া -া |
নু – পু র ম – ধু র বা – জে – – – – –

র্গর্সা -া র্গা র্গর্রা | র্রা -া র্সা -া | র্সা -া র্সা -া | র্সা -া র্সা না |
ঘ – র ছা ড়া – নো – আ – কু ল্ স্থ – রে –

নধা -না র্সা -া | -া -া র্সা না | নধা না র্সা না | ধনা -া ধপা -া |
উ – দা – স্ – হ য়ে বে – ড়া য় ঘু – রে –

না -া নর্সা র্গনা | নধা -ন ধপা -া | -পা -র্সা -া -া | ণা -া -া ধা |
পূ – বে – হা ও য়া – – – – – – – – –

ধপা -া ধা পা | পমা -া পা -া II
গৃ – হ – হা – রা –

বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ করে দে যাবি অনেক দূর।
ছাড়ল খেয়া ওপার হতে
ভাদ্র দিনের ভরা স্রোতে
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ বন্ধুর।
কদম কেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি
মৌমাছিরা কেয়া বনের পথ গিয়েছে ভুলি :
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া
আকাশ আজি শিশির ছাওয়া
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর।

II পা পা - | পমা পধা -মপা | পমা মজ্ঞা -া | জ্ঞরা মাজ্ঞা -রা | সা সা রা |
বা দ ল ধা রা – হো লো – সা রা – বা জে –

জ্ঞা জ্ঞা রা | রসা -া -া | -া -া -া I
বি দা য় সু র – – – –

{মা পা -া | পা পা -ধা | ধপা র্সা র্সণা | ধা পা -া |
গা নে র পা লা – শে ষ ক রে দে –

পা ধা ধপা | মা গরা -গা | গমা -া -া | -া -া -া} I
শে ষ ক রে দে – রে – – – – –

মপা পমা -া | মজ্ঞা জ্ঞা রা | মজ্ঞা -া -া | রা সা রা II
যা বি – অ নে ক্ দূ – – – – র্

II পা -া পা | পা পা -া I পা পা -ধা | ণা র্সা নর্রা I
ছা ড়্ ল খে য়া – ও পা র হ তে –

র্র্সা -া র্সণা | ধা পা -া | পধা ধপা -া | পমা গা -রগা |
ভা – দ্র দি নে র ভ রা – স্রো তে –

[সা -জ্ঞা]
গমা -া -া | -া -া -জ্ঞা I {জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞর্রা জ্ঞা -া |
রে – – – – – দু ল্ ছে ত রী –

জ্ঞরা জ্ঞা - | জ্ঞরা মজ্ঞা -রা | সা সা রা | জ্ঞা জ্ঞা রা |
ন দী র প থে – ত র ঙ্ গ ব ন্

রসা -া -া | -া -া -া I 'গানের পালা শেষ' ইত্যাদি অস্থায়ীর ন্যায়
ধু – – – – র্

II সন্া ন্া -া | ন্া প্া -া | ন্া সা -া | সা সা -রসা |
ক দ ম্ কে শ র ঢে কে – ছে আ জ

সন্া ন্া -া | ন্া ন্প্া -া | ন্া সা -া | -া -া -া |
ব ন – ত লে র ধূ লি – – – –

সা -জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা জ্ঞা -া | জ্ঞরা মজ্ঞা -রা |
ম উ মা ছি রা — কে য়া — ব নে র্

সরা -সা রা | রা মজ্ঞা -রা | সরা সা -া | -া -া -া I
প থ গি য়ে ছে — ভু লি — — — —

পা পা -া | পা পা -া | পা -া ধা | ণা র্সা -নর্রা |
অ র — ণ্যে আ জ স্ত ব্ ধ হাও য়া —

র্র্সা ণা -া | ণধা পা -া | পধা ধপা -া | পমা গা -রগা |
আ কা শ আ জি — শি শি র্ ছাও য়া —

মা -া -া | -া -া -া I {মজ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞরা জ্ঞা -া I
রে — — — — — আ লো — তে আ জ্

জ্ঞরা জ্ঞা -া | জ্ঞরা মজ্ঞা -া | সরা সা রা |
স্মৃ তি র আ ভা স্ বৃ ষ টি

জ্ঞা জ্ঞা রা | রসা -া -া | -া -া -া | "গানের পালা"
র বি ন্ দু — — — — র্

ইত্যাদি আস্থায়ীর ন্যায় II

ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল,
লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে, লাগল যে দোল।
খোল্, দ্বার খোল্।
রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাতে আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্, দ্বার খোল্।
বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।

মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা
পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা,
মাধবী-বিতানে বায়ুগন্ধে বিভোল
খোল্ দ্বার খোল্।

সা রা ॥ গা রা সা রা | রধা -া পা -া II সা ধা ধা -া | পা ধা না ধপা I
ও – রে – গৃ হ বা – সী – খোল্ দ্বার খো – – ল্

I পা ধা না না | ধপা -া -া -া I র্সা র্সা না না | ধা ধা পা পা I
লা গ্ ল্ যে দো ল্ – – স্থ লে জ লে ব ন ত লে

I পধা -া ধা ধা | পা -া পা -মা I গা -া গা -রা | সা -া সা রা II
লা গ্ ল যে দো ল্ দ্বা র খো ল্ দ্বা র খো ল্ "ও –"

II { পা গা পা পা | পা ধা পা ধা I ধর্সা র্সা র্সা র্সনা | র্রর্সা -া র্সা -া } I
{ রা ঙা হা সি রা শি রা শি অ শো কে প লা – শে – }

I র্সা র্রা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্সা র্সা I নর্রা র্রা র্সা র্সনা | ধনা -া ধপা -া } I
রা ঙা নে শা মে ঘে মে শা প্র ভা ত আ কা – শে – }

I র্গা র্গা -া র্রা | র্রা -া র্সা র্সা I সা সা সা রা | গা -া সা রা I
ন বী ন পা তা য় লা গে রা ঙা হি ল্ | লো ল দ্বা র

গা -া গা -রা | সা -া সা -রা II
খো ল্ দ্বা র খো ল্ "ও –"

II { সা ধ্া সা সা | সা -া সা রা I গা গা গা গা | গা -া গা রা I
{ বে ণু ব ন ম র্ ম রে দ খি ন বা তা – সে –

I গা গধা ধা ধা | পা ম্পা গা রা I গা রা সা -া | -া -া -া -া } I
প্র জা প তি দো লে ঘা সে ঘা – সে – – – – – }

{পা -গা পা ধা | পা ধা পা ধা I ধর্সা র্সা র্সা র্সনা | র্রসা -া র্সা -া I
ম উ মা ছি ফি রে যা চি ফু লে র দ খি – না –

র্সর্গা র্গা -া র্রা | র্রা -া র্সা -া I নর্রা র্রা র্সা র্সনা | ধনা -া ধপা -া}
পা খা য়্ বা জা য় তা র ভি খা রী র বী – ণা –

র্গা র্গা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্সা র্সা | সা -া সা রা | গা -া সা রা I
মা ধ বী বি তা নে বা য়ু গ ন্ ধে বি ভো ল দ্বা র

গা -া গা -রা | সা -া সা -রা II II
খো ল্ দ্বা র খো ল্ "ও –"

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙাল দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি,
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে।।

[মা জ্ঞা রা সা]
II {সা সা রা রা | রা গা মা পা I পনা নধা পা -া | (-মা -গা -মা পা)}
ফা গু নে র ন বী ন আ ন ন্ দে – – – – –

I -া -া -া -া I পা না র্সা র্রা | র্রসা ণা ধা পা I পা -ধা ধপা -া |
– – – – গা ন্ খা নি গাঁ থি লা ম্ ছ ন্ দে –

মা গা মা পা I [ ] I
ছ ন্ দে –

[র্রা র্সা ণধা পধা]
II { পা মা পা ধা | না র্সা র্রা র্সনা I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
দি ল তা রে ব ন বী – থি – – – – – – –

I র্সা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা I র্মর্জ্ঞা -া -া -া | -া -া (-া -া)} I
কো কি লে র ক ল গী – তি – – – – – – –

I -র্রা র্সা | র্সা র্রা র্সা ণা | ধা ধপা ধা পা I মা গা মা -গা |
– – ভ রি দি ল ব কু লে র গ ন্ ধে –

মা গা মা পা I [ ] II{ সা সজ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা রা I
গ ন্ ধে – মা ধ বী র ম ধু ম য়

জ্ঞা -রা জ্ঞা -া | -া -া -া -রা I সা রা জ্ঞা রা | সা রা জ্ঞা রা I
ম ন ত্র – – – – – র ঙে র ঙে রা ঙা লো দি

[র্র র্সা ণধা পধা]
সনা -া সা -া | -া -া -া -া} I { পা পা পা ধা | না র্সা র্রা র্সনা I
গ ন্ ত – – – – – বা ণী ম ম নি ল তু –

র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I র্সজ্ঞা র্রা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা I
লি – – – – – – – প লা শে র ক লি গু –

র্মর্জ্ঞা -া -া -া | -া -া (-া -া)} I -র্রা র্সা | র্সা র্রা র্সা ণা |
লি – – – – – – – – – বেঁ ধে দি ল

ধা পা ধা পা I মগা -া মা -গা | মা -গা মা -পা II [] II
ত ব ম ণি ব ন্ ধে – ব ন্ ধে –

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যা বেলার চামেলিগো, সকাল বেলার মল্লিকা,
আমায় চেনো কি?"
"চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ,
বনে বনে ওড়ে তোমার
রঙগীন বসন প্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলাগো, চৈত্র রাতের উদাসী,
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।"
"পথভোলা এক পথিক এসেছি।'
ঘর ছাড়া এই পাগলটাকে
এমন করে কেগো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি'
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে
বেড়াই সঞ্চরি?"
"আমি তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে
তোমার স্বপন চোখে লাগে
বেদন জাগে গো,—
না চিনিতেই ভাল বেসেছি।"
"পথভোলা এক পথিক এসেছি।
যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা
তপ্ত ধূলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে
তখন সঙ্গ কে লবি?"
"লব আমি মাধবী।"
"যখন বিদায় বাঁশীর সুরে সুরে
শুক্‌নো পাতা যাবে উড়ে,
সঙ্গে কে রবি?"
"আমি রব উদাস হব ওগো উদাসী
আমি তরুণ করবী।

বসন্তের এই ললিত রাগে
বিদায় ব্যাথা লুকিয়ে জাগে;
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি,
আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

গামা II মপা -র্সা র্সণা | ধা পা ধপা | মা গা সা | গা -া মা |
আমি প থ ভো লা এক – প থিক – এ – সে

পা -া -া | -া -া -া | মা ধা ধা | ধা ধা -া | ধা ধা -া |
ছি – – – – – সন্ – ধ্যা বে লার – চা মে –

ধা পধা মা I ধা ধা -া | ণ র্সা -া I র্সধা -র্সা ণধা |
লি গো – স কাল্ – বে লার – ম ল্ লি

পা -া -া | না না -া | ধনা -ধা না | র্সা -া -া | -া গা মা II
কা – – আ মায় – চে – নো কি – – – "আমি"

-া -া -া II না না -া | না না -া I পনা না -া | না না র্সা I
– – – চি নি – তো মা য় চি নি – ন বী ন

ধনা -া -া | র্সা -া -া I র্সনা র্সা -া | র্সনা র্সা র্রা I র্রর্সা ণা -া |
পান – – থ – – ব নে – ব নে – ও ড়ে –

ধা পা মা I গা মা পা I ধা ণা র্রা | র্রর্সা -ধর্সা -ণধা |
তো মা র র ঙীন্ – ব স ন্ প্রান্ – –

ধপা -া গা | মা মা ণা | ণধা ধা -া | ধা ধা -া | ধা পধা মা I
ত – – ফা গুন্ – প্রা তের – উ ত – লা গো –

মধা -া ধা | ণা র্সা ণা I ণধা র্সণা ধা | পা -া -া I
চৈ – ত্র রা তে র উ দা – সী – –

পনা না -া | না না -া I না -া না | নার্স নধা না |
তো মার — প থে — আম — রা ভে — সে

র্সা -া -া | -া গা মা II
ছি — — — আ মি

-া -া -া | {পমা ধা ধা | ধা ধা না I না র্সা -া | র্সনা র্সা -া I
— — — ঘর — ছা ড়া এই — পা গল — টা কে —

র্সর্মা র্মা -র্গা | র্রা র্সা -া I র্সনা র্সর্রা র্রর্সা | ণা ধা -া} I
এ মন্ — ক রে — কে — গো ডা কে —

মা পা -া | পধপা -মগা গা I মা -া -া | -া মা মা |
ক রুণ — গু ন্ জ রি — — — য খন

মগা গা মা | মগা মা -া I মগা মা -া | গা মা -া I পা ধা -া |
বা জি য়ে বী ণা — ব নের — প থে — বে ড়াই —

না -া না | র্সা -া -া | -া -া -া | র্সর্মা র্মা -া | র্সর্গা র্মা -া I
সন্ — চ রি — — — — — আ মি — তো মায় —

র্মর্গা -া র্মা | র্মর্গা -র্মা র্জ্ঞা I র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা র্রা | র্রর্সা র্রর্সনা না |
ডাক্ — দি য়ে ছি — ও গো — উ — দা

র্সা -া -া | -া র্সা র্সা | মা পা -া | ধপা -মগা গা |
সী — — — আ মি আ মের — ম ন্ জ

মা -া -া | -া -া -া | সা সা জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা -া I
রী — — — — — তো মায় — চো খে —

জ্ঞরা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া | জ্ঞপা পা -া | পমা মা রা I রমা মজ্ঞা -া |
দে খার — আ গে — তো মার — স্ব পন — চো খে —

রা সা -া -া জ্ঞা -া | -া -া -া I জ্ঞা জ্ঞা -া | রজ্ঞা রমা জ্ঞরা
লা গে – – – – – – – বে দন – জা – গে

সা -া -া | -া -া পা I মপা - পা | পা পা -া I পা পা মা
গো – – – – – না – চি নি তেই – ভা লো –

মপা - ধা I পধণা -া -া | -া গা মা II
বে – সে ছি – – – "আ মি"

সা সা -া II সা সা সা | রা রা -া I রা সা রা | গা গা -াI
য খন – ফু রি য়ে বে লা – চু কি য়ে খে লা –

গরা -া গা | মা মা -া I মপা পা -া | মা গা -া I মা মা ধাI
তপ – ত ধূ লার – প থে – যা ব – ঝ রা –

ধা ধা না I না র্সা -া | র্সা ণা র্সা I ণধা -া ধা | না -া নাI
ফু লের – র থে – ত খন্ – সঙ্ – গে কে – ল

র্সা -া -া | -া র্সা র্সা I মা পা -া | ধপা মগা গা I
বি – – – ল ব আ মি – মা – ধ

মা -া -া | -া মা মা I মা ণধা -া | ধা ধা না I না র্সা -া |
বী – – – য খন বি দায় – বাঁ শির – সু রে –

র্সনা র্সা -া I র্সর্মা -া র্মর্গা | র্রা র্সা -া I র্সনা র্রর্সা ণর্সা |
সু রে – শুক্ – নো পা তা – যা বে –

মণা ধা -া I মা -া পা | ধপা -মগা গা I মা -া -া | -া -া -া I
উ ড়ে – সঙ্ – গে কে – র বি – – – – –

মগা মা -া | মগা মা -া I পা ধা -া | না র্সা -া I র্সনা না পা |
আ মি – র ব – উ দাস – হ ব – ও গো –

পনা -া না I র্সা -া -া | -া মা মা I মা পা -া | ধপা মগা গা I
উ – দা সী – – – আ মি ত রুণ – ক – র

মা -া -া | -া -া -া I সা সা জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা জ্ঞা -া |
বী – – – – – ব সন – তের এই – ল লিত –

জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞপা পা -া | পমা মা রা I রা রমা মজ্ঞা |
রা গে – বি দায় – ব্যা থা – লু কি য়ে

রা সা -া I -া জ্ঞা -া | -া -া -া I সজ্ঞা জ্ঞা -া | রজ্ঞা -রমা
জা গে – – – – – – – ফা গুন্ – দি –

জ্ঞরা I রসা -া -া | -া -া পা I সপা পা -া | পা পা -া I
নে গো – – – – – কাঁ দন – ভ রা –

পা পা মা | মপা -া ধা | পধণা -া -া | -া গা মা II
হা সি – হে – সে ছি – – – 'আ মি'

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে!
(ও চাঁপা ও করবী)
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ মাঝে
জানি না যে।
কোন্‌ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না যে।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।

কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার
মনে জাগে ?
কোন্ রঙের মাতন উঠ্‌ল দুলে
ফুলে ফুলে !
কে সাজালে রঙীন সাজে
জানি না যে।

স্‌া II গা গা মা | পা -র্সা র্সা I সনা ধনা -পা | পমা মগা -রা |
স হ সা – ডা ল্ পা লা তো র উ ত –

গা গামা -া | -া -া গা I গা গা -রগা | গমা পা পমা I
লা যে – – – ও চাঁ পা – ও – ক

গা রসা -া | -া -া সা I সমা মগা -মা | পা র্সা র্সা I
র বী – – – কা রে তু ই দে খ্ তে

র্সা না -া | -া -া -া I -া -া -া | নর্সা র্সা -া I র্সনা র্রর্সা -া |
পে লি – – – – – – – আ কা শ মা ঝে –

পন্মা ধপা -া I পমা গা -া | গা গা রা | গা গা পা | -া -া পা I
জা নি – না যে – জা নি – না যে – – – স

পর্সা র্সা -া | র্সা -া না I না পন্মা ধপা | পমা গা রা |
হ সা – ডা ল্ পা লা তো র উ ত –

গা গমা -া | -া -া গা I গা গা রগা | গমা পা পমা I
লা যে – – – ও চাঁ পা – ও – ক

গা রসা -া | -া র্সা র্গা I র্গা র্গা -া | র্গর্রা র্রা না I নর্রা র্রর্সা -া |
র বী – – কো ন সু রের – মা ত ন্ হাও য়া য়

র্সা র্সা -র্রা I নর্সা না ধা | নপা -া ধা I না -া না | না না -র্সা I
এ সে – বে ড়া য় ভে – – সে – ও চাঁ পা –

র্সাধা -র্সা সা | র্সনা ধপা -া I (-া -া -া | -া র্সা র্গা) I
ও - ক র বী - - - - - কো ন্

ধা র্রা র্সা | র্সণা ণা ধা I ধপা ধা পা | পমা গা -া I
কা র না চ নের নু পু র বা জে -

গা গা -া | গা গা -া I গা গা রা | গা গা পা I -া -া -া |
জা নি - না যে - জা নি - না যে - - - -

-া -া পা II পর্সা সা -া | র্সা -া না I না পক্ষা ধপা | পমা গা রা I
- - স হ সা - ডা ল পা লা তো র উ ত -

রগা মা -া | -া সা ন্া I সা গা -া | গসা গা -া I গসা গা -া |
লা যে - - তো রে ক্ষ ণে - ক্ষ ণে - চ ম ক্

গা মা -া I মা পা পা | পা পা -া | পা পা ধা | ধর্সা র্সণা ধা I
লা গে - কো ন্ অ জা না র ধে য়া ন্ তো মা র

ধপাধা ধপা মাগা | গা মা -া I -া -া -া | -া র্সা র্গা I
ম নে - জা গে - - - - - কো ন্

র্গা র্গা -া | র্গর্রা না -া I র্সনা র্রা র্সা | র্সা র্সা র্রা I নর্সা সনা ধা I
র ঙের মা ত ন উ ঠ্ ল দু লে - ফু লে -

পা -া ধা I না -া না | না না র্সা I ধা র্সা র্সা | র্সনা ধপা -া I
ফু - - লে - ও চাঁ পা - ও - ক র বী -

(-া -া -া | -া র্সা র্গা) I ধা র্রা র্সা | র্সণা ণা ধা I ধপা ধা পা |
- - - - কো ন্ কে - সা জা লে - র ঙি ন

মা গা -া I সগা গা -া | গা গা -া I গা গা রা | গা গা পা I

সা জে – জা নি – না যে – জা নি – না যে –

-া -া -া | -া -া পা I পর্সা র্সা -া | র্সা -া না I

– – – – – স হ সা – ডা ল্ পা

নৰ্মা পাৰ্মা ধপা | পমা গা রা I গা মা -া | -া -া মা I

লা তো র উ ত – লা যে – – – ও

মগা গা মা | মগা পা পমা I গা রসা -া | -া -া -া II

চাঁ পা – ও – ক র বী – – – –

ওরে বকুল, ওরে পারুল, শাল পিয়ালের বন,
কোন খানে আজ পাই
এমন মনের মত ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন।।
সারা গগন তলে
তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ,
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন।।
ওরে বকুল, ওরে পারুল, শাল পিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় করে
তোরা দাঁড়াসনে ভিড় করে
চাইনে এমন গন্ধ রঙের বিপুল আয়োজন।
অকূল অবকাশে
যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
দে আমাদের একটি এমন গগন-জোড়া কোণ
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন।।

ধা না II না -া | র্সা র্রা র্রনা -া I র্সা -া | -া র্সা র্সা -া I

ও রে ব – কু ল্ পা – রু ল্ – ও রে –

না -া | র্রা র্রর্সা ণা -া I ধা -া | -া -া -া -ণা I পা -া |

শা ল্ পি য়া লে র ব – – – – ন্ কো ন্

ধা ণা র্সা -া I ণা র্সা | -া ণা ধা -া I পা ধা | -া ণা র্সা র্রা I
খা নে আ জ পা ই – এ ম ন্ ম নের – ম তো –

ণা -র্সা | -া ণা ধা -া I ধা ণা | ণা -া ধা -া I পা -া |
ঠাঁ ই – যে থা য় ফা – গু ন ভ – রে –

-া মপা ধপা মপা I মগা -া | -া -া -া -া I মা মা |
– দে – – ব – – – – – দি য়ে

ধা পা পা ণা I ণধা -া | -া ধা ধা ণা I পা ধা | -া না না -া I
– স ক ল্ ম ন – দি য়ে – আ মা র স ক ল

র্সা -া | -া ধা ধা না II
ম – ন্ ও রে –

II র্মা র্মা | -া র্জ্জা র্জ্জা -া I র্রা র্জ্জা | -া র্রা র্জ্জা -া I র্জ্জর্মা র্জ্জা |
সা রা – গ গ ন্ ত লে – তু মু ল র ঙে

-া র্রা র্রা র্জ্জা I র্রা র্সা | -া -া -া -া I না র্সা | -া র্রা র্রর্সা -া I
র কো লা – হ লে – – – – মা তা মা তি র্

ণা -া | র্সা ণা ধা ণা I পা ধা | -া না না -া I র্সা -া |
নে ই যে বি রা ম্ কো থাও – অ নু – ক্ষ –

-া ণ ধা -া I ধা ণা | ণা -া ধা -া I পা -া | -া মপা -ধপা
ণ যে থা য় ফা – গু ন্ ভ – রে – – দে –

মপা I মগা -া | -া -া -া -া I মা মা | -ধা ধপা পা ণা I
– ব – – – – – দি য়ে – স ক ল্

ধা -া | -া ধা ধা -ণা I পা ধা | -া না না -া I র্সা -া |
ম — ন দি য়ে — আ মা র স ক ল ম —

-া সা সা মা I মা -া | মা -া মা -া I মা -া | -া না মা -া I
ন্ ও রে — ব — কু ল্ পা — রু — ল্ ও রে —

মা -া | মা মা গা -মা I মা গা | -া -া -া -া I
শা ল্ পি য়া লে র ব ন ‖ — — — —

মা মা | পা পা পা -া I পা পা | -া পা পা -া I
আ কা শ্ নি বি ড়্ ক রে — তো রা —

পা পা | ধা ধা ধা -া I ধা ধা | -া ধা ধা ণা I ণর্রা -া |
দাঁ ড়া স্ নে ভি ড়্ ক রে — আ মি — চা ই

-া র্সা -া -া | ণা র্সা | -া র্সণা -া ধা I র্রা -া | র্রা র্সা র্সা -া I
— নে — — চা ই — নে — — চা ই নে এ ম ন্

ণা -া | র্সা ণা ধা ণা I পা ধা | -া না না র্সা I র্সা -া |
গ ন্ ধ র ঙে র্ বি পু ল আ য়ো — জ ন

-া -া -া -া I ধা ধা | -া ধা ধা না I না র্সা | -া র্সা মা -া I
— — — — অ কু ল্ অ ব — কা শে — যে থা য়্

র্সার্মা -া | র্মা র্মা র্সা -া | র্মা র্মা | -া র্জ্ঞা -া -া I র্মা -া |
স্ব প ন্ ক ম ল্ ভা সে — — — — দে —

র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা -া I র্রা -া | র্জ্ঞা র্রা র্সা র্রা I না র্সা | -া র্রা র্সা র্রা I
আ মা দের — এ ক্ টি এ ম ন্ গ গ ন্ জো ড়া —‖

না র্সা | -া ণা ধা -া I ধা ণা | ণা -া ধা -া I পা -া |
কো — ণ্ যে থা য় ফা — গু ন্ ভ — রে —

-া মপা -ধপা -মপা | মগা -া | া- -া -া -া I মা মা | ধা
– দে – – ব – – – – – দি য়ে –

ধপা পা ণা I ধা -া | -া ধা ধা ণা I পা ধা | -া না না র্সা I
স ক ল্ ম – ন দি য়ে – আ মা র স ক ল

র্সা -া | -া ধা ধা না I না -া | র্সা র্রা র্না -া I
ম – ন্ ও রে – ব – কু ল পা –

র্সা -া | -া -া -া -া II
রু ল্ – – – –

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন
আমলকির ঐ ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে।
শূন্য করে ভরে-দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোয়াবার সময় আমার
হবে কখন কোন সকালে!

II র্গা র্গা -া | র্গর্রা র্সা -া I র্না -া র্সা | র্সর্রা র্রর্সা -া I পা -া ক্ষা |
শী তে র হাও য়া য় লা গ্ ল না চ ন লা গ ল

ক্ষধা ধপা -া I পা -া মা | গা গধা -া I গা গা মা | মা পা -া I
না চ ন্ আ ম্ ল কির ও ই ডা লে – ডা লে –

ক্ষা পা -া | ধা না -া I নর্সা -া র্রা | র্রা র্গা -া I র্সর্গা -া র্গা |
পা তা – গু লি – শি র শি রি য়ে – শি র্ শি

র্গা র্গা -া I র্গর্রা র্রা র্রা | র্রর্সা র্সা -া | র্সনা না -া | ধা পা -া II
রি য়ে – ঝ রি য়ে দি ল – তা লে – তা লে –

II { ক্ষা ক্ষা পা | ধা না -া I র্সা র্রা -া | র্রা র্গা -া I -া -া -া | -া -া -া I
উ ড়ি য়ে দে বা র্ মা ত ন্ এ সে – – – – – – –

র্গার্পা র্পা -া | র্পর্মা র্গা -া I
কা ঙা ল্ তা রে –

র্গর্রা -া র্মা | র্মর্গা র্রর্সা -া I -া -া -া | -া -া -া } I
ক র্ ল শে ষে – – – – – – –

পা পা -া | পক্ষা পা -া I ক্ষা পা -া | পধা ধপা -া I পক্ষা -া পা |
ত খ ন তা হা র্ ফ লে র বা হা র র ই ল

ধা না র্সা I র্সা র্গা র্গা | র্গর্রা র্সা -া II
না আ র অ ন ত রা লে –

II পা -া পা | পক্ষা পা -া I পধা ধপা -া | মা গা মা I রা গা -া |
শূ – ন্য ক রে – ভ রে – দে ওয়া – যা হা র

মা পা -া | রা গা -া | মা পা -া I -া -া -া | -া -া র্সা I
খে লা – তা রি – লা গি – – – – – – –

নর্সা -া র্সনা | ধা পা -া I -া -া -া | -া -া -া I পধা ধপা -া |
র ই নু ব সে – – – – – – – স ক ল্

মা গা মা I ৱা গা -া | মা পা -া I { ক্ষা পা -া | ধা না -া I
বে লা – তা রি – লা গি – { শী তে র প র শ

র্সা র্রা -া | র্রা র্গা -া I -া -া -া | -া -া -া I র্গা র্পা র্পা |
থে কে – থে কে – – – – – – – যা য় বু

পর্মা র্গা -া | র্রা র্রার্মা | র্মর্গা র্রর্সা -া } I পা -া পা | পক্ষা পা -া I
ঝি ঐ – ডে কে – ডে কে – } স ব্ খো য়া বা র্

পক্ষা পা -া | পধা ধপা -া I ক্ষা পা -া | ধা না র্সা I
স ম য়্ আ মা র্ হ বে – ক খ ন

র্সা র্গা র্গা | র্গর্রা সা -া II
কো ন্ স কা লে –

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয়রে চলে।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে।।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে।।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে
আকাশ খুসি হোলো।
ঘরেতে আজ কে রবে গো,
খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ঐ যে উথলে।।

।। ধ্বা সা -া | সা সা ৱা I গা পা পা | পা মা মপা I গা -া সা
পৌ ষ – তো দে র ডা ক দি য়ে ছে – আ য় রে

॥
রা গা মা I রগা -া -া | রা -া গরা I সা -া -া | -া -া -া I
চ লে – আ য়্ – আ – য়্ আ য় – – – –

গপা পা -া | পা পা -া I ক্মা পা -া | ধা না -া | পা পা না |
ডা লা – যে তা র্ ভ রে – ছে আ জ্ পা কা –

ধা ধা নধা I পা ধা পা | মা গা রসা I সা -া রা | রগা -া রা I
ফ স – লে – – ম রি – হা – য়্ হা য়্ –

রসা -া -া | -া -া -া II
হা য়্ – – – –

॥ পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা নর্রা র্সা | র্সা র্সা -র্রর্সা I
হাও য়া র নে শা য়্ উ ঠ্ ল মে তে –

র্গনা -া র্সা | র্গনা ধা ন পা পা ধা | ধা না -া I -া -া -া |
দি গ্ ব ধূ রা – ধা নে র খে তে – – – –

-া -া -া I পা ধা -া | র্সা না -া I ধা পা পা | ধা পা -া |
– – – রো দে র সো না – ছ ড়ি য়ে প ড়ে –

পা পা না | ধা ধা নধা | পা ধা পা | মা গা রসা I
মা টি র আঁ চ – লে – – ম রি –

সা -া রা | রগা -া রা I সা -া -া | -া -া -া II
হা – য়্ হা য়্ – হা য়্ – – – –

॥ গপা পা -া | পা পা -া I ক্মা পা -া | ক্মা পা -া I পনা না -া |
মা ঠে র বাঁ শি – শু নে – শু নে – আ কা শ্

না ধা না | ধা পা -া | -া -া -া I পা ধা -া | র্সা না -া I
খু শি – হো লো – – – – ঘ রে – তে আ জ

পা -া ধা | না ধা না I ধপা -া -া | পা পা -া I গপা পা -া |
কে – – র বে – গো – – খো লো – খো লো –

পা পা -া | ক্সা পা -া | ধা না পা | না না -া | না ধা না |
দু য়া র্ খো লো – খো লো - খো লো – দু য়া র

পধা পা -া | -া -া -া | পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া |
খো লো – – – – আ লো র্ হা সি –

র্সা নর্রা র্সা | র্সা র্সা র্রর্সা | না র্সা -া | না ধা না I পা পা ধা
উ ঠ্ ল জে গে – ধা নে র শি ষে – শি শি র

ধা না -া I -া -া -া | -া -া -া I পা ধা -া | র্সা না -া I
লে গে – – – – – – – ধ রা র খু শি –

ধা ধা না | ধা পা -া I পা না না | ধা ধা না | নপা ধা পা |
ধ রে – না গো – ঐ – যে উ থ – লে – –

মা গা রসা | সা -া রা | রগা -া রা | সা -া -া | -া -া -া |
ম রি – হা – য়্ হা – য়্ হা য়্ – – – –

আয়রে মোরা ফসল কাটি।

মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
মোরা নেব তারি দান
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি।
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
রোদ এসেছে সোনার যাদুকর।

শ্যামে সোনায় মিলন হোলো মোদের
মাঠের মাঝে,
মোদের ভালবাসার মাটি যে তাই সাজল
এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি।।

II সা -জ্ঞা জ্ঞা | -া জ্ঞা রা I মজ্ঞা -া -া | -া ঋা -সা | সমা জ্ঞা -া |
আ য় রে — মো — রা — — — — — ফ স ল্

রা জ্ঞা -া I সজ্ঞা ঋা -া | সা ণ্দা -া I দা জ্ঞা জ্ঞা | -া ঋা -া I
কা টি — ফ স ল্ কা টি — ফ — স ল্ কা —

সা -া -া | -া -া -া || সা -া সা | সা সা ঋা | জ্ঞা -া -া | মা -া পা |
টি — — — — — মা ঠ আ মা দে র্ মি — — তা — —

জ্ঞমা -া -া | — — — জ্ঞা ঋা মা I — — —

মা মা -া I মা ণা দা | পা মা জ্ঞা | রা মজ্ঞা -া | রা জ্ঞা সা I
ও রে — আ জ তা রি স ও গা তে — মো দে র্

সা সা জ্ঞা | জ্ঞা -া -রা I রমা মজ্ঞা -া | ঋা সা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া |
ঘ রে র্ আ — — ঙ — ন্ মো দে র ঘ রে র্

জ্ঞরা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I জ্ঞমা -া মা | জ্ঞা ঋা জ্ঞা I
আ ঙ ন্ সা রা — ব ছ র্ ভ র্ বে দি নে —

ঋা সা -া | ণ্া দা -া I দা -জ্ঞা জ্ঞা | -া জ্ঞঋা -া I সা -া -া |
রা তে — মো দে র্ ঘ — রে র্ আ — ঙ — ন্

সা সা -া I সা সা দা | দা দা -া I পা -া -া | -া -া -া I
মো রা — নে ব — তা রি — দা ন্ — — — —

পা ণা ণা | ণপা দা পা I পমা -া -া | -া -া -া I মা দা পা |
তা ই যে কা টি - ধা - - ন্ - - তা ই যে

মা জ্ঞা রা I জ্ঞা -া -া | -া -া -া I জ্ঞা -দা পা | মা জ্ঞা -া I
গা হি - গা ন্ - - - - তা ই যে সু খে -

রা জ্ঞা -া ¦ ঋা সা -া I সমা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I সজ্ঞা ঋা -া |
খা টি - মো রা - ফ স ল্ কা টি - ফ স ল্

সা দা -া I দা জ্ঞা জ্ঞা | -া ঋা -া I সা -া -া | -া -া -া I
কা টি - ফ - স ল কা - টি - - - - -

II দা দা মা | দা দা ণা I ণা ণা সা | সা সণা সা I সদা দা -া |
বা দ ল্ এ সে - র চে - ছি ল - ছা য়া র্

ণা ণা দণা I ণসা -া -া | -া -া -া I সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞরা মজ্ঞা ঋা I
মা য়া - ঘ - র্ - - - রো দ্ এ সে ছে -

সা সা ঋা | জ্ঞা জ্ঞঋা -া I ঋসা -া রা | জ্ঞা মা -া I সা সা ঋা |
সো না র্ জা দু - ক র - ও সে - সো না র

জ্ঞা জ্ঞঋা -া I ঋসা -া -া | -া -া -া I সা সা -া | সা সা ঋা I
জা দু - ক - - - - র্ শ্যা মে - সো না য়্

জ্ঞা -া -া | মা -া পা I জ্ঞমা -া -া | জ্ঞঋা সা -া I সা সা -া |
মি - - ল - - ন্ - - - - - শ্যা মে -

সা সা ঋা I জ্ঞা জ্ঞা মা | মা মা -া I মদা দা -া | পা মা জ্ঞা I
সো না য়্ মি ল ন্ হো লো - মো দে র্ মা ঠে র্

রা জ্ঞা -া ঋা সা -া | সা সা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I জ্ঞা -া র্রা |
মা ঝে - মো দে র ভা ল - বা সা র্ মা - -

নজ্ঞা -া -া I -া -া -া | ঋা সা -া I সা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I
টি – – – – – মো দে র্ ভা ল – বা সা র্

জ্ঞরা নজ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I জ্ঞা মা মা | জ্ঞা ঋা জ্ঞা I ঋা সা -া |
মা টি – যে তা ই সা জ্ ল এ ম ন্ সা জে –

ণ্া দ্া -া | দ্া দ্া জ্ঞা | ঋা ঋা জ্ঞা I জ্ঞঋা সা -া | -া সা সা I
মো দে র্ ভা ল্ – বা সা র্ মা টি – – মো রা

সদা দা -া | দা দা -া I পা -া -া | -া -া -া I পা ণা ণা |
নে ব – তা রি – দা ন্ – – – – তা ই যে

ণপা দা -পা I পমা -া -া | -া -া -া I মা -দা পা |
কা টি – ধা – – – – ন্ তা ই যে

মা জ্ঞা রা I জ্ঞা -া -া | -া -া -া I মা দা পা | মা জ্ঞা -া I
গা হি – গা – – ন্ – – তা ই যে সু খে –

জ্ঞরা মজ্ঞা -া | ঋা সা -া I সমা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I
খা টি – মো রা – ফ স ল্ কা টি –

সজ্ঞা ঋা -া | সা দা -া I দা -জ্ঞা জ্ঞা | -া ঋা -া I
ফ স ল্ কা টি - ফ – স ল্ কা -

সা -া -া | -া -া -া II
টি - - - - -

চল্‌ চল্‌ খেলি চল্‌ ফুটবল সকলে
বুট সার্ট হাফ্‌ প্যাণ্ট বল নিয়ে বগলে।
ধাই করে মারি বল
এই বুঝি হয় গোল
চারিদিকে ঘন ঘন হাততালি জয় রোল
হাততালি জয় রোল।

বিপক্ষ পারিবেকি মোদের এই ভারি বুট
কাছে তেড়ে আসতেই ধাই করে মারি সুট।
তারপরে হেড্ করি হো হো ভারি মজা ভাই
খেলা শেষে ফিরে আসি মোরা সব কজনায়।।

II সা -া সা -া | রা রা রা -া | রা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা র্রা -া |
চ ল্ চ ল্ খে লি চ ল্ ফু ট ব ল স ক লে -

রা -া ণা -া | পা -া ধা -া | মা -া পা মা | জ্ঞা -া রা -া |
বু ট সা র্ট হা ফ্ প্যা ণ্ট ব ল নি য়ে ব গ লে -

রা -া ণা -া | ধা -া ণা ধা | পা -া ধা পা | মা গা মা -া |
ধা ই ক রে মা রি ব ল এ ই বু ঝি হ য় গো ল্

মা -া মা -া | পা মা জ্ঞা রা | রা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা রা -া |
চা রি দি কে ঘ ন ঘ ন হা ত তা লি জ য় রো ল

রা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা রা -া II
হা ত তা লি জ য় রো ল্

II সা সা - সা | রা রা রা রা | রা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা রা -া |
বি প - ক্ষ পা রি বে কি মো দের এ ই ভা রি বু ট্

সা সা সা সা | রা রা রা রা | রা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা রা -া |
কা ছে তে ড়ে আ স তে ই ধা ই ক রে মা রি সু ট্

রা -া ণা -া | ধা ধা ণা ধা | পা পা ধা পা | মা গা মা -া |
তা র প রে হে ড্ ক রি হো হো ভা রি ম জা ভা ই

মা মা মা মা | পা মা জ্ঞা রা | রা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা রা -া |
খে লা শে ষে ফি রে আ সি মো রা স ব ক জ না য়

রা জ্ঞা মা পা | মা জ্ঞা রা -া II
মো রা স ব ক জ না য়

চল ভাই যাই জল আনি যাই
কলসী কাখে জল আনি যাই
নলিনী অলসে মুদিল হেরোগো
চল চল ত্বরা ভাই জল আনি যাই।

ছল ছল ছল ছল নদী জল নাচে
মলয় সমীরণ সুন্দর নাচে
হেরিয়ে সে শোভা নাচিবে হরষে
কলসী বিভঙ্গে তরঙ্গ রঙ্গে।

কুলু কুল্ কুলু কুল্ কুলু কুল তানে
গাহিবে তটিনী সুন্দর তানে
শুনিয়া সে গীতি ঠুনু ঠুনু বাজিবে
কঙ্কণ হাতে কলসের সাথে।

II সা ন্‌া সা া- | রা -া -া -া | রা জ্ঞা মা জ্ঞা | রা -া -া -া |
চ ল ভা ই যা ই - - জ ল্ আ নি যা ই - -

রা - পা - | মা - পা - | মা জ্ঞা রা সা | রা -া -া -া |
ক ল সী - কা - খে - জ ল আ নি যা ই - -

রা -া ণা -া | ধা -া ণা ধা | পা -া ধা পা | মা গা পা -া |
ন লি নী – অ ল সে – মু – দি ল হে রো গো –

মা জ্ঞা রা সা | রা জ্ঞা পা -া | মা জ্ঞা রা সা | রা -া -া -া II
চ ল চ ল ত্ব রা ভা ই জ ল আ নি যা ই – –

II সা ন্‌া সা -া | রা সা রা -া | মা গা মা -া | পা -া পা -া |
ছ ল ছ ল্ ছ ল ছ ল্ ন দী জ ল্ না – চে –

রা রা ণা ণা | ধা -া পা -া | মা -া রা পা | পা -া পা -া |
ম ল – য় স মী র ণ সু ন্ দ র না – চে –

পা মা জ্ঞা রা | সা -া সা -া | রমা -া মা মা | রপা -া পা -া |
হে রি য়ে সে শো – ভা – না – চি বে হ র ষে –

পা মা জ্ঞা রা | সা -া সা -া | রা মা -া জ্ঞা | রা -া সা -া | II
ক ল সী বি ভঙ্ গ্ গে – ত রঙ্ – গ র ঙ্ গে –

II সা ন্‌া সা -া | রা সা রা -া | মা পা মা -া | পা -া পা -া |
কু লু কু ল্ কু লু কু ল্ কু লু কু ল্ তা – নে –

রা রা ণা ণা | ধা -া পা -া | মা -া রা পা | পা -া পা -া |
গা হি – বে ত টি নী – সু ন্ দ র তা – নে –

পা মা জ্ঞা রা | সা -া সা -া | রমা -া মা মা | রপা -া পা -া |
শু নি য়া সে গী – তি – ঠুঁ নু ঠুঁ নু বা জি বে –

পা মা জ্ঞা রা | সা -া সা -া | রা মা -া জ্ঞা | রা -া সা -া II
ক ঙ্ ক ণ হা – তে – ক ল সে র সা – থে –

ঐ শোন ডাকছে কোকিল
কি মধুর মনোহর
গুণ আছে বলে তারে
সবাই এত আদর করে
গুণের জোরে কাল কোকিল
সবার কাছে পায় আদর।।

II র্সা -া | না ধপা পা | -া না | ধা না -া |
ঐ – শো ন ডা ক্ ছে কো কি ল্

পা পা | গা পা গা | মা গা | রা সা -া |
কি ম ধু র ম – নো হ র –

পা পা | না না র্সা | র্রা র্গর্রা | র্সনা সা -া |
গু ণ আ ছে ব লে – তা রে –

র্সা র্গা | র্রা র্মা র্গা | র্রর্সা না | র্সা না -া |
স বাই এ ত আ দ র ক রে –

র্সা র্সা | না ধপা পা | না ধা | না -া -া |
গু ণের জো রে কা ল কো কি ল্ –

'পা পা | গা পা গা | মা গা | রা সা -া II
স বার কা ছে পা য় আ দ র —

বল দেখি ভাই এমন করে ভুবন কেবা গড়িলরে
গগন ভরে তারার মাণিক ছড়ায়ে কে রাখিলরে।
উজল উষায় আলোর খেলা তাহে মোহন মেঘের মেলা
নবীন রবি শোভন শশী হেরে নয়ন ভুলিলরে।
শীতল পবন বহে ধীরে দোলা দিয়ে নদী নীরে
দুলিয়ে কমল বকুল ফুলে সুবাস নিয়ে যায়গো হরে।
সুধায় সুখে শোভায় সুরে কে রাখিল ভুবন পুরে
এমন দয়াল বল কে ভাই দেহে জীবন যে দিলরে
দয়াল আমায় দয়া করে ধরায় জনম দিলেন মোরে
মায়ের পরাণ দিলেন দয়াল গলায়ে ভাই আমার তরে
দয়ার ত নাই তুলনারে দয়ালকে ভাই ভুলোনারে
দয়াল মোদের বাসেন ভালো দয়াল বল বদন ভরে।

II ধ্‌া — ধ্‌া | সা সা রা | গা গা -া | গা পা -া |
ব ল্‌ দে খি ভা ই এ ম ন ক রে -

গা গা রা | সা সা রা | গা গা মগা | রা সা -া |
ভু ব ন কে বা - গ ড়ি - ল রে -

গা গা পা | পা পা -া | ধা ধা নধা | পন্ধা পা -া |
গ গ ন ভ রে - তা রা র মা ণিক্‌ —

গা গা মগা | রা সা রা | গা গা মগা | রা সা -া |
ছ ড়া - য়ে কে - রা খি - ল রে -

গা গা -া | পা পা ধা | র্সা র্সা -া | না র্সা -া |
উ জ ল উ ষা য় আ লো র খে লা -
সু ধা য় সু খে - শো ভা য় সু রে -
দ য়া র ত না ই তু ল - না রে -

না না র্সনা | ধা পা ধা | না না র্সনা | ধা পা -া |
তা হে - মো হ ন মে ঘে র মে লা -
কে - - রা খি ল ভু ব ন পু রে -
দ য়া ল্‌ কে ভা ই ভু লো - না রে -

গা গা পা | পা পা -। | ধা ধা নধা | পন্মা পা -। |
ন বী ন র বি - শো ভ ন শ শী -
এ ম ন দ য়া ল্ ব ল - কে ভা ই
দ য়া ল মো দে র বা সে ন ভা লো -

গ গা মগা | রা সা রা | গা গা মগা | রা সা -। |
হে রে - ন য় ন ভু লি - ল রে -
দে হে - জী ব ন যে দি - ল রে -
দ য়া ল ব লো - ব দ ন ভ রে -

সা সা -। | সা সা রা | গা গা মগা | রা সা -। |
দ য়া ল আ মা য় দ য়া - ক রে -
শী ত ল প ব ন ব হে - ধী রে -

ধ্া ধ্া সা | সা সা রা | গা গা পা | গা গা -। |
ধ রা য় জ ন ম দি লে ন মো রে -
দো লা - দি য়ে - ন দী - নী রে -

গা পা -। | পা পা -। | ধা ধা নধা | পন্মা পা -। |
মা য়ে র প রা ণ দি লে ন দ য়া ল
দু লি য়ে ক ম ল ব কু ল ফু লে -

গা গা পা | পা পা -। | গা রা গা | রা সা -। |
গ লা য়ে ভা ই - আ মা র ত রে -
সু বা স নি য়ে - যা য় গো হ রে - II

চল্, চল্, চল্,
ঊর্দ্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল্।

II সা রা মা | সা রা মা | মা -া -া | -া -া -া |
চ ল্ - চ ল্ - চ - - ল্ - -

মা ধা ধা | মা ধা ধা | মা ধা ধা | ণা -া পা | -
উ র ধ গ গ নে বা জে মা দ ল্ -

গা -া পা | গা পা পা | গা পা পা | ধা -া মা |
নি য় নে উ ত লা ধ র ণী ত ল্ -

মা ধা ধা | মা ধা ধা | মা ধা ণা | র্সা -া -া |
অ রু ণ প্রা তে র ত রু ণ দ ল্ -

র্রা র্সা ণা | ধা পা মগা | মা -া -া | র্রা -া -া |
চ ল্ রে চ ল্ রে চ - - - - ল্

র্রা র্সা ণা | ধা পা মগা | মা -া -া | মা -া -া |
চ ল্ রে চ ল্ রে চ - - ল্ - -

মা -া -া | মা -া -া | মা -া -া | -া -া -া II
চ - ল্ চ - ল্ চ - ল্ - - -

(উর্দ্ধ গগনে ইত্যাদি)

ফুলের পোষাক পরব আমায় সাজিয়ে দে মা ভাল করে
নেচে নেচে করব খেলা পোষাক পরে বনের ধারে
পড়ব হাতে ফুলের মালা
পড়ব গলায় ফুলের মালা
ধরব মাথায় ফুলের ডালা
ফুল বিলাবো ঘরে ঘরে।

II মা মা -া | মা মা -া | গা পা মা | -া মা মা |
ফু লে র পো ষা ক প র ব — আ মায়

গা মা গা | রা -া সা | সা গা রা | গা -া -া |
সা জি য়ে দে — মা ভা ল ক রে — —

সা সা -া | ন্া ন্া -া | সা সা -া | রা রা -া |
নে চে — নে চে — ক র ব খে লা —

ন্া সা -া | রা গা মা | রা পা মা | গা -া -া |
পো ষা ক প রে — ব নের ধা রে — — II

II পা পা -া | হ্মা পা -া | হ্মা পা -া | হ্মা পা -া |
প র ব হা তে — ফু লে র মা লা —

ন্া -া সা | রা গা মা | রা পা মা | গা -া -া |
প র ব গ লা য় ফু লের মা লা — —

পা পা -া | হ্মা পা -া | হ্মা পা -া | হ্মা পা -া |
ধ র ব মা থা য় ফু লে র ডা লা —

ন্া -া সা | রা গা মা | রা পা মা | গা -া -া |
ফু — ল বি লা বো ঘ রে ঘ রে — — II

(১ম) কৃষক—ছোট খাট কৃষক আমি জমিতে দিই চাষ
ধান ছোলা কলাই মটর বুনি বারমাস
হালের গরুগুলি আমি যতন করি কত
তাদের নিয়ে ক্ষেত খামারে সদাই কাজে রত।

(২য়) ঝি—আমি ওদের পুরানো ঝি হাট-বাজারে যাই
সকাল বিকাল সবায় আমি দিয়ে থুয়ে খাই
রুগীর সেবা আমার কাছে সকল সুখের সার
সদাই আমি ব্যাস্ত আছি কাজে আপনার।

(৩য়) কামার—ছোট খাট কামার আমি গড়ি কাঁচি ছুরি
সঙগীন বন্দুক তলোয়ারে দেখাই বাহাদুরি
আমার মতন ওস্তাদ এমন খুঁজে মেলাই ভার
সদাই আমি ব্যাস্ত আছি কাজে আপনার।

(৪র্থ) গোয়ালা বৌ—আমি পাড়ার গোয়ালা বউ বেড়াই দুধ দিয়ে
মাখন ছানা বেচি আমি বাড়ী বাড়ী নিয়ে
চিনি পাতা দই বসাই অতি চমৎকার
সদাই আমি ব্যাস্ত আছি কাজে আপনার।

(৫ম) পিয়ন—ছোট খাট পিয়ন আমি ঘুরি চিঠি নিয়ে
কত পার্শেল্ কাগজ কেতাব বেড়াই দিয়ে দিয়ে
পাড়ার সবাই চেনে আমায় আমার পথ চায়
সদাই কাজে ব্যাস্ত থাকি দিবসে নিশায়।

(৬ষ্ঠ) গৃহস্থ মেয়ে—আমি এক গৃহস্থ মেয়ে জল আনতে যাই
রাঁধতে বাড়তে দিতে থুতে বসতে সময় নাই
আমার কাজ গৃহস্থালী বৃহৎ পরিবার
সদাই আমি ব্যাস্ত আছি কাজে আপনার।

(৭ম) নাবিক—ছোট একটি নাবিক আমি ভাসাই জলযান
(আমি) দেশের তরে রণস্থলে দিতে পারি প্রাণ
ডরিনাকো ঝড় তুফানে কাজে যখন থাকি
দেশের মান সবার আগে সেইটি মনে রাখি।

(৮ম) সকলে—চুপটি করে শুয়ে বসে সুখের আশা করে যারা
এ জীবনে একটি দিন সুখী কভু হয় না তারা
আপন কাজে একমনেতে দিনটি যাহার কাটে ভাই
এ জগতে তাহার মত ভাগ্যবান আর কেহ নাই।

II (১) সা গা গা গা | গা মা গা রা | রা গা সা রা | রা -া -া -া |
ছো ট খা ট কৃ ষক্ আ মি জ মি তে দিই চা ষ – –

সা রা গা মা | গা রা সা ন্া | প্া প্া ন্া ন্ | সা -া -া -া |
ধা ন ছো লা ক লাই ম টর বু নি বা র মা স – –

সা গা গা গা | গা মা গা রা | গা পা মা পা | মা গা -া -া |
হা লের গ রু গু লি আ মি য তন্ ক রি ক ত – –

সা সা গা রা | সা ন্া সা ধ্া | প্া প্া ধ্া ম্া | প্া প্া -া -া |
তা দের নি য়ে ক্ষেত খা মা রে স দাই কা জে র ত – – II

II (২) গা গা গা গা | পা মা গা রা | মা গা রা সা | রা -া -া -া |
আ মি ও দের পু রা নো ঝি হাট্ বা জা রে যা ই – –

ধ্‌া ধ্‌া সা সা | ধ্‌া ধ্‌া সা সা | ৰা ৰা সা ন্‌া | সা -া -া -া |
স কাল্ বি কাল্ স বায় আ মি দি য়ে থু য়ে খা ই – –

সা সা গা গা | মা গা রা রা | গা রা সা ন্‌া | সা -া -া -া |
রু গীর সে বা আ মার কা ছে স কল সু খের সা র – –

সা সা গা রা | সা ন্‌া সা ধ্‌া | প্‌া প্‌া ধ্‌া ম্‌া | প্‌া -প্‌া -া -া II
স দাই আ মি ব্যা স্ত আ ছি কা জে আ প না র – –

(৩) II সা সা সা সা | সা ৰা সা ন্‌া | সা ন্‌া সা গা | মা গা -া -া |
ছো ট খা ট কা মার আ মি গ ড়ি কাঁ চি ছু রি – –

গা পা মা পা | গা মা রা গা | সা ন্‌া সা রা | সা সা -া -া |
স ঙ্গীন্ ব ন্দুক ত লো য়া রে দে খাই বা হা দু রি – –

সা সা গা গা | মা গা রা রা | গা ৰা সা ন্‌া | সা -া -া -া |
আ মার ম তন ও স্তাদ এ মন খুঁ জে মে লাই ভা র – –

সা সা গা ৰা | সা ন্‌া সা ধ্‌ | প্‌া প্‌া ধ্‌া ম্‌া | প্‌া -া -া -া II
স দাই আ মি ব্যা স্ত আ ছি কা জে আ প না র – –

(৪) II সা সা সা সা | সা ৰা সা ন্‌া | সা সা সা -া | সা ৰা সা -া |
আ মি পা ড়ার গো য়া লা বৌ বে ড়াই দু ধ | দি – য়ে –

সা সা সা সা | সা সা সা ন্‌া | ধ্‌া সা ন্ ন্‌া | ধ্‌া -া প্‌া -া |
মা খন ছা না বে চি আ মি বা ড়ী বা ড়ী নি – য়ে

প্‌ ধ্‌া ধা ধ্‌া | ধ্‌া ন্‌া ন্‌া না | সা সা সা সা | সা রা ন্‌া -া |
চি নি পা তা দ ই ব সাই অ তি চ মৎ কা – – র

সা সা সা সা | সা সা সা ন্া | ধ্া সা ন্া ধ্া | প্া -া -া -া II

স দাই আ মি ব্যা স্ত আ ছি কা জে আ প না র – –

(৫ম) II সা সা সা সা | সা রা সা ন্া | ধ্া ন্া সা রা | সা -া ন্া -া |

ছো ট খা ট পি য়ন আ মি ঘু রি চি ঠি নি – য়ে –

প্া ধ্া ধ্া ধ্া | ধ্া ন্া ন্া ন্া | ধ্া সা ন্া ন্া | ধ্া -া প্া -া |

ক ত পা র্শেল কা গজ কে তাব বে ড়াই দি য়ে দি – য়ে –

সা সা গা গা | মা গা রা গা | পা গা মা রা | গা -া -া -া |

পা ড়ার স বাই চে নে আ মায় আ মার প থ চা য় – –

রা গা মা পা | মা গা রা রা | গা রা সা ন্া | সা -া -া -া II

স দাই কা জে ব্যা স্ত থা কি দি ব সে নি শা য় – –

(৬ষ্ঠ) II সা সা গা গা | গা মা গা রা | গা পা মা মা | গা -া -া -া |

আ মি এক গৃ হ স্তের মে য়ে জ ল আন্ তে যা ই – –

গা গা মা গা | রা রা গা রা | সা সা রা না | সা -া -া -া |

রাঁধ তে বাড় তে দি তে থু তে বস্ তে স ময় না ই – –

সা ন্া ধ্া -া | ন্া ধ্া প্া প্া | সা সা রা ন্া | সা -া -া -া |

আ মার কা জ গৃ হ স্থা লী বৃ হৎ প রি বা র – –

সা সা রা সা | ন্া ন্া সা ন্া | ধ্া ধ্া ন্া প্া | ধ্া -া -া -া II

স দাই আ মি ব্যা স্ত আ ছি কা জে আ প না র – –

(৭ম) II গা গা মা গা | রা রা গা রা | সা সা রা ন্া | সা -া -া -া |

ছো ট এক টি না বিক্ আ মি ভা সাই জ ল যা ন আ মি

সা সা রা সা | না ন্া সা ন্া | ধ্া ধ্া ন্া প্া | ধ্া -া -া -া |

দে শের ত রে র ণ স্থ লে দি তে পা রি প্রা ণ – –

প্‌া ধ্‌া ধ্‌া ধ্‌া | ধ্‌া ন্‌া ন্‌া ন্‌া | সা সা সা সা | রা -া সা -া |
ড রি না কো ঝ ড় তু ফানে কা জে য খন থা – কি –

সা সা সা -া | সা সা সা ন্‌া | ধ্‌া সা ন্‌া ন্‌া | ধ্‌া -া প্‌া -া II
দে শের মা ন স বার আ গে সেই টি ম নে রা – খি –

(৮ম) II সা সা গা গা | মা গা রা গা | গা পা মা পা | গা পা মা গা |
চুপ টি ক রে শু য়ে ব সে সু খের আ শা ক রে যা রা

গা পা মা পা | গা মা রা গা | সা রা গা মা | গা রা সা ন্‌া |
এ জী ব নে এক টি দি ন সু খী ক ভু হয় না তা রা

সা সা গা গা | মা গা রা রা | গা রা সা ন্‌া | সা রা রা রা |
আ পন কা জে এক ম নে তে দিন্‌ টি যা হার কা টে ভা ই

প্‌া প্‌া ন্‌া ন্‌া | সা সা রা রা | সা গা রা গা | সা রা সা -া II
এ জ গ তে তা হার ম ত ভা গ্য বান আর কে হ না ই

একদিন জিভ বলে শোন ভাই
পেটটার একটুও কাজ নাই
খেটে মরি মোরা সবে হায়রে
ওযে শুধু বসে বসে খায়রে।

হাত বলে হাঁ হাঁ ভাই তাইত
পেটটার কোন কাজ নাইত
ওরি জন্যে কত কষ্ট সহিয়া
মুখে তুলে ভাত দিই বহিয়া।

পা বলিছে চড়ে মোর ঘাড়ে
ব্যথা করে দিল মোর হাড়ে
পেট যায় নেমন্তন্যে
আমি হেঁটে মরি ওর জন্যে।

আচ্ছা ভাই বল দেখি তোরা
আমি কিরে হই ওর ঘোড়া
শুনে সবাই রেগে বলে ভারী
পেটের সঙ্গে করো সবে আড়ি।
সবাই খবরদার ওর সাথে আর
কেউ করো নাকো কারবার
গলা গিলবে না ঠোঁট খুলবে না
দিবে দাঁতকপাটি হুড়্‌কা আঁটি।
খাটাখাটি হাঁটাহাঁটি যাবে মিটি
এই ভাবে দিন গেল দুই তিন
পেটে নাহি দানা পানি
সবে বলে ভাই বল নাহি পাই।
মোদের কি হল জানি
ঐযে দুষ্ট সব কৈল নষ্ট
মন্দ কথা বলে কানে
পেটে সাজা দিলে এত গোলেমালে।
পড়ে তাহা কেবা জানে
হেনমতে সবে কাঁদে উচ্চরবে
গালি দিয়ে রসনারে
মন্দ কথা ভাই শুনিতে না চাই
বলিব না কভু কারে।

II পা -া | পা -া | মা ধা | পা পা | মা মা | গা -া |
এ ক দি ন জি ভ ব লে শো ন ভা ই

সা -া | রা -া | রা গা | রা মা | গা রা | সা -া |
পে ট টা র এ ক টু ও কা জ না ই

গা গা | পা পা | পা ধা | পা ধা | নি -া | ধা -া |
খে টে ম রি মো রা স বে হা য় রে –

গা গা | পা পা | গা গা | রা রা | গা রা | সা -া II
ও যে শু ধু ব সে ব সে খা য় রে –

II গা -া | গা গা | পা পা | গা রা | গা রা | সা -া |
হা ত ব লে হাঁ হাঁ ভা ই তা ই ত – |

সা -া | রা -া | রা গা | রা গা | পা -া | পা -া |
পে ট টা র কো ন কা জ না ই ত –

পা পা | পা গা | পা পা | গা পা | ধা ধা | পা -া |
ও রি জ ন্যে ক ত ক ষ্ট স হি য়া –

গা গা | পা পা | গা -া | রা -া | গা রা | সা -া II
মু খে তু লে ভা ত দি ই ব হি য়া –

II সা ধ্া | সা সা | সা রা | সা রা | গা -া | গা -া |
পা ব লি ছে চ ড়ে মো র ঘা – ড়ে –

রা গা | পা পা | গা -া | রা -া | গা রা | সা -া |
ব্য থা ক রে দি ল মো র হা – ড়ে –

গা -া | পা -া | পা ধা | না -া | ধা -া | পা -া |
পে ট যা য় নে – ম ন্ ত – ন্যে –

গা গা | পা পা | গা গা | রা -া | গা রা | সা -া
আ মি হেঁ টে ম রি ও র জ – ন্যে –

সা সা | সা -া | সা রা | রা রা | রা -া | রা -া |
আ চ্ছা ভা ই ব ল দে খি তো – রা –

গা গা | পা পা | গা -া | রা -া | গা রা | সা -া II
আ মি কি রে হ ই ও র ঘো – ড়া –

II সা সা | সা সা | সা -া | সা -া | সা -া | সা -া |
শু নে স বাই রে গে ব লে ভা – রি –

সা রা | রা রা | রা গা | গা সা | রা -া | রা -া |
পে টের স ঙ্গে ক রো স বে আ – ড়ি –

রা রা | মা মা | সা -া | রা -া | রা মা | মা -া |
স বাই খ বর দা র ও র সা থে আ র

পা -া | পা -া | ধা -া | পা মা | রা -া | সা -া
কে উ কো – রো – না কো কা র বা র

সা সা | ন্‌া রা | সা সা | সা -া | সা রা | গা গা |
গ লা গি ল বে না ঠোঁ ট খু ল বে না

পা পা | রা রা | রা রা | গা রা | সা সা | গা গা |
দি বে দা ত ক পাটি হু ড়কা আঁ টি খা টা

পা পা | রা রা | গা গা | সা গা | রা গা | সা -া II
খা টি হাঁ টা হাঁ টি যা বে মি – টি –

II পা -া | পা -া | পা -া | গা -া | রা -া | সা -া
এ ই ভা বে দি ন হো ল দু ই তি ন

ধ্‌া ধ্‌া | সা সা | সা রা | গা রা | রা রা | রা রা |
পে টে না হি দা না পা নি স বে ব লে

রা -া | গা পা | গা -া | রা -া | রা রা | -া মা |
ভা ই ব ল না হি পা ই মো দে র কি

পা ধা | ধা ধা | না -া | না -া | র্সা না | ধা -া |
হ ল জা নি ঐ - যে - দু ষ্ট স ব

ধা ধা | না ধা | পা পা | গা পা | ধা পা | মা গা II

কৈ ল ন ষ্ট ম ন্দ ক থা ব লে কা নে

II সা রা | রা রা | পা পা | গা -া | রা -া | সা -া |

পে টে সা জা দি লে এ ত গো ল মা লে

ধ্‌া ধ্‌া | সা সা | সা গা | রগা সা | গা গা | গা গা |

প ড়ে তা হা কে বা জা নে হে ন ম তে

গা গা | গা মা | রা গা | পা পা | গা গা | পা ধা |

স বে কাঁ দে উ চ্চ র বে গা লি দি য়ে

না পা | ধা ধা | পা পা | পা পা | ধা পা | মা মা |

র স না রে ম ন্দ ক থা ভা ই শু নি

মা মা | পা মা | রা রা | গা গা | রা রা | সা -া II

তে না চা ই ব লি ব না ক ভু কা রে

ঐ এসেছে কেলো ওকে তাড়িও না ভাই
ওর চেহারাটাই বুনো ওর মনে হিংসা নাই
ওর নাই চিরুণী বুরুশ তাই ঝাকরা চুলে থাকে
কেউ দেয়না জুতো কিনে তাই পায়ে কাদা মাখে
ওর হয়নি লেখা পড়া তাই আদব কায়দা নাই
ওর মনটি কিন্তু ভাল ওকে ভুল বুঝোনা ভাই।

ঐ ঝাকড়া লোমের মাঝে ওর কোমল আঁখি দুটি
তায় সদাই হাসির খেলা আর স্নেহ থাকে ফুটি
ও কইতে নারে কথা ওর মুখে নাইকো ভাষা
তাই চোখের ভিতর দিয়ে তোমায় জানায় ভালবাসা
আহা তাড়িওনা ভাই ওকে লাঠি নিয়ে হাতে
আয় কেলো আয় তোকে দুধ দিব খেতে।

II সা সা গা রা | গা গা গা গা | পা গা মা রা | গা -া গা -া |

ঐ এ সে ছে কে লো ও কে তা ড়ি ও না ভা ই ও র

একাদশ অধ্যায়

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

আমাদের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রাথমিক শিক্ষায়তনগুলিতে অন্যান্য শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে, কি রকম ধর্ম কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, সেটাই হল এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

ধর্মে উদারতাই ভারতবর্ষের চিরন্তন রীতি। আর্য, দ্রাবিড়, শক, হূণ, কোল, কিরাত প্রভৃতি নানা সংস্কৃতির মিলন এই ভারতে ঘটেছে। খৃষ্টান, ইহুদী, পারসীরা সকলেই এদেশে এসে সাদর আশ্রয় পেয়েছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোনও কারণে, মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ ঘটলেও, মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, চিরদিনই ভারতবর্ষে বিভিন্ন ও বিচিত্র ধর্মমতাবলম্বী লোকে শান্তি ও সখ্যের সঙেগ পাশাপাশি বাস করেছেন। এখন স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই ধর্মনিরপেক্ষ সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকেই তুলে ধরতে হবে।

কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার নেতিমূলক আদর্শই যথেষ্ট নয়, কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা ক্রমে ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতায় পরিণত হতে পারে। এখন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ আচার অনুষ্ঠানগুলি বাদ দিয়ে সার্বভৌম ও সর্বজনসেব্য ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। এই ধর্মের আদর্শ হবে—

(১) বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়ে নিজের ধর্মের মূল আদর্শগুলি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সচেতনতা;

(২) পরমত-সহিষ্ণুতা এবং অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা; সর্বধর্মের মৌলিক একত্ববোধ;

(৩) সকল ধর্মের সার হিসাবে সার্বভৌম মানবধর্মের ভিত্তিস্থাপন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেমন করে সেই উচ্চ নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, সাধারণ বয়স্ক লোকের পক্ষেও যা সকল সময়ে বোঝা বা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না? বিশেষতঃ এই পুস্তিকাতে যখন, প্রধানতঃ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছয় সাত বৎসরবয়স্ক শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তখন, স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এত ছোট শিশুদের পক্ষে বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ গ্রহণ এবং বিশ্বমানবতাবোধ সম্ভবপর কিনা।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে চাই যে, এই বয়সে এত বড় আদর্শ বোঝা বা গ্রহণ করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়, কিন্তু,

(১) শিশুকাল হতে অনাড়ম্বর কিন্তু জীবন্ত, সার্বভৌম ধর্মের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হলে, শিশুরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেও তার থেকে কিছুটা গ্রহণ করে, যাতে, বয়ঃসন্ধিক্ষণে, তাদের মনোভূমি উন্নত আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু, শিশুকাল হতে ক্ষেত্র প্রস্তুত না করলে, উপযুক্ত বয়সে ধর্ম ও নীতির বীজ বপন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(২) প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও উচ্চতর শ্রেণীর ৯।১০ বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে নিজধর্ম ও পরধর্মের প্রতি সচেতন শ্রদ্ধা জাগান যায়, এবং বিশ্বমানবতাবোধের ভিত্তি স্থাপন করা যায়, যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী এবং বিভিন্ন ধর্মের সারাংশগুলি শিশুবোধ্য সরল ও সরস ভাষায় তাদের কাছে উপস্থিত করা যায়।

(৩) প্রাথমিক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ১১-১৪ বৎসরবয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য ধর্মশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে পারলে এবং উন্নত দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলে এরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এই শিক্ষা গ্রহণ করে। বস্তুতঃ, সুযোগ ও সহায়তা পেলে এই বয়সের শিশুরা নিজেরাই বিদ্যালয়ের দৈনিক প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারে এবং বিভিন্ন ধর্ম-সংক্রান্ত "দিবস"গুলি উপযুক্তভাবে উদ্‌যাপন করতে এরাই হয় প্রবীণ উদ্যোক্তা।

অন্যান্য চিত্তবৃত্তির ন্যায় ধর্মবৃত্তিও মানবমনের একটি সহজাত বৃত্তি। বয়ঃসন্ধিক্ষণে এই বৃত্তির যথার্থ উন্মেষ হয়, কিন্তু, উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে পরে এই বৃত্তি বিকৃত অথবা বিলুপ্ত হয়ে যায়। দৈহিক, মানসিক, আনুভূতিক ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ যদি না দিতে পারি তাহলে আমাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ন হবে।

কি উপায়ে এবং কি প্রণালীতে শিশুদের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক বিকাশের সহায়তা করা যেতে পারে সেই কথাই এবারে আলোচনা করব—

(১) ধর্মপুস্তক বা ধর্মোপদেশের সাহায্যে শিশুদের ধর্ম বা নীতিশিক্ষা দেওয়া যায় না। ছোট শিশুরা ধর্ম বা নীতির সারগর্ভ উপদেশ অথবা মহাপুরুষদের সমগ্র জীবনী বুঝতে পারে না। কিন্তু সরল ও সরস উপাখ্যান ও আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে মূর্তভাবে আদর্শগুলিকে উপস্থিত করলে, তারা সহজে তা গ্রহণ করতে পারে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই গল্পগুলি শিশুবোধ্য ও শিশুচিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার। উপদেশ ও নীতি-কথা যেন স্বাভাবিকভাবে গল্পের আখ্যানভাগের মধ্যেই জীবন্ত হয়ে ওঠে, হিতোপদেশ অতি প্রকট হয়ে পড়লে রস গ্রহণে বাধা জন্মাবে।

মধ্যে মধ্যে এই ধরণের গল্পকে নাটকের মধ্যে রূপদান করলে, শিশুচিত্তে তা সহজেই প্রভাব বিস্তার করে।

(২) তোতাপাখীর মতন নীতিবাক্য মুখস্থ করলেই শিশুরা নীতিবান বা সুরুচি-সম্পন্ন হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ, স্বাভাবিকভাবে যদি বা তারা নীতিবাক্যের কিছুটা মর্ম গ্রহণ করতে পারত, মুখস্ত করানোর ফলে বাক্যগুলি কেবলমাত্র একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই পর্যবসিত হয়।

উচ্চতর শ্রেণীর শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক মহাশয় প্রতি সপ্তাহে কিছুক্ষণ সময় বিভিন্ন ধর্মের সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন, ও সেই সকল নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে তাদের স্বাভাবিক-ভাবে আলোচনা করতে উৎসাহিত করতে পারেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহাপুরুষদের জন্মতিথি অথবা তিরোধান দিবস পালন উপলক্ষ্যে সেই সকল মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশাবলী পাঠ এবং আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁদের জীবনের ঘটনা ও চিত্র সংগ্রহ ক'রে অভিনয় বা প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শিশুরা রূপদান করতে পারে।

উচ্চতর শ্রেণীর শিশুরা যদি প্রাত্যহিক প্রার্থনার সময়ে এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও মহাজনবাণী হতে সহজ দুটি একটি উপদেশ পাঠ করে এবং শিশুবোধ্য ভাষায় সামান্য একটু ব্যাখ্যা করে, তাহলে নিম্নতর শ্রেণীর শিশুদের মনে তা কিছুটা রেখাপাত করতে পারে।

(৩) বিদ্যালয়ের দৈনিক প্রার্থনাসভায় এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে যে সকল ভজন ও ধর্মসঙ্গীত গাওয়া হবে তার অর্ধেক যদি অন্ততঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের বোধ-গম্য হয় তাহলে তারা সঙ্গীতের সুর ও কথার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবও কিছুটা গ্রহণ করতে পারে। এই পুস্তিকার অন্যত্র শিশুদের উপযুক্ত কয়েকটি সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হল। এই ধরণের অন্যান্য সঙ্গীতও শিক্ষক সংগ্রহ ক'রে শিশুদের শেখাতে পারেন।

(৪) ধর্ম ও নীতিশিক্ষার গোড়ার কথা হল অনুকূল আবেষ্টনী ও উপযুক্ত পরিবেশ। বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমনভাবে রচনা করতে হবে, যাতে, শিশুর অজ্ঞাতসারেও তা তার মনে প্রভাব বিস্তার করে। একটি বিশেষ নীতিশিক্ষার ক্লাসের মধ্য দিয়ে শিশুদের আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক বিকাশ সম্ভবপর নয়। বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম-পড়াশুনা যখন তার বিকাশের সহায়তা করে তখনই সেই শিক্ষা যথার্থ ফলপ্রদ হয়। গণিতের দ্বারা যাথার্থ্যবোধ, ইতিহাস শিক্ষার দ্বারা উদার মানবতা, ভূগোলের দ্বারা চিত্তের বিশালতা, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সততা ও সমদর্শিতা এবং কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পরস্পর প্রীতি ও সহযোগিতা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর

শিশুরা এসকল সম্পূর্ণভাবে শিখে নিতে পারবে না। কিন্তু বিদ্যালয়ের আবেষ্টনী যদি তাদের মনে অবচেতনভাবে শিশুকাল হতে কাজ করতে থাকে, তাহলে ক্রমে তাদের ধর্ম ও নীতিশিক্ষা সুসম্পূর্ণ হতে পারে।

(৫) ধর্ম ও নীতিশিক্ষার আরো একটি মস্ত বড় কথা হল উপযুক্ত দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ। যে সকল উন্নত আদর্শ শিক্ষক মহাশয় শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান তা যদি তিনি নিজে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারেন এবং নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম-আচার-আচরণে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তাহলে শত চেষ্টাতেও তিনি শিশুদের মনে সেই আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারবেন না। কিন্তু, তাঁর নিজের জীবন যদি সেই আদর্শ অনুসারে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে শিশুদের জীবনেও তা প্রতিফলিত হবে। কারণ ধর্ম ও নীতির গোড়ার কথাটাই হচ্ছে "শেখা" নয়, "জানা" নয়, এমন কি "করা"ও নয়—কিন্তু "হওয়া"।

(৬) কেবলমাত্র শিক্ষক মহাশয়ের সৎ দৃষ্টান্ত এবং বিদ্যালয়ের উন্নত পরিবেশই যথেষ্ট নয়। যেহেতু দিনরাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময়ই শিশু নিজ গৃহে কাটায়। শিক্ষক মহাশয়কে শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে গৃহ-পরিবেশের উন্নতিসাধন করতে হবে এবং গৃহের মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব জাগাতে চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ের উৎসবাদিতে শিশুদের অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করলে এবং মহাপুরুষদের দিবস এবং বিভিন্ন ধর্মের দিবসগুলি তাঁদের সঙ্গে মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করতে পারলে একাজ সহজ হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে পিতামাতা শিশুর কল্যাণকামী—কেবলমাত্র অজ্ঞতা অথবা সঙ্কীর্ণতাবশতঃ তাঁরা সকল সময়ে শিশুদের প্রকৃত কল্যাণের পথে চালিত করতে পারেন না। উপদেষ্টার মতন না গিয়ে শিক্ষক মহাশয় যদি দরদী বন্ধুর মতন প্রত্যেকটি শিশুর বাড়িতে যান তাহলে তাঁদের প্রীতি ও সহানুভূতি তিনি নিশ্চয়ই লাভ করতে সমর্থ হবেন। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত যথার্থ উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসাবে শিশুকে গড়ে তুলবার গুরু-দায়িত্বপূর্ণ সুকঠিন কাজে তিনি শিশুর পিতামাতার সম্পূর্ণ সহায়তা পাবেন।

(৭) শিক্ষক মহাশয়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও মহাজনবাণী হতে কিছু কিছু অংশ এই প্রবন্ধের শেষে লিপিবদ্ধ করা হল। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রার্থনাসভায় এইগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাত্যহিক সমবেত প্রার্থনাটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়গ্রাহী হওয়া প্রয়োজন। একটি উপযুক্ত সমবেত সঙ্গীত, কোনও শিক্ষক বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু কর্তৃক একটি মহাজন-বাণী পাঠ ও এক মিনিট কাল সমবেতভাবে নীরব প্রার্থনা—এই হলেই যথেষ্ট। কিন্তু, প্রথম শ্রেণী হতেই শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে যেন এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি যথাযোগ্য নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

খৃষ্ট ধর্ম

দীনেরাই ধন্য কারণ তাহাদের জন্যই স্বর্গরাজ্য। শোকার্তেরা ধন্য কারণ তাহারাই সান্ত্বনা পাইবে। বিনীতেরা ধন্য কারণ তাহারাই পৃথিবীর অধিকারী হইবে। ধর্মের জন্য ক্ষুধিত ও ক্ষুধিতেরা ধন্য কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়াবানেরা ধন্য, তাহারা দয়া পাইবে। নির্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। শান্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। ধর্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য, কারণ তাহাদেরই স্বর্গরাজ্য। (Matt., 5, 3-10.)

অত্যাচারীর প্রতি প্রতি-অত্যাচার করিও না। (Matt., 5, 39.)

স্বর্গস্থ পিতার মত তোমরাও নিষ্কলুষ ও পূর্ণ হও। (Matt., 5, 46.)

যদি চাহিতে জান তবে পাইবে। যদি খুঁজিতে জান তবে লাভ করিবে। আঘাত করিলেই দ্বার উন্মুক্ত হইবে। (Matt., 7, 8.)

অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহার চাও সেইরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতিও তুমি করিও। (Matt., 7, 12.)

স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছানুসারে কার্য যে করে সেই জনই আমাদের ভাই, ভগ্নী ও মাতা। (Matt., 12, 50.)

স্বর্গরাজ্য সর্ষপবীজের মতই ক্ষুদ্র।......বড় হইলে ইহাই বৃক্ষ হয়, ইহাতে পক্ষীরা আশ্রয় পায়। (Matt., 13, 31-32.)

সর্ষপ কণাটির সমান বিশ্বাস থাকিলেও পর্বতকে টলাইতে পারা যায়। বিশ্বাসের কাছে কিছুই অসম্ভব নাই। (Matt., 17, 20.)

হৃদয় পরিবর্তন করিয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত না হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিশুর ন্যায় নিজেকে নম্র করিলেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। (Matt., 18, 3-4.)

সকল হৃদয় দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাস। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর। ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। (Matt., 22, 36-39 ; Luke, 10, 27.)

পরের ছোট দোষও দেখিতে পাও। নিজের মহৎ দোষও দেখ না। (Luke., 6, 41.)

যে ঈশ্বরের আজ্ঞা শোনে এবং পালন করে সেইজনই ধন্য। (Luke, 11, 28.)

নবজন্ম লাভ না করিলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। (John, 3, 3.)

ঈশ্বর ভাবস্বরূপ (spirit) ভাবে এবং সত্যেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয়। (John, 4, 24.)

সত্যকে জান। সত্যই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে। (John, 8, 32.)

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলিলে, কে আর শত্রু হইতে পারে? (Rom, 8, 31.)

যদি দীনদুঃখীর উদর পূরণের জন্য সর্বস্বও দান করি, শরীরও দান করি, তবুও দাক্ষিণ্য (charity) ও প্রীতি না থাকিলে কোনো লাভ নাই। (I. Cor., 13, 3.)

অক্ষরগত শাস্ত্রে ও ভাষায় (letter) প্রাণ নাই। ভাব ও প্রীতিই (spirit) প্রাণ দিতে পারে। (II, Cor., 3, 6.)

বিশ্বাসই আমাদের চালাইতে পারে, চক্ষু পারে না। (II, Cor., 5, 7.)

প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, ভদ্রতা, কল্যাণশীলতা, বিশ্বাস, নম্রতা, সংযম, সবই প্রাণময় ভাবেরই (spirit) ফল। (Gal., 5, 22-23.)

কল্যাণকর্মে যেন কখনো ভ্রান্ত না হই। (Gal., 6, 9.)

তোমারও প্রভু আছেন, ইহা বুঝিয়া আপনার ভৃত্যগণকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য দান কর। (Col., 4, 1.)

বিচার করিয়া দেখ। বিচারে যাহা মনে হয় ভাল তাহাতেই দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাক। (I. Thess., 5, 21.)

(৭) ৯ বড়দের পিতামাতার ন্যায় সম্মান কর। কনিষ্ঠদের প্রতি ভাই ভগ্নীর মত শুদ্ধভাবে আচরণ কর। (I. Tim., 5, 1-2.)

অন্তরে অন্তরে যাহা আমাদের প্রার্থিত অথচ যাহা আমাদের দৃষ্টির অতীত, একমাত্র বিশ্বাসই তাহার প্রমাণ। (Hib., 11, 1.)

ভাইকে যদি বিদ্বেষ কর তবে তাহা নরহত্যার মতই অপরাধ। (I, John, 3, 15.)

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। প্রেমহীনেরা তাঁহাকে পায় না। (I, John, 4, 8.)

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। প্রেমের মধ্যে বাস করা ঈশ্বরের মধ্যে বাসেরই সমতুল্য। (I, John, 4, 16.)

প্রেমই ভয়। পূর্ণ প্রেম সকল ভয় জয় করে। উভয়ের মধ্যে গ্লানি আছে। ভয় আর প্রীতির পূর্ণতা এক কথা নয়। (I, John, 4, 18.)

যদি কেহ বলে, "আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি," কিন্তু যদি সে অপর মানুষকে বিদ্বেষ করে, তবে তাহার কথা মিছা। চোখে-দেখা আপন ভাইকেই যে ভালবাসিল না সেজন না-দেখা ঈশ্বরকে কেমন করিয়া ভালবাসিবে? (I, John, 4, 20.)

বৌদ্ধ ধর্ম

যেখানে ধর্মের অপমান হয় সেখানে থাকিও না। (ললিত বিস্তর, ৪, ১, ২১।)

ভোগসুখময় গ্রাম্য জীবন অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল। (ললিত বিস্তর, ১৮, ১, ১৬।)

নিরপরাধদের প্রতি অপরাধ করার বহু দোষ। (ললিত বিস্তর, ২১, ১৬, ৩৭।)

আত্মদীপ হও, আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও, ধর্মদীপ হও, ধর্মশরণ হও, অন্যের শরণাপন্ন হইও না। (মহা-পরিনিব্বানসুত্ত, ২, ৩২।)

কাম-রাগাদিশূন্য ও শীলব্রত হইলেই মানুষ ভিক্ষুর কাষায় বস্ত্র ধারণ করিতে পারে। (ধম্মপদ, ১০।)

পাপকারী উভয় লোকেই তাপ ভোগ করে। (ধম্মপদ, ১৭।)

পরের কৃত-অকৃত কর্ম বিচার না করিয়া আপন কৃতাকৃত বিচার কর। (ধম্মপদ, ৫০।)

পাপ প্রথমে সুখকর হইলেও পরিণামে দুঃখকর। (ধম্মপদ, ৬৯।)

তিনিই পণ্ডিত যিনি আপনাকে দমন করিতে পারেন। (ধম্মপদ, ৮০।)

সারথি যেমন অশ্বকে চালন করে তেমনি পুরুষ ইন্দ্রিয়গণকে কল্যাণার্থ চালনা করিবেন। (ধম্মপদ, ৯৪।)

অন্যকে জয় করা অপেক্ষা আপনাকে জয় করাই শ্রেয়ঃ। (ধম্মপদ, ১০৪।)

দুশ্চরিত্রের দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা শীলবানের একদিনের জীবনও ভাল। (ধম্মপদ, ১১০।)

হঠাৎ একবার কৃত হইলেও পুনঃপুনঃ পাপ করিবে না। পাপ দুঃখকর। (ধম্মপদ, ১১৭।)

সকলকে আপন মনে করিয়া আঘাত বা বধ করিবে না। (ধম্মপদ, ১২৯।)

সুব্রতগণ আপনাকে দমন করেন। (ধম্মপদ, ১৪৫।)

অসাধু ও অহিত কর্মই সহজেই করা যায়, সাধু ও হিতকর কর্ম পরম দুষ্কর। (ধম্মপদ, ১৬৩।)

হীন ধর্ম সেবা করিবে না। প্রমত্তভাবে বাস করিবে না। (ধম্মপদ, ১৬৭।)

পাপ না করা, কুশল কর্ম করা, চিত্ত নির্মল রাখা, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন। (ধম্মপদ, ১৮৩।)

আসক্তির মত অগ্নি নাই, বিদ্বেষের মত পাপ নাই। (ধম্মপদ, ২০২।)

স্বাস্থ্যই পরম লাভ, সন্তোষই পরম ধন। (ধম্মপদ, ২০৪।)

সত্য কথা বলিবে। ক্রোধ করিবে না। প্রার্থিত হইলে কিছু দিবে। (ধম্মপদ, ২২৪।)

কায়-মন-বাক্যের সর্ববিধ দুষ্কার্য পরিত্যাগ করাই ভাল। (ধম্মপদ, ২৩১-২৩৪।)

পরদোষ শীঘ্র দেখা যায়, আত্মদোষ দেখা যায় না। (ধম্মপদ, ২৫২।)

উদ্যমের সময় উদ্যম না করিলে, যুবা এবং সমর্থ হইয়াও অলস রহিলে সেই অলস ও নির্বীর্য্য মানুষ কখনও জ্ঞানমার্গ লাভ করিতে পারে না। (ধম্মপদ, ২৮০।)

নিজে যাহা লাভ করিয়াছ তাহা তুচ্ছ করিও না, পরদ্রব্যের স্পৃহা করিও না। (ধম্মপদ, ৩৬৫।)

স্থিরবুদ্ধি হও, কর্তব্যে নিপুণ হও, তবেই দুঃখ ধ্বংস করিতে পারিবে। (ধম্মপদ, ৩৭৬।)

কায়ে মনে বাক্যে যাঁহার পাপ নাই, এই ত্রিবিধ বিষয়ে যিনি সংযত, তিনিই ব্রাহ্মণ। ধম্মপদ, ৩৯১।)

যিনি দণ্ড পরিহার করিয়া দুর্বল-সবল সর্বভূতে কৃপাবান, যিনি বধ করেন না বা বধ করান না, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি। (ধম্মপদ, ৪০৫।)

যিনি কঠোর বচন ছাড়িয়া সত্য কথা বলেন, যিনি অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি। (ধম্মপদ, ৪০৮।)

ইসলাম

ইসলাম কথার মূলই হইল "শান্তি"। শান্তি-ই ইহার সার সত্য। কোরাণ বলেন—স্বর্গে একে অন্যকে "শান্তি" "শান্তি" বলিয়া সম্বোধন করিবে (১০, ১০)। স্বর্গে শান্তির বাণী ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না (৪৬, ২৬)। শান্তিধামই কোরাণের লক্ষ্য (১০, ২৫)। কোরাণ তো পূর্ববর্তী সব শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের বাণীকে সমর্থন করিবার জন্যই উক্ত (৩, ৩)। কাজেই কোরাণ অন্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদী নহে।

কাহাকেও আল্লার সমমর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান করিও না; পিতামাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার কর; খাইতে দিতে পারিবে না ভাবিয়া সন্তান-হত্যা করিও না—আল্লাই তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের আহার-দাতা; যাহা কুৎসিত, গোপনে হোক কিম্বা প্রকাশ্যে হোক তাহার নিকটেও যাইও না.........সৎভাবে ভিন্ন অনাথের ধন-সম্পত্তির নিকটে যাইও না.........ন্যায় ধর্মের বশবর্ত্তী হইয়া ওজন ঠিক দাও, মানুষের পক্ষে যাহা সাধ্য তাহাই আল্লা তাহার জন্য বিধান করেন; যখন কথা বল তখন হক কথা বল আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হইলেও......এইই আল্লার পথ, সত্য পথ, এই পথ অনুসরণ কর, অন্য পথে যাইও না, গেলে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইবে। (৬, ১৫২—১৫৪।)

সব দেশে সব জাতির মধ্যেই ভগবান তাঁহার বার্তাবহদের পাঠাইয়াছেন। (৩৫,২৪।)

প্রভু পরম কারুণিক ও দয়াময়। (সূরা ফাতিহা, ২।)

তাঁহার পথ সরল (সূরা ফাতিহা, ৫)। তাঁহার সেবকেরা ক্রোধের অধীন হন না।

অপব্যয় করিও না। আত্মীয়গণের যাহা প্রাপ্য তাহা দিবে। দরিদ্র ও পথচারীদেরও সহায়তা করিবে। (১৭শ।)

সংযমের দ্বারা চরিত্র শুদ্ধ রাখিবে। (১৭শ।)

গর্ব করিও না। (১৭শ।)

দান করিয়া ক্লেশ দেওয়ার চেয়ে স্নেহবাক্য ও ক্ষমা ভাল। (১১শ)

পূর্ব পশ্চিম সব দিকই ঈশ্বরের। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। যেদিকেই মুখ করিয়া উপাসনা কর, তাঁহার মুখ সেদিকেই বিরাজমান। (১১শ)

তিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নাই। তিনি দয়াময়। (১১শ)

তিনি বিশ্বাসীদের সহায়। তিনি তাহাদের অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান। (১১শ)

তাঁহাতে নির্ভর কর। তিনি সহায় থাকিলে কেহই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারে না। (৩য় অধ্যায়।)

ন্যায় এবং ধর্ম অনুসারে পরস্পরের সহায়তা কর। অন্যায়ে ও বিদ্বেষে সহায়তা করিও না। (৫ম।)

সত্য পথে চলিলে কেহ তোমাদের ক্ষতি করিতে পারে না। (৫ম।)

ঈশ্বরই সত্য পথে লইয়া যান। (১০ম।)

হতাশ হইও না। ঈশ্বরের দয়ার শেষ নাই। (১২শ।)

নিত্য উপাসনা কর, দান কর, তাঁহাতে দৃঢ় নির্ভর কর। (২২শ।)

নিত্য প্রার্থনা কর, সর্ব অপরাধ হইতে তাহা তোমাকে রক্ষা করিবে। (২৯শ।)

যিনি ক্ষমা করেন এবং শত্রুর সহিত কলহ বিদ্বেষ মিটাইয়া ফেলেন তিনি ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন। (৪২শ।)

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁহারা পরস্পরে ভাইএর মত। ভাইদের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ যেন না থাকে। (৪৯শ।)

(হদীস হইতে)

আল্লার শত দয়ার মধ্যে একটু দয়া লইয়া জগতে সকলে পরস্পরে দয়া করে। (মুসলিম।)

যে যেটুকু মঙ্গল করে, আল্লা তাহার দশগুণ মঙ্গল করেন। (মুসলিম।)

যে বিশ্বাসী সে অতিথি ও প্রতিবেশীর সম্মান করে। (উভয়; মুসলিম ও বুখারী।)

মনে অণুমাত্র অহঙ্কার থাকিলেও তাহার স্বর্গ নাই। (মুসলিম।)

কাফেরকেও উৎপীড়ন করিলে আল্লাহ তাহাকে শাস্তি দিবেন। (উভয়।)

সাবধান। লোভ হইতে সতর্ক হও। লোভে ধ্বংস। (মুসলিম।)

প্রতিবেশীকে অভয় দিয়া নির্ভয় করিতে না পারিলে স্বর্গে প্রবেশ অসম্ভব। (মুসলিম।)

হিংসা করিও না, বিদ্বেষ করিও না, ভাই-ভাই ভগবানের সেবক হও। (উভয়।)

দয়া না করিলে দয়া পায় না। (উভয়।)

যুদ্ধে বীরত্ব নহে। বীরত্ব ক্রোধ দমনে। (উভয়।)

প্রত্যেক সৎকার্যই দানের সমান। (উভয়।)

সচ্চরিত্রতাই ধর্ম। (উভয়।)

আল্লা পবিত্র। তিনি কিছু অপবিত্রই স্বীকার করেন না। (মুসলিম।)

মিথ্যা বাক্য ও আচরণ যে ত্যাগ না করে তাহার উপবাসে কোনোই ফল নাই। (বুখারী।)

বিশ্বজগৎ আল্লার পরিবার ; সে-ই আল্লার কাছে ভাল যে তাঁর পরিবারের প্রতি প্রেমপূর্ণ। (বুখারী।)

হিন্দু ধর্ম

একই দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত। (ঋগ্বেদ, ১, ১৬৪, ৪৬।) তিনি আমাদের সবাকার বন্ধু, পিতা ও প্রভু। (যজুর্বেদ, বাজ, ৩২, ১০।)

তোমাদের মধ্যে সহৃদয়তা, সমচিত্ততা ও অবিদ্বেষ বিরাজ করুক। ভাই যেন আর ভাইকে দ্বেষ না করে। ভগ্নী যেন আর ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। তোমরা একচিত্ত ও একব্রত হইয়া সকলে পরস্পরের প্রতি কল্যাণবাণী বল। (অথর্ব বেদ, ৩, ৩০, ১-৩।)

শুধু দেবতা বা রাজার প্রিয় কার্য করিলে চলিবে না। ছোট বড় সবারই প্রিয় ও কল্যাণ কর্ম করিতে হইবে। (অথর্ব বেদ, ১৯, ৬১, ১।)

সত্যের তপস্যাতেই আত্মাকে লাভ করা যায়। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। (মুণ্ডক, ৩, ১, ৫।৬।)

সেই এক পরম প্রাণই সর্বভূতে বিরাজিত। (মুণ্ডক, ৩, ১, ৩।)

অশান্তি ও দুশ্চরিত হইতে বিরত না হইলে, শুধু জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। (কঠ, ২, ২৪।)

অসত্য, অন্ধকার ও মৃত্যু হইতে সত্য, জ্যোতি ও অমৃতে আমাকে উপনীত কর। (বৃহদারণ্যক, ৩, ৩, ২৮।)

সর্বভূতের মধ্যে সত্যই মধুময়। সত্যের কাছেও সর্বভূত মধুময়। এই সত্যে বিরাজমান পুরুষ অমৃতময় ও তেজোময়। (বৃহদারণ্যক, ২, ৫, ১২।)

মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মকে দেখিয়াছে সেই তাঁহাকে পরমস্থানে দেখিয়াছে। (অথর্ববেদ, ১০, ৭, ১৭।)

সর্বজীবে একই দেবতা বিরাজমান, যদিও তাহা আমরা এই চক্ষে দেখিতে পাই না। (শ্বেতা, ৬, ১১।)

সর্বত্রই ঈশ্বর বিরাজমান। তিনি যাহা দেন তাহাই ভোগ কর। (ঈশা, উপ, ১।)

সত্য কথা বল, ধর্ম আচরণ কর, অধ্যয়নে বিরত হইও না। সত্য হইতে, ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইও না। কল্যাণ ও মঙ্গল কর্মে অলস হইও না। শাস্ত্রে ও মানুষের কাছে শোনা ভাল কথা অগ্রাহ্য করিও না। মাতা, পিতা, আচার্যকে ভক্তি করিও। অতিথি অভ্যাগতকে সেবা করিও। অন্যের ভাল কাজ অনুসরণ কর। মন্দ কাজ অনুসরণ করিও না। আমাদের চেয়ে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি সহ সেবা করিবে। দান করিতে হইলে শ্রদ্ধার সহিত করিবে। অশ্রদ্ধা করিয়া দান করিও না। শোভনভাবে দান করিবে। বিনয়ের সহিত দান করিবে। ধর্মভয়ে দান করিবে। মৈত্রীর সহিত দান করিবে। যদি কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিক না বুঝিতে পার তবে বিচারশীল সহৃদয় সমদর্শী মহাপুরুষদের আচরণের অনুসরণ করিও। ইহাই আদেশ, ইহাই অনুশাসন, ইহাই আচরণীয়। (তৈত্তিরীয় উপ, ১, ১১।)

সত্যেই বায়ু প্রবাহিত, সত্যেই সূর্য্য উদিত। দ্যুলোকেও সত্য। সত্যেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সত্যেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত। তাই সত্যকে বলা হয় পরম বস্তু। (তৈত্তি, আ, ১০, ৬৩, ১।)

আমরা যেন কর্ণে কল্যাণের কথাই শুনি, চক্ষে যেন কল্যাণই দেখি। (ঋগ্বেদ, ১, ৮৯, ৮।)

সকল অবস্থায় আমাদের মন যেন সবার প্রতি কল্যাণ সঙ্কল্পেই পূর্ণ হয়। (যজুর্বেদ, বাজসনেয়ি, ৩৪, ১-৫।)

অল্প বয়সে এমন সৎকাজ করিবে, যাহাতে বৃদ্ধকালে সুখে থাকিতে পার। (মহাভারত, উদ্যোগ, ৩৪,৬৯।)

যে কর্মকে কল্যাণকর মনে করিবে, তাহা জীবনের ব্রত করিবে। কেহ অন্যায় করিলে তাহার প্রতি ফিরিয়া অন্যায় করিও না। সদা সাধু আচরণ করিবে। (মহাভারত, শান্তি, ৯৪, ১০।) (মহাভারত, বনপর্ব, ২০৬, ৪৪।)

পীড়িতকে শয্যা দিবে, পরিশ্রান্তকে আসন দিবে, তৃষ্ণার্তকে পানীয় দিবে, ক্ষুধিতকে অন্ন দিবে। (মহাভারত, বনপর্ব, ২, ৫৪।)

ধর্মকে যদি নষ্ট কর, তবে ধর্মের দ্বারা তুমিই নষ্ট হইবে। ধর্মের রক্ষা করিলে তুমিই রক্ষা পাইবে। (মনু, ৮, ১৫।)

দুঃখ পাইলেও অধর্মে মন দিবে না। (মনু, ৪, ১৭১।)

মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। (মহাভারত, শান্তি, ২৯৯, ২০।)

অধর্মের দ্বারা হয়তো কিছুকাল ধন ধান্য বৃদ্ধি হয়, সুখ সম্পত্তিও হয়, সকলকে ছাড়াইয়াও যাওয়া যায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমূলে সে বিনষ্ট হয়। (মনু, ৪, ১৭৪।)

সুখার্থী ব্যক্তি পরম সন্তোষ আশ্রয় করিয়া সংযত হইবেন। সন্তোষেই সকল সুখ, অসন্তোষেই যত দুঃখ। (মনু, ৪, ১২।)

পরবশতাই সকল দুঃখ, আত্মবশতাই সর্ব সুখ। (মনু, ৪, ১৬০।)

জলে হয় দেহশুদ্ধি, সত্যে হয় মনঃশুদ্ধি, বিদ্যার তপস্যায় হয় আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানের দ্বারা হয় বুদ্ধির শুদ্ধি। (মনু, ৫, ১০৯।)

কটু বাক্যের উত্তর দিও না, কাহাকেও অপমান করিও না, কাহারও শত্রুতা করিও না। (মনু, ৬, ৪৭।)

অপরাধ করিয়া অনুতাপ করিলে আর পাপ থাকে না। জানিয়া বা না জানিয়া অপরাধ না করিয়া ফেলিলেও সাবধান হইবে, আর যেন তাহা না করা হয়। (মনু, ১১, ১৩০-১৩১।)

গাছপালা পশু-পক্ষীও বাঁচে, কিন্তু সেই বাঁচাই যথার্থ বাঁচা যখন আমাদের মনও জীবন্তভাবে বাঁচে। (যোগবাশিষ্ঠ, ২, ২৮।)

অকল্যাণ হইতে মনকে কল্যাণে লইয়া যাওয়াই মনুষ্যত্ব। (যোগবাশিষ্ঠ, ৪, ১৭।)

সৎসঙ্গই যথার্থ তীর্থস্থান। (যোগবাশিষ্ঠ, ৪, ৭৯।)

যিনি উদার তিনি সকলকেই আত্মীয় মনে করেন। (যোগবাশিষ্ঠ, ১৯, ৫৭।)

ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে জয় করাই পৌরুষ। (মহাভারত, আদিপর্ব, ৭৯, ৪।)

ক্ষমাতেই ধর্মের সব কিছু নিহিত। (মহাভারত, বনপর্ব, ২৯, ৩৬।)

যে ধর্ম অন্য ধর্মের বিরুদ্ধ তাহা যথার্থ ধর্ম নয়। বিরোধহীন ধর্মই যথার্থ ধর্ম। (মহাভারত, বনপর্ব, ১৩১, ১১।)

দয়াই ধর্ম, ক্ষমাই বল, সত্যই পরম ব্রত। (মহাভারত, বনপর্ব, ২১২, ৩০।)

সর্বভাবে সকলের হিতসাধন, অনুগ্রহ ও দানই সনাতন ধর্ম। (মহাভারত, বনপর্ব, ৩১২, ৭৬।)

পাপ করিবে না। পাপাচরণে প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। (মহাভারত, উদ্যোগ, ৩৪, ৬২।)

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে, দানের ও উপকারের দ্বারা অপকারকে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। (মহা, উদ্যোগ, ৭৩, ৭৪।)

শত্রুও গৃহে উপস্থিত হইলে উচিত আতিথ্য করিবে। পার্শ্বাগত ছেদককেও বৃক্ষ ছায়া দানে বঞ্চিত করে না। (মহা, শান্তি, ২৪০, ৫।)

সযত্নে ধর্ম, সত্য, জ্ঞান, ন্যায়, দয়া, সরলতা ও সাধুতা আচরণ কর। (মহা, শান্তি, ১৫৩, ৮১।)

সত্যই নিত্য ও সনাতন ধর্ম, সত্যই পরমা গতি, সত্যকেই নমস্কার কর। ধর্ম, যোগ, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি সবই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। (মহা, শান্তি, ১৬২, ৪-৫।)

সমতা, দম, অমাৎসর্য, ক্ষমা, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যত্ব, ধৈর্য্য, দয়া, অহিংসা—এই সব সত্যেরই নানাবিধ রূপ। (মহা, শান্তি, ১৬২, ৮-৯।)

ব্রাহ্মণের পক্ষে একতা, সমতা, সত্যতার মত সম্পদ আর নাই। (মহা, শান্তি, ২৭৫, ৩৭।)

কল্যকার কাজ আজ কর। বৈকালের কাজ সকালে কর। (মহা, শান্তি, ১৭৫, ১৫।)

যুবা বয়সেই ধর্মশীল হওয়া উচিত। (মহা, শান্তি, ১৭৫, ১৬।)

বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, সত্যের সমান তপস্যা নাই, আসক্তির সমান দুঃখ নাই, ত্যাগের সমান সুখ নাই। (মহা, শান্তি, ১৭৫, ৩৫।)

অহিংসা, সত্য, সরলতা, ক্ষমা, অপ্রমাদ যাঁহার আছে তিনিই সুখী। (মহা, শান্তি, ২১৫, ৬।)

জ্ঞানের সমান পবিত্র আর কিছুই নাই। (গীতা, ৪, ৩৮।)

সর্বজীবে সমভাবে বিরাজমান পরমেশ্বরকে দেখাই সত্য দৃষ্টি। (গীতা, ১৩, ২৭।)

মাতাপিতার শুশ্রূষা, ভাইদের প্রতি স্নেহ যদি থাকে তবেই স্বর্গগামী হইবে। (মহা, অনুশাসন, ২৩, ৯৪।)

যে সকলকে অভয় দান করে, সর্বভূতে তাহাকে অভয় দান করে। (মহা, অনুশাসন, ১১৬, ২৩।)

অহিংসাই পরম ধর্ম, পরম দম, পরম দান, পরম তপস্যা, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম বন্ধু, পরম সুখ, পরম সত্য, পরম শাস্ত্র। (মহা, অনুশাসন, ১১৬, ৩৮-৪০।)

সত্যের সমান ধর্ম নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই। সত্যহীন পূজা, জপ, তপ, সবই ব্যর্থ। (মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪, ৭১-৭২।)

সত্য যাহার ব্রত, দীনে যাহার দয়া, কাম ক্রোধ যাহার বশে, সেজন ত্রৈলোক্যজয়ী। (মহানির্বাণ তন্ত্র, ৮, ৬৭।)

বিশ্বের হিতসাধনেই বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর প্রীত হন। (মহানির্বাণ তন্ত্র, ২, ৩৩।)

যাহারা দয়াশীল, কলি তাহাদের কিছু করিতে পারে না। (মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪, ৫৭।)

যাহারা হিংসা-মাৎসর্য্যহীন ও দম্ভ-দ্বেষরহিত, কলি তাহাদের কিছু করিতে পারে না। (মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪, ৬১।)

হিন্দু (জৈন)

জৈন—

জীবমাত্রেই চায় বাঁচিতে। জীবন সবারই প্রিয়। দুঃখ ও মৃত্যু সবাই এড়াইতে চায়। জীব বধ করিও না। (আচারাঙ্গ সূত্র।)

যতদিন পবিত্র শুদ্ধ স্বরূপের বোধ না হয় ততদিন ব্রত, তপস্যাদি সব আচারই নিরর্থক। (যোগীন্দ্র।)

কামকে জয় করাই বীরত্ব। যুদ্ধে বীর্য্য প্রকাশ বীরত্ব নহে। (স্বামী কার্তিকেয়।)

অন্য জীবে দয়া করার অর্থ আপনাকেই দয়া করা, অন্যকে হিংসা করার অর্থ আত্মহিংসা। দূর হইতেই হিংসাকে ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। (শিবার্য্য।)

রাগ দ্বেষের তরঙ্গে চঞ্চল মনে আত্মতত্ত্বের দর্শন মেলে না। (দিব সেন।)

অসংযমই দুঃখ ও আপদের পন্থা। সংযমই সুখের পন্থা। ইহা জানিয়া যে পথে ইচ্ছা, যাও। (সংকৃত।)

অন্ধ কে? যে অকরণীয় কর্ম করে।

বধির কে? যে হিতবাক্য শোনে না।

বোবা কে? যে যথাসময়ে কল্যাণ বাক্য বলিতে জানে না। (প্রশ্নোত্তররত্নমালা।)

ভাল কাজ না করিয়াও তাহার ফল পাইতে লোকে চায়। আর পাপের ফল ভোগ করিতে না চাহিয়াও লোকে পাপ করে। (গুণভদ্রাচার্য।)

জ্ঞান বিনা সাধুতার কোনো অর্থ নাই। খাদ্য না থাকিলে পাত্র দেখিয়া পেট ভরে না। (ক্ষত্রচূড়ামণি।)

যদি ক্রোধ করিতে হয় তবে ক্রোধের প্রতি ক্রোধ কর। কারণ ক্রোধই সর্ব অনর্থের মূল। (বাদীভসিংহ।)

যে অপরের দোষের মত নিজের দোষও দেখে সে অতুলনীয় মানুষ। সেই যথার্থ মুক্ত পুরুষ। (বাদীভসিংহ।)

পরের অনুকরণ করার অর্থ নাই। সত্যকে অনুসরণ কর। (আষাঙগ সূত্র।)

পবগমু-৫০/১-৭৮৩এ-৫০হাঃ